सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০১৯
পুনর্মুদ্রণ :
মার্চ, ২০২০

মূল্য : ৯০.০০ (নব্বই টাকা) মাত্র

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব
একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র Fundamentals of
Physical Geography
পাঠ্যবইয়ের ২০১৮ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রকাশক : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
লক্ষ্মণ দেবনাথ
শিক্ষক

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই (এন সি ই আর টি), শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই (এন সি ই আর টি), ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি অনুবাদে যাঁরা সহায়তা করেছেন :

শ্রীমতি গৌরী মজুমদার (ধর), শিক্ষিকা

শ্রীমতি অর্পা রায়চৌধুরী, শিক্ষিকা

শ্রীমতি ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি শর্মিলা দেব্বর্মা, শিক্ষিকা

শ্রী সুরজিৎ দেবনাথ, শিক্ষক

শ্রীমতি সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

শ্রীমতি পুজাঞ্জলী ভৌমিক, শিক্ষিকা

পরিমার্জনায়

শ্রী প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক

শ্রী সৌমিত্র কিশোর সরকার, শিক্ষক

শ্রী আশিস দেবনাথ, শিক্ষক

শ্রী বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক

শ্রীমতি শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি সোনালি ভট্টাচার্য্য, শিক্ষিকা

প্রাক্‌কথন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা আবদ্ধ করে বিভিন্ন শিক্ষার করার বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে। ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে না, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়,এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা,

তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ণ করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক এম এইচ কুরেশি মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Sciences at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

M. H. Qureshi, *Professor,* Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Indu Sharma, *PGT,* Geography, RIE Demonstration School, Ajmer

K. Kumaraswamy, *Professor,* Department of Geography, Bharatidasan University, Tiruchirapalli

K. N. Prudhvi Raju, *Professor*, Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi

K. S. Sivasami, *Professor (Retd.)*, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

L. Cajee, *Reader,* Department of Geography, North-Eastern Hill University, Shillong

P. K. Malik, *Lecturer,* Geography, Govt. College, Tavru, Gurgaon

S. R. Jog, *Professor (Retd.),* Department of Geography, University of Pune, Pune

Member-Coordinator

Aparna Pandey, *Lecturer*, Geography, DESSH, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

The National Council of Educational Research and Training acknowledges the contribution of Ashok Diwakar, *Lecturer,* Geography, Govt. College, Sector-9, Gurgaon in the development of this textbook.

The Council also gratefully acknowledges the support of individuals and organisations as listed below for providing various photographs, and other materials such as articles used in this textbook : R. Vaidyanadhan (Fig. 6.3 and 7.1); N. S. Saini (Fig. 6.4, 6.7 and 7.4); Y. Ramesh and Krishnam Raju, VSVG, (USA) (Fig. 7.11); K. N. Prudhvi Raju (Fig. 7.2, 7.5, 7.7, 7.9, 7.12 and 7.15); ITDC/Ministry of Tourism, Govt. of India, (Fig. 11.1 and 11.2); Ministry of Environment and Forests, Govt. of India (Fig. 16.1, 16.2, 16.3 and 16.4); The *Times of India*, New Delhi (Photograph on earthquake destruction, Collage on tsunami on page 25 and global warming on page 109); *Social Science* Textbook for Class VIII, Part II (NCERT, 2005), (Photographs related to volcanoes on page 26-27).

Acknowledgements are due to Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanties for her support and finalising this textbook.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Ishwar Singh and Arvind Sharma, *DTP Operators;* Sameer Khatana and Amar Kumar Prusty, *Copy Editors;* Bharat Sanwaria, *Proof Reader;* Dinesh Kumar, *Computer Incharge*, who have helped in giving a final shape to this book. The contribution of the Publication Department, NCERT are also duly acknowledged.

সূচিপত্র

একক I : বিষয় হিসাবে ভূগোল	**1-12**
1. বিষয় হিসাবে ভূগোল	2
একক II : পৃথিবী	**13-38**
2. পৃথিবীর উৎপত্তি এবং বিবর্তন	14
3. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন	21
4. মহাসাগর ও মহাদেশসমূহের বণ্টন	30
একক III : ভূমিরূপ	**39-74**
5. খনিজ এবং শিলা	40
6. ভূমিরূপ প্রক্রিয়াসমূহ	45
7. ভূমিরূপ এবং এদের বিবর্তন	58
একক IV : জলবায়ু	**75-110**
8. বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও গঠন	76
9. সৌর বিকিরণ, তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রা	79
10. বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন এবং আবহাওয়াগত প্রক্রিয়াসমূহ	88
11. বায়ুমণ্ডলীয় জল	98
12. পৃথিবীর জলবায়ু ও জলবায়ুগত পরিবর্তন	103
একক V : মহাসাগরীয় জলরাশি	**111-125**
13. মহাসাগরীয় জলরাশি	112
14. মহাসাগরীয় জলরাশির গতিপ্রকৃতি	120
একক VI : পৃথিবীতে জীবন	**126-140**
15. পৃথিবীতে জীবন	127
16. জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ	135
শব্দকোশ	**141-144**

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০ ৩২ও ২২৬)

১) সাম্যের অধিকার:

* আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
* জাতি,ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
* সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
* অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২) স্বাধীনতার অধিকার :

* বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
* শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
* সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
* ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
* ভারতের যেকোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
* যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।
* জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার:

* কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
* চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কারোর প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেক ধর্মাচরণেরপূর্ণ অধিকার এবং সমানাধিকার পাবে।
* যেকোনো ধর্মের প্রসারে অর্থ দান করার স্বাধীনতা।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদানের স্বাধীনতা।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

* ভারতের যেকোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা-লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
* ধর্ম জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি যাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

* মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে– প্রয়োজনে বিশেষ লেখ জারি করতে পারবে।

হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, সারশিয়োরেরাই, প্রহিবিশন ও কুয়ো ওয়ারান্টো।

একক : I

বিষয় হিসাবে ভূগোল

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- একীভূত বিষয় হিসাবে ভূগোল; আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলি হিসাবে একটি বিজ্ঞান।
- ভূগোলের বিভিন্ন শাখা : প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্ব।

অধ্যায়

1

বিষয় হিসাবে ভূগোল

GEOGRAPHY AS A DISCIPLINE

তোমরা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ভূগোলকে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বিষয় হিসাবে অধ্যয়ন করেছ। তোমরা বিশ্ব এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে আগে থেকেই পরিচিত। এখন তোমরা 'ভূগোল' বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে অধ্যয়ন করবে এবং তোমরা শিখবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের কার্যকলাপ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। এখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ভূগোল বিষয়টি কেন অধ্যয়ন করা প্রয়োজন? আমরা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে বসবাস করি। আমাদের জীবন অনেকভাবে আশপাশের অনেক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাঁচার জন্য আমরা আমাদের চারপাশের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আদিম সমাজ নিজের ভরণপোষণের জন্য প্রাকৃতিক উপাদান যেমন - খাবারযোগ্য উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ওপর নির্ভরশীল ছিল। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি সাধন করেছি এবং প্রাকৃতিক উপাদান যেমন - ভূমি, মৃত্তিকা ও জলের ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করা শুরু করেছি। আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং পোশাক পরিচ্ছদ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ; প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোজন, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এগুলোর মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ভূগোলের ছাত্রছাত্রী হিসাবে পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে তোমাদের আগ্রহী হতে হবে। তোমরা শিখবে ভূ-ভাগ ও মানুষ সম্পর্কে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো স্থানের যে পরিবর্তন হয়েছে তা সম্পর্কে জানতেও তোমাদের আগ্রহী হতে হবে। ভূগোল পৃথিবীর এই বৈচিত্র্য এবং স্থানভেদে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং এর কারণসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। এর মাধ্যমে তোমরা মানচিত্র ও গোলককে বোঝার দক্ষতা এবং পৃথিবীপৃষ্ঠকে সরাসরি চাক্ষুষ করার সুযোগ প্রদান করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যথা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (Geographical Information System - GIS) এবং কম্পিউটার মানচিত্র প্রণালী (Computer Cartogrpjy) ইত্যাদি বোধগম্যতা এবং দক্ষতা তোমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে অর্থপূর্ণ অবদান দিতে সাহায্য করে।

এখন পরবর্তী প্রশ্ন যেটা তোমরা করবে তা হল ভূগোল কী? তোমরা জান যে, পৃথিবী আমাদের বাসস্থান। অন্য আরও অনেক ছোটো এবং বড়ো প্রাণী যারা পৃথিবীতে বসবাস করে এবং বেঁচে থাকে। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ একরকম নয়। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো বৈচিত্র্যময়। এখানে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, সমভূমি, মালভূমি, মহাসাগর, হ্রদ, মরুভূমি এবং বনভূমি লক্ষ করা যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও সম্পূর্ণ আলাদা। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানব দ্বারা গ্রাম, শহর, রাস্তা, রেলপথ, বন্দর, বাজার এবং অন্যান্য অনেক কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

উক্ত পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক/সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি মঞ্চ তৈরি করে যার ওপর মানব সমাজ তার সৃজনশীল কার্যকলাপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এখন প্রথমে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল — 'ভূগোল কী?' এই প্রশ্নটার উত্তর তোমরা সহজেই দিতে সক্ষম হবে। সহজ শব্দে, এটা বলা যেতে পারে যে - ভূগোল হচ্ছে পৃথিবীর বর্ণনা। সর্বপ্রথম 'ভূগোল' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন একজন গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনিস (খ্রিস্টপূর্ব 274-198)। শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Geo' (পৃথিবী) এবং 'Graphos' (বর্ণনা) এই মূল শব্দগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে যার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবীর বর্ণনা। পৃথিবীকে সর্বদা মানব

আবাসস্থল রূপে দেখা হয় এবং এই কারণে বিদ্বানরা ভূগোলকে "মানব আবাসস্থল রূপে পৃথিবীর বর্ণনা' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তোমরা এই তথ্যের সঙ্গে পরিচিত যে সত্যতার অনেকগুলো আলোচনার দিক থেকে এবং 'পৃথিবী' ও বহু আলোচনার দিক নিয়ে গঠিত। এই কারণেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা যেমন - ভূতত্ত্ব (Geology), মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Pedology), সামুদ্রিক বিজ্ঞান (Oceanography), উদ্ভিদ তত্ত্ব (Biology), প্রাণীবিদ্যা (Zoology) এবং আবহবিদ্যা (Meteorology) এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ যেমন - অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব (Anthropology) ইত্যাদি পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। ভূগোল বিষয়গত ও প্রণালীগত দিক থেকে অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় থেকে স্বতন্ত্র হলেও একই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ভূগোল বিষয়টি অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এগুলোর সংশ্লেষণ করে।

আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করি। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে এবং অনেকগুলোর মধ্যে বৈসাদৃশ্য। অতএব, ভূগোল বিষয়টিকে আঞ্চলিক ভিন্নতার অধ্যয়ন হিসাবে গণ্য করা যৌক্তিক মনে হয়। সুতরাং, ভূগোল বলতে বোঝায় অঞ্চলভেদে সকল ঘটমান বিষয়ের পর্যালোচনা। ভূগোলবিদরা শুধু পৃথিবীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন করে না। বিভিন্ন উপাদানেরও অধ্যয়ন করে যেগুলো এই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফসলের প্রকারভেদ অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু এই ভিন্নতা বিভিন্ন উপাদান যেমন - মৃত্তিকা, জলবায়ু, বাজার এবং চাহিদা, কৃষকের বিনিয়োগ করার ক্ষমতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং, যে-কোনো দুটি উপাদান বা একের অধিক উপাদানের মধ্যে কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনই ভূগোল বিষয়টির উদ্দেশ্য।

একজন ভূগোলবিদ পৃথিবীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা কার্য এবং কারণ অনুযায়ী করে থাকে। এর ফলে শুধু ব্যাখ্যা করতেই সুবিধা হয় না। তথ্যের পূর্বানুমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানারও ক্ষমতা প্রদান করে।

প্রাকৃতিক এবং মানব ভূগোল কোনোটাই স্থিতিশীল নয় বরং খুবই গতিশীল। পৃথিবী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং মানবজাতির ক্রমাগত সক্রিয় আন্তঃক্রিয়ার কারণে কালক্রমে পরিবর্তন হতে থাকে। আদিম মানব সভ্যতা তাদের পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং ভূগোল হচ্ছে প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অধ্যয়ন। 'মানব' হচ্ছে প্রকৃতির একটি অভিন্ন অঙ্গ এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'প্রকৃতি' মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব লক্ষ করা যায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর। মানব প্রকৃতির সঙ্গে অনুবন্ধিত হয়ে নিজেকে অভিযোজিত (Adaptation) এবং সংশোধিত করে ফেলেছে। তোমরা পূর্বেই জেনেছ, বর্তমান সমাজ আদিম সমাজকে অতিক্রম করে এসেছে। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল থাকতে হত। বর্তমান সমাজ প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করেছে এবং এভাবে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহের সঠিক সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপের সীমা সম্প্রসারিত করেছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ নিজের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস করেছে। প্রযুক্তি কঠোর শ্রমকে সহজতর করেছে, শ্রমক্ষমতা বাড়িয়েছে এবং শ্রমবিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উচ্চ জরুরি চাহিদাগুলো মিটিয়েছে। উৎপাদনের মাত্রা এবং শ্রমের স্থানান্তরও ঘটিয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা কবির মাধ্যমে খুব নিখুঁতভাবে নিম্নলিখিতভাবে 'মানব' এবং 'প্রকৃতি' (ঈশ্বর) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। "তুমি মৃত্তিকা সৃষ্টি করেছ, আমি সৃষ্টি করেছি কাপ, তুমি সৃষ্টি করেছ রাত্রি, আমি সৃষ্টি করেছি দীপক, তুমি সৃষ্টি করেছ জঙ্গল, পাহাড় এবং মরুভূমি, আমি সৃষ্টি করেছি ফুলের শয্যা এবং বাগান"। মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করার অধিকার জমানোর ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজনীয়তার স্তর থেকে স্বাধীনতার স্তর পর্যন্ত এগিয়ে চলছে। মানুষ সর্বত্র নিজের ছাপ রেখেছে এবং প্রকৃতির সাহায্যে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এইভাবে আমাদের মানবীয় প্রকৃতি এবং প্রকৃতি প্রভাবিত মানবের দর্শন হয়ে থাকে। ভূগোল মানব এবং প্রকৃতির এই আন্তঃক্রিয়াত্মক সম্পর্কেরই আলোচনা করে। পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থানসমূহ সংঘবদ্ধ হয়েছে। যোগাযোগ ও বিভিন্ন ধরনের বাসস্থান ক্রমাগত একীভূত হয়ে সংগঠিত হয়েছে। একটি সামাজিক বিষয় হিসাবে ভূগোল 'আঞ্চলিক সংগঠন' ও 'আঞ্চলিক অখণ্ডতা'-র অধ্যয়ন করে।

বিষয় হিসাবে ভূগোল তিন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে :

(i) কিছু প্রশ্ন পৃথিবীর প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রশ্নগুলো **কী** সম্বন্ধীয়।

(ii) কিছু প্রশ্ন পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রশ্নগুলো '**কোথায়**' সম্বন্ধীয়।

দুটি প্রশ্নই পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের অবস্থানও বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রশ্নগুলো কোনোও উপাদানের বৈশিষ্ট্য এবং তার অবস্থানগুলো সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। ঔপনিবেশিক সময়কালে এটি একটি বিখ্যাত মতবাদ ছিল। এই দুটি প্রশ্ন ভূগোল বিষয়টিকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় না বানালেও তৃতীয় প্রশ্নটি কিন্তু বিষয়টিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা প্রদান করে।

(iii) তৃতীয় প্রশ্নটি পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও মানব বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ অথবা কারণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলো আলোচনা করে। এই প্রশ্নগুলো ভূগোলের '**কেন**' সম্বন্ধীয়।

একটি বিষয় হিসাবে ভূগোল কোনো অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং গুণগুলো আলোচনা করে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপাদানের বণ্টন, অবস্থান, ভূ-পৃষ্ঠে ঘটমান বিষয়সমূহের কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করা হয়। এটি ঘটমান বিষয়গুলোর সংযোগ এবং আন্তঃ সম্পর্ক নিয়েও বিশ্লেষণ করে। তাছাড়া ভূগোল বিষয়টি মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে।

একটি সমকালীন বিষয় হিসাবে ভূগোল (Geography as an Integrating Discipline) :

ভূগোল একটি সংশ্লেষণাত্মক (Synthesis) বিষয় যা স্থানগত সংশ্লেষণের প্রয়াস করে এবং ইতিহাস সময়গত সংশ্লেষণের প্রয়াস করে। এই প্রয়াসের প্রকৃতি সমগ্রাত্মক (Holistic)। এই বিষয়টি স্বীকার করে যে বিশ্ব এক পরস্পর নির্ভর পদ্ধতি। আজ বর্তমান বিশ্ব একটি সামগ্রিক গ্রাম হিসাবে বিবেচিত হয়। পরিবহণের সহজলভ্যতার কারণে দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম (Audio-visula media) এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নতি বিশ্বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রযুক্তি ভালো সুযোগ করে দিয়েছে। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিধির ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। সংশ্লেষাত্মক বিষয় হিসাবে ভূগোল প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব ধরনের বিজ্ঞান, সামাজিক হোক বা প্রাকৃতিক, উদ্দেশ্য একটাই - সত্যকে বোঝা। ভূগোল সত্যতার সঙ্গে জড়িত তথ্যগুলোকে সহজ ও বোধগম্য করে তোলে। চিত্র 1.1- এ ভূগোলের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান বিষয়ই ভূগোলের সঙ্গে জড়িত, কারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রত্যেক আলোচনাই পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান নিয়ে হয়ে থাকে যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়। আঞ্চলিক বিষয়গুলো সামগ্রিকরূপে তুলনামূলক বিশ্লেষণে ভূগোল বিষয়টি সাহায্য করে। সুতরাং ভূগোল বিষয়টি শুধু এক স্থানের সঙ্গে অন্যস্থানের ভিন্নতা বিশ্লেষণ করে না। বিভিন্নতাগুলোর কারণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোও আলোচনা করে। ভূগোলবিদদের অঞ্চল সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে হয় যেন তার তর্কযুক্ত বর্ণনা করতে পারেন। এই বর্ণনাগুলো কিছু উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ভূগোল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে দূরত্ব তা বিশ্ব ইতিহাসের দিক পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

স্থানিক গভীরতা বহু দেশে প্রতিরক্ষা প্রদান করেছিল, বিশেষ করে গত শতাব্দীতে। 'পরম্পরাগত যুদ্ধে বড়ো আকারের দেশগুলো অধিক স্থান-এর চেয়ে সময়ের লাভ প্রাপ্ত করেছিল'। নতুন বিশ্বের দেশগুলো চারদিকের বিস্তৃত সমুদ্র দ্বারা নিজের দেশের ওপর অন্য দেশের হামলা থেকে রক্ষা করেছিল। যদি আমরা বিশ্বের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর আলোচনা করি তাহলে প্রত্যেকটি ঘটনাতেই আমরা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাব।

ভারতে হিমালয়ের অবস্থান একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং প্রতিরক্ষা প্রদান করছে কিন্তু পাহাড়ের গিরিপথগুলো পরিব্রাজক ও আক্রমণকারীদের মধ্যে এশিয়া থেকে প্রবেশে সাহায্য করে। সমুদ্র উপকূল ভারতকে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করে। নৌকা-সঞ্চালনের (Navigation) প্রযুক্তি ইউরোপের দেশগুলোতে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অধিকাংশ এশিয়ার দেশ এবং আফ্রিকার কিছু দেশে ঔপনিবেশিকরণ করতে সাহায্য করেছে যেহেতু তারা সমুদ্রপথের সুবিধা পেয়েছে। ভৌগোলিক কারণগুলি দ্বারা পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে। প্রত্যেকটা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে যা সময়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা যেতে পারে। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পরিবর্তন ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়কালকে মেনে চলে। অনেক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা একটি বিশেষ সময়ে নির্ণয় নেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে। স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সময়কে রূপান্তর করা

সম্ভব এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পর্যায়ক্রমিকভাবে A স্থানটি B স্থান থেকে 1500 কিমি দূরে, বিকল্পভাবে এইরকমও বলা যায় A স্থানটি B স্থান থেকে 2 ঘণ্টা দূরে (যদি বায়ুপথে যাত্রা করা হয়) বা 17 ঘণ্টা দূরে (যদি দ্রুতগামী রেলে যাত্রা করা হয়)। এই কারণে সময়কে ভূগোল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যা চতুর্থ মাত্রিক হিসাবে কাজ করে। অনুগ্রহ করে অন্য তিন মাত্রিকের উল্লেখ করো।

চিত্র 1.1 বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোল বিষয়ের সম্পর্ক চিত্রিত করেছে। এই সম্পর্ক দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক ভূগোল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physical Geography and Natural Sciences):

প্রাকৃতিক ভূগোলের সমস্ত শাখাগুলি যা চিত্র 1.1-এ দেখানো হয়েছে, প্রত্যেকটিরই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। চিরাচরিত প্রাকৃতিক ভূগোল ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, আবহবিদ্যা এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এইভাবে ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ু বিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, মৃত্তিকা ভূগোলের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে কারণ ভূগোলের এই শাখাসমূহ তার তথ্য এসকল বিজ্ঞান থেকেই সংগ্রহ করে। জীব-ভূগোল (Bio-Geography) উদ্ভিদ তত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যার পাশাপাশি বাস্তুসংস্থান (Ecology)-এর সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ মানুষ বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশে নিজের উপযুক্ত নিবাস (Niche) গড়ে তুলে।

একজন ভূগোলবিদকে গণিত এবং কলা, বিশেষ করে মানচিত্র রেখাঙ্কনে নিপুণ হতে হয়। ভূগোল বিষয়টি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অবস্থান, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখা নিয়েও আলোচনা করে। পৃথিবীর আকৃতির সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর মিল নেই। তাই পৃথিবীর আকৃতিকে 'Geoid' বলা হয়। কিন্তু ভূগোলবিদদের মূল হাতিয়ার হচ্ছে মানচিত্র যা পৃথিবীর দ্বিমাত্রিক উপস্থাপনা করে। পৃথিবীর আকৃতিকে দ্বিমাত্রিক রূপে রূপান্তরিত করার সমস্যাটি রেখাচিত্রের অভিক্ষেপণ বা প্রজেকশন (Projection) এবং গাণিতিক হিসাবের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। মানচিত্র রেখাঙ্কন (Cartograhic) এবং সংখ্যাভিত্তিক (Qntirtiave) পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের জন্য গাণিতিক দক্ষতা, পরিসংখ্যান এবং অর্থনীতির জ্ঞান আবশ্যক। মানচিত্র শিল্পীসুলভ কল্পনার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। পরিলেখ (Sketch) বানানো, মানচিত্র তৈরি করার কৌশল ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিপুণতা প্রয়োজন।

ভূগোল এবং সামাজিক বিজ্ঞান (Geography and Social Sciences):

চিত্র 1.1-এ প্রদর্শিত রেখাচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি সামাজিক বিজ্ঞানই ভূগোল বিষয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূগোল এবং ইতিহাসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটা দর্শন আছে যেটি ঐ বিষয়ের জন্য মূল বিষয়বস্তু হয়। দর্শন কোনো বিষয়কে ভিত্তি প্রদান করে এবং এর ক্রমবিবর্তনে, --- এটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারও জ্ঞান প্রদান করে। এইভাবে 'ভৌগোলিক চিন্তার ইতিহাস' ভূগোলের মাতৃশাখা হিসাবে সর্বত্র পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের সব বিষয়গুলো যথা- সমাজশাস্ত্র, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, জনসংখ্যা বিজ্ঞান (Demography) সামাজিক বিভিন্ন বাস্তবতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে। ভূগোলের বিভিন্ন শাখাগুলি যেমন - সামাজিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল, বাসস্থান ভূগোল (Settlement Geography) প্রভৃতি এইসব বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে কারণ এদের প্রত্যেকটিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল দেশ বা রাষ্ট্রের সীমানা, জনসংখ্যা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা করা, আবার রাজনৈতিক ভূগোল রাজ্য, রাজ্যের জনসংখ্যার এবং তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনৈতিক বিষয়টি উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং উপভোগ (Consumption) নিয়ে আলোচনা করে। এই উপাদানগুলোর আলোচনা আবার অঞ্চলভেদে আলাদা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography) এইক্ষেত্রে আলাদা ভূমিকা পালন করে এবং ঐ স্থানের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং উপভোগ নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা করে। একইভাবে জনসংখ্যা ভূগোল জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ভূগোলের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এটা অধ্যয়নের নিজস্ব একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে যা অন্য বিষয় থেকে একে সম্পূর্ণ আলাদা করে। এটি অন্য বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত. আবার অন্য সব বিষয়ের নিজস্ব একটি আলোচনা ক্ষেত্র আছে। ভূগোল তথ্যের প্রবাহকে বাধাপ্রাপ্ত করে না, যেমনভাবে শরীরে বর্তমান কোশে অবস্থিত সান্দ্র পদার্থ থাকা সত্ত্বেও তা রক্তের প্রবাহকে অবরোধ করে না। ভূগোলবিদরা অন্যান্য বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি ব্যবহার করে এবং

চিত্র 1.1 : ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক

অঞ্চলভেদে তা সংশ্লেষ বা বিশ্লেষণ করে। ভূগোলবিদদের জন্য মানচিত্র খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান যার মাধ্যমে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন সংখ্যাসূচক বা অন্যান্য তথ্য দেখানো হয়।

ভূগোলের বিভিন্ন শাখা (Branches of Geography):

অনুগ্রহ করে চিত্র 1.1 পুনরাবৃত্তির জন্য অধ্যয়ন করো। এখানে থেকে স্পষ্ট ধারণা করতে পারা যায় যে, ভূগোল বিষয়টি একটি আন্তঃবিষয়ক (Inter-disciplinary) অধ্যয়ন প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা কিছু নির্দিষ্ট পথ (Approach) অনুসরণ করে। এর মধ্যে ভূগোল অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হল — (i) প্রণালীবদ্ধ (Systematic) এবং (ii) আঞ্চলিক (Regional)। প্রণালীবদ্ধ ভূগোলের আলোচনার মাধ্যমে ভূগোলের সাধারণ উপাদানগুলোর আলোচনা করা হয়। এই পথটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেছিলেন একজন জার্মান ভূগোলবিদ আলেকজেন্ডার ভন হামবোল্ড (1769-1859) , অন্যদিকে আঞ্চলিক ভূগোলের আলোচনা করেছিলেন হামবোল্ডের সমসাময়িক আরেকজন জার্মান ভূগোলবিদ, কার্ল রিটার (1779-1859)।

প্রণালীবদ্ধ ভূগোলের আলোচনায় (চিত্র 1.2) পৃথিবীকে সামগ্রিকরূপে বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ স্বাভাবিক উদ্ভিদের অধ্যয়নে আগ্রহী থাকে, তবে সর্বপ্রথম তা বিশ্বস্তরে অধ্যয়ন করা হবে। নিরক্ষীয় চিরসবুজ অরণ্য, নরম শঙ্কু আকৃতির পাইন গাছের অরণ্য অথবা মৌসুমি বনাঞ্চল ইত্যাদির চিহ্নিতকরণ আলোচনা এবং সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অঞ্চলভেদে করা হয়। আঞ্চলিক ভূগোলে, পৃথিবীকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং সমস্ত ভৌগোলিক উপাদানসমূহকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আলোচনা করা হয়। এই অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য নামেও আখ্যায়িত হতে পারে। আঞ্চলিক এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয় এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা হয়।

দ্বৈতবাদ (Dualism) ভূগোলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যা প্রারম্ভিক পর্যায়েই প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই দ্বৈতবাদ বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে। পূর্বে পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক ভূগোলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু মানুষ ভূ-পৃষ্ঠের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তারাও প্রকৃতির অংশবিশেষ। তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান আছে। সুতরাং, মানব ভূগোলের উন্নয়ন নির্ভর করছে মানুষের কার্যকলাপের উপর।

ভূগোলের বিভিন্ন শাখা (প্রণালীবদ্ধ মতামতের ভিত্তিতে) Branches of Geography (Based on Systematic Approach)

1. প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography)

(i) *ভূ-আকৃতিক বিজ্ঞান (Geomorphology)*: এটি পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের আকৃতি, তাদের উৎপত্তি এবং সম্বন্ধিত প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করে।

(ii) *জলবায়ু বিজ্ঞান* (*Climatology*) : এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় গঠন, উপাদান এবং জলবায়ুর বিভিন্ন বিভাগ এবং আঞ্চলিক বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে।

(iii) *জলবিজ্ঞান* (*Hydrology*) : এটি পৃথিবীর সমস্ত জলসমূহকে বোঝায় যা সমুদ্র, হ্রদ, নদী এবং জলের অন্যান্য উৎস সমূহকে নিয়ে আলোচনা করে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবের কার্যকলাপের উপর এর প্রভাব আলোচনা করে।

(iv) *মৃত্তিকা ভূগোল (Soil Geography)* : এই ভূগোলে মৃত্তিকার উৎপত্তি, শ্রেণিবিভাগ, উর্বরতার পরিমাণ, বণ্টন এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

2. মানব ভূগোল (Human Geography) :

(i) *সামাজিক / সাংস্কৃতিক ভূগোল* (*Social/ Cultural Geography*) : এই ভূগোল সমাজ এবং আঞ্চলিক বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর অবদান নিয়েও আলোচনা করে।

(ii) *জনসংখ্যা এবং বাসস্থান সম্পর্কিত ভূগোল (গ্রামীণ এবং শহুরে)* (*Population and Settlement Geography*) : এটি জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বণ্টন, ঘনত্ব, লিঙ্গ-অনুপাত, স্থানান্তরণ এবং পেশাগত কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। বাসস্থান সম্পর্কিত ভূগোল গ্রামীণ এবং শহুরে জনবসতির কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে।

(iii) *অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography)* : এই ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন - কৃষিকাজ, শিল্প, পর্যটন, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো এবং সেবামূলক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে।

(iv) ঐতিহাসিক ভূগোল (*Historical Geography*) : কোনো অঞ্চলের উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হয় ঐতিহাসিক ভূগোলের মাধ্যমে। যে-কোনো অঞ্চল বর্তমান অবস্থায় আসতে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে

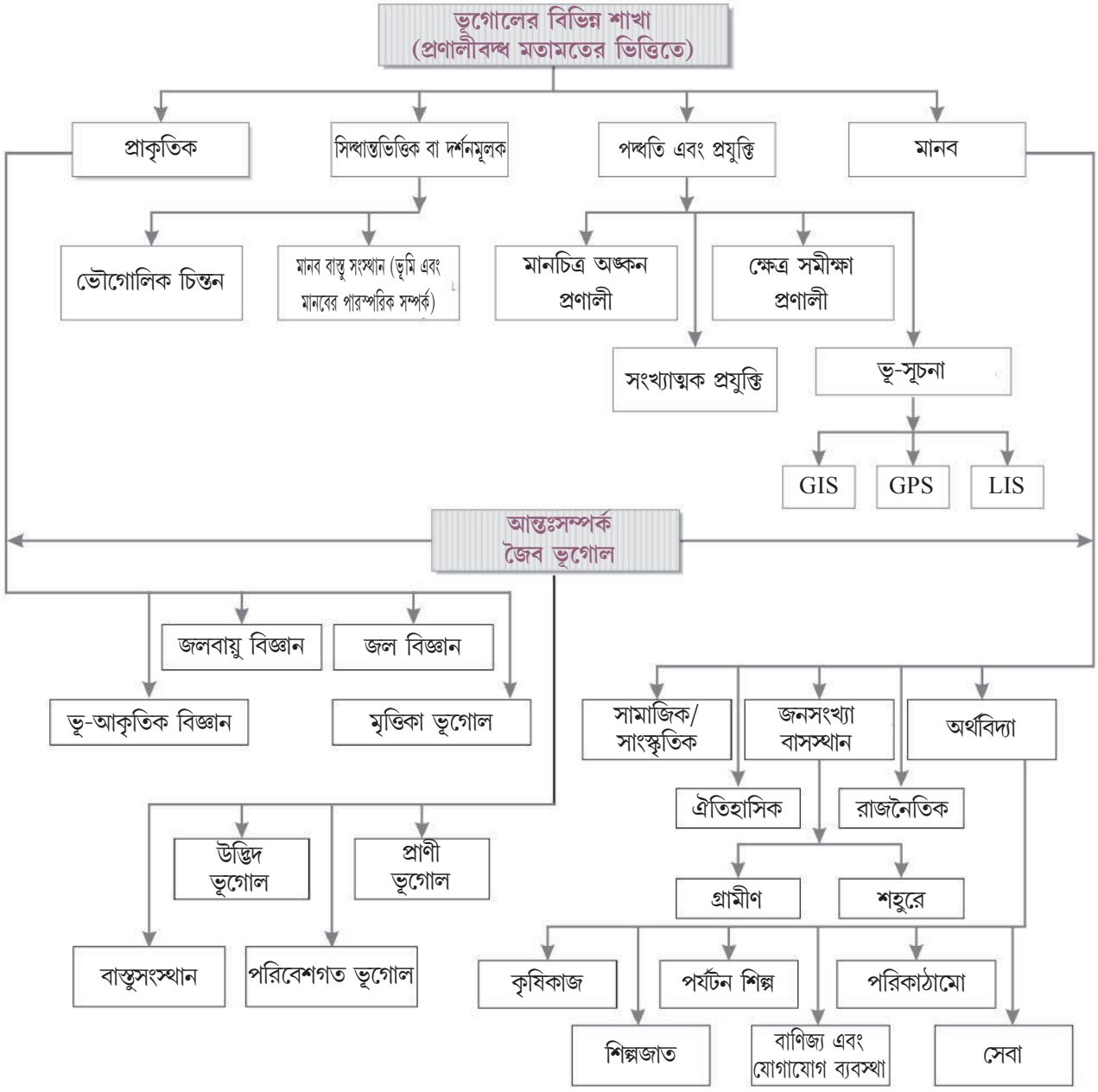

চিত্র **1.2** : প্রণালীবদ্ধ মতামতের ভিত্তিতে ভূগোলের বিভিন্ন শাখা

এসেছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে যা ঐতিহাসিক ভূগোলের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

(v) রাজনৈতিক ভূগোল (*Political Geography*) : ভূগোলের এই শাখাটি রাজনৈতিক ঘটনাবলি, কোনো অঞ্চলের সীমানা, আঞ্চলিক রাজনৈতিক সম্পর্ক, নির্বাচনি এলাকার পরিসীমার নির্ধারণ, নির্বাচনি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে। সঙ্গে জনসংখ্যার রাজনৈতিক আচরণ সম্বন্ধেও রূপরেখা তৈরি করে।

3. জীব ভূগোল (Biogeography) :

ভূগোলের এই শাখাটি প্রাকৃতিক ভূগোল এবং মানব ভূগোলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। জীব ভূগোলের বিভিন্ন শাখাগুলো নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

(i) *উদ্ভিদ ভূগোল (Plant Geography)* : এটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এবং তাদের

বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে।

(ii) *প্রাণীভূগোল (Zoo Geography)* : এটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জীবজন্তুর ধরন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বাসস্থান নিয়ে অধ্যয়ন করে।

(iii) *বাস্তুসংস্থান/বাস্তুতন্ত্র (Ecology /Ecosystem)* - বাস্তুসংস্থান বা বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থান সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে।

(iv) *পরিবেশ ভূগোল (Environmental Geography)* : ভূগোলের এই শাখাটি পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- ভূমিক্ষয়, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, পরিবেশ দূষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র - এইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে।

আঞ্চলিক মতামতের ভিত্তিতে ভূগোলের বিভিন্ন শাখা (Branches of Geography based on Regional Approach, চিত্র 1.3):

1. **আঞ্চলিক অধ্যয়ন / এলাকার অধ্যয়ন (Regional Studies/Area Studies)** : বৃহৎ, মাঝারি এবং সূক্ষ্ম ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে অধ্যয়ন করে।
2. **আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Planning)** : এইক্ষেত্রে দেশ/গ্রামীণ এবং শহরের পরিকল্পনা করা হয়।
3. **আঞ্চলিক উন্নয়ন (Regional Development)** :
4. **আঞ্চলিক বিশ্লেষণ (Regional Analysis)** : প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রেই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় — এইগুলো হল —

(i) দর্শনশাস্ত্র (Philosophy)
   (a) ভৌগোলিক চিন্তন
   (b) ভূমি এবং মানবের মিথস্ক্রিয়া / মানব বাস্তু সংস্থান।

(ii) পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি (Methods and Techniques):
   (a) মানচিত্র নির্মাণ প্রণালী, কম্পিউটারে মানচিত্র নির্মাণসহ। (Cartography including Computer Cartography)
   (b) সংখ্যাত্মক প্রযুক্তি / পরিসংখ্যানগত প্রযুক্তি (Quantitative Techniques/Statistical Techniques)
   (c) ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি (Field Survey Methods)
   (d) জিও-ইনফরমেটিক্স (Geo-informatics) পদ্ধতি যেমন - দূরসংবেদন (Remote Sensing), GIS (Geographical information system), GPS (Global Positioning System) ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত ভূগোলের বিভিন্ন শাখাগুলো বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করেছে। ভূগোল পাঠ্যক্রমের কাঠামোটি সাধারণত এইভাবেই তৈরি করা হয় এবং পড়ানো হয়। কিন্তু এই রূপরেখা স্থিতিশীল নয়। প্রত্যেক বিষয়ই নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা, নতুন সমস্যা, নতুন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, যে মানচিত্র আগে হাতে প্রস্তুত করা হত - তা আজ কম্পিউটারে করা হয়। প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোর মাধ্যমে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন তথ্য ও সংখ্যাবিষয়ক তথ্যগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। ইন্টারনেট প্রচুর পরিমাণে তথ্য সরবরাহ করে। এইভাবে বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। GIS জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি নতুন পথ খুলছে। GIS সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য একটি সুবিধাজনক উপাদান। প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও প্রদান করেছে।

তোমরা এই প্রযুক্তিগুলোর প্রাথমিক বিষয়গুলো — ব্যবহারিক ভূগোল - ভাগ 1 (NCERT 2006) -এ জানতে পারবে। তোমরা তোমাদের দক্ষতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে শিখবে।

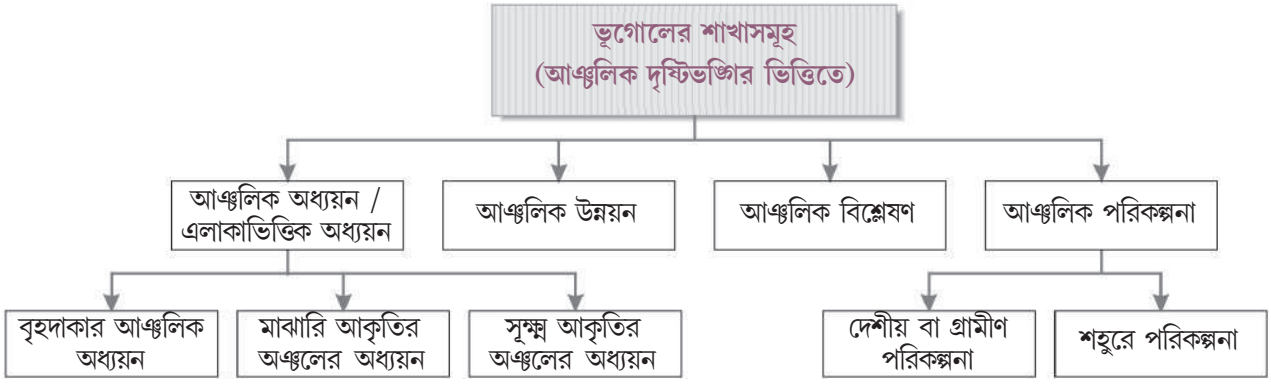

চিত্র 1.5 : আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ভূগোলের শাখাসমূহ।

প্রাকৃতিক ভূগোল এবং এর গুরুত্ব (PHYSICAL GEOGRAPHY AND ITS IMPORTANCE) :

'প্রাকৃতিক ভূগোলের মূলতত্ত্ব' - বইটিতে এই অধ্যায়টি বর্ণিত হয়েছে। পুস্তকটির সূচিপত্র বিষয়টির পরিধিকে প্রতিফলিত করে। এই কারণে ভূগোল বিষয়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলোর গুরুত্ব সঠিকভাবে জানতে হবে।

প্রাকৃতিক ভূগোল শিলামণ্ডল (ভূ-আকৃতি, নদনদী, ভূমির বন্ধুরতা, ভূ-প্রকৃতি), বায়ুমণ্ডল (এর কাঠামো, গঠন, উপাদান এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান; তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, অধঃক্ষেপণ, জলবায়ুর বিভাজন ইত্যাদি), বারিমণ্ডল (মহাসাগর, সাগর, হ্রদ, জল সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য) এবং জীবমণ্ডল (মানুষ সহ অন্যান্য জীবসমূহের বিভিন্ন ধরন এবং তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি যেমন-খাদ্যশৃঙ্খল, বাস্তুসংস্থানগত সূচক, বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ভারসাম্য) নিয়ে আলোচনা করে। মৃত্তিকা সৃষ্টির পদ্ধতিকে পেডোজেনেসিস (Pedogenesis) বলে, যা নির্ভর করে আদি শিলা (Parent rock) জলবায়ু, জৈবিক কার্যকলাপ এবং সময়ের উপর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা পরিপক্কতা লাভ করে এবং মৃত্তিকা পরিলেখ (Soil profile) গঠনে সাহায্য করে। প্রত্যেক উপাদানই মানুষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সমস্ত কার্যকলাপই ভূ-পৃষ্ঠের উপর হয়ে থাকে। সমতল ভূমি কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। মালভূমি খনিজ পদার্থ এবং অরণ্য সরবরাহ করে। পর্বতশ্রেণি চারণভূমি, অরণ্য, পর্যটকস্থল এবং সমতল ভূমির জন্য নদীর মাধ্যমে জল সরবরাহ করে। জলবায়ু আমাদের বাসস্থানের ধরন, বস্ত্র এবং খাদ্যের ধরনকে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক উদ্ভিদ, ফসল উৎপাদনের ধরণ, পশুপালন এবং শিল্প ইত্যাদির উপরও জলবায়ুর ভূমিকা আছে। মানুষ তার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু কিছু জলবায়ু সম্পর্কিত উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন - এয়ার কন্ডিশনার এবং কুলার। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের অরণ্যের ঘনত্ব, তৃণভূমির গুণগত মান নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদন মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলস্তর সমৃদ্ধ হয় যা পরবর্তীকালে কৃষিকাজে এবং গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা মহাসাগর নিয়ে অধ্যয়ন করি যা সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবেও গণ্য হয়। মাছ ছাড়াও অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার এবং খনিজ সম্পদে মহাসাগর পরিপূর্ণ। ভারত সমুদ্রতল থেকে ম্যাঙ্গানিজ আহরণ করার প্রযুক্তি উন্নয়নে সফলতা অর্জন করেছে। মৃত্তিকা নবীকরণযোগ্য সম্পদ, যা অনেকগুলো অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন - কৃষিকাজকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার উর্বরতা প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয়ভাবেই নির্ধারিত হয়। মৃত্তিকা জীবমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান যেমন-উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং আণুবীক্ষণিক জীব ইত্যাদি সরবরাহ করে।

ভূগোল কী ?

ভূগোল পৃথিবীপৃষ্ঠের আঞ্চলিক পৃথকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে।

— রিচার্ড হার্টশোর্ন

ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধ্যয়ন করে যা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত।

— হেটনার।

প্রাকৃতিক ভূগোলের অধ্যয়ন প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালন এবং মূল্যায়নের বিষয় হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক তা আমাদের বুঝতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের ব্যবহারযোগ্য সম্পদ সরবরাহ করে এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের ব্যবহার দ্রুত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পৃথিবী তার বাস্তুতন্ত্রগত ভারসাম্য হারিয়েছে। সুতরাং, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হলে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

(i) নিম্নলিখিত ভূগোলবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ভূগোল' শব্দটি কে ব্যবহার করেছিলেন?

(a) হেরোডোটাস (c) গ্যালিলিও

(b) এরাটোসথেনিস (d) অ্যারিস্টটল

(ii) নীচে দেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টিকে 'প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য' বলা হয়?

(a) বন্দর (c) সমতলভূমি

(b) রাস্তা (d) ওয়াটার পার্ক

(iii) নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর মধ্যে সঠিক জোড় মেলাও এবং সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো :

1. আবহবিদ্যা	A. জনসংখ্যাগত ভূগোল
2. জনতত্ত্ব	B. মৃত্তিকা ভূগোল
3. সমাজতত্ত্ব	C. জলবায়ুবিদ্যা
4. মৃত্তিকা ভূগোল	D. সামাজিক ভূগোল

(a) 1B,2C,3A,4D (c) 1D,2B,3C,4A

(b) 1A,2D,3B,4C (d) 1C,2A,3D,4B

(iv) নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর মধ্যে কোন্‌টি কারণ ফলাফল সম্পর্ক যুক্ত?

(a) কেন (c) কী

(b) কোথায় (d) কখন

(v) নীচের বিষয়গুলোর মধ্যে কোন্‌টি সময়গত সংশ্লেষকে ব্যাখ্যা করে?

(a) সমাজতত্ত্ব (c) নৃতত্ত্ব

(b) ভূগোল (d) ইতিহাস

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) তোমরা যখন বিদ্যালয়ে যাও তখন কোন্ কোন্ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ কর। এইগুলো কী একই রকম না ভিন্ন রকম? ভূগোল অধ্যয়নে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করা কি উচিত? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেন?

(ii) তোমরা টেনিস বল, ক্রিকেট বল, কমলা এবং কুমড়ো দেখেছ। কেন তোমরা এই বস্তুটিকেই পৃথিবীর আকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছ?

(iii) তোমরা কি তোমাদের বিদ্যালয়ে বনমহোৎসব পালন কর? তোমরা কেন এতগুলো গাছ লাগাও? গাছগুলো কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে?

(iv) তোমরা হাতি, হরিণ, কেঁচো, গাছ এবং ঘাস দেখেছ। তারা কোথায় বসবাস করে বা বৃদ্ধি পায়? এই মণ্ডলটির নাম কী দেওয়া হয়েছে? তোমরা কি এই মণ্ডলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে?

(v) তোমাদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় যেতে কতক্ষণ সময় লাগে? বিদ্যালয়টি তোমার বাড়ি থেকে রাস্তার কোন্ পাশে অবস্থিত ছিল? তোমার বিদ্যালয় পৌঁছাতে কতটুকু সময় লাগত? যাতায়াতের সময় সাপেক্ষে তোমার বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে দূরত্বের প্রভাব কী? তোমরা কি সময়কে স্থানে এবং স্থানকে সময়ে পরিবর্তিত করতে পারবে?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির 150 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) তোমরা তোমাদের চারপাশের প্রাত্যহিক জীবনে লক্ষ কর যে, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রয়েছে। সব উদ্ভিদ একই প্রজাতির হয় না। যত পশুপাশি তোমরা দেখ, তা ভিন্ন রকমের। এইসব বিভিন্ন ধরনের উপাদান পৃথিবীতে পাওয়া যায়। এখন তোমার কি তর্কযুক্তির সাহায্যে দেখাতে পারো যে, ভূগোল "আঞ্চলিক পৃথকীকরণের" অধ্যয়ন করে?

(ii) তোমরা আগেই সমাজবিদ্যা হিসাবে ভূগোল, ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান এবং অর্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেছ। এই বিষয়গুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে অরণ্যকে নির্বাচিত করো ।

(i) ভারতের মানচিত্রে বিভিন্ন প্রকার অরণ্যের বণ্টনকে দেখাও।

(ii) দেশের জন্য অরণ্যের আর্থিক গুরুত্ব লেখো।

(iii) অরণ্য সংরক্ষণ নিয়ে ভারতের ইতিহাসে রাজস্থান এবং উত্তরাঞ্চলে যে চিপ্‌কো আন্দোলন হয়েছিল তার একটি ঐতিহাসিক প্রতিবেদন তৈরি করো।

একক : II

পৃথিবী

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- পৃথিবীর উৎপত্তি এবং বিবর্তন; পৃথিবীর অভ্যন্তর; ওয়েগনারের মহীসঞ্চরণ মতবাদ এবং পাত-ভূগাঠনিক ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি।

অধ্যায়

2

পৃথিবীর উৎপত্তি এবং বিবর্তন

The Origin and Evolution of the Earth

তোমরা কি শিশু বিদ্যালয়ের (Nursury) সেই কবিতা মনে করতে পারো? "..... ট্যুইঙ্কল ট্যুইঙ্কল লিটল্ স্টার।"

শৈশব থেকে তারায় ভরা আকাশ সবসময় আমাদের আকর্ষণ করে। তোমরাও হয়তো এই তারাদের নিয়ে ভেবেছ এবং তোমাদের মনে ছিল অসংখ্য প্রশ্ন। হতে পারে প্রশ্নগুলো এমন ছিল — আকাশে কতগুলো তারা আছে? সেগুলো কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে? কেউ কি আকাশের শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারে? হতে পারে এমন অনেক আরও প্রশ্ন এখনও তোমাদের মনে আছে। এই অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে এই মিটমিটে ছোটো তারাগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল সেই সঙ্গে তোমরা ক্রমান্বয়ে জানতে পারবে পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তনের গল্প।

প্রাথমিক তত্ত্বগুলো (Early Theories) :

পৃথিবীর উৎপত্তি (Origin of the Earth) :

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা এক বিরাট সংখ্যক মতবাদ রেখেছেন। এমনই একটি পুরোনো এবং জনপ্রিয় যুক্তির স্রষ্টা ছিলেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। 1796 খ্রিস্টাব্দে গণিতজ্ঞ লাপ্লাস এর সংশোধন করেন যা নীহারিকা মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদে বলা হয় গ্রহগুলো একটি বস্তুকণার মেঘ থেকে তৈরি হয়েছিল যা তরুণ সূর্যের চারপাশে ঘুরছিল। পরবর্তী সময়ে 1900 খ্রিস্টাব্দে চেম্বারলেন এবং মোল্টন মনে করেন অন্য একটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছে আসে, এর ফলে ওই নক্ষত্রের আকর্ষণে সৌরপৃষ্ঠ থেকে একটি চুরুট আকৃতির বস্তুকণা আলাদা হয়ে যায়। আগন্তুক নক্ষত্র (Passing star) স্থানান্তরিত হয়ে গেলে সূর্যপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন উপাদানটি সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে গ্রহগুলোতে পরিণত হয়। স্যার জেমস জিনস এবং তারপরে হেরল্ড জাফরি এই যুক্তিকে সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে যুক্তিগুলোতে সূর্যের সঙ্গী হিসাবে অন্য নক্ষত্রের সহ অবস্থানের কথা বিবেচনা করা হয়। এই যুক্তিকে **জোড়া নক্ষত্র তত্ত্ব (binary theory)** বলা হয়। 1950 সালে রাশিয়ার অটো স্মিথ এবং কার্লউইজ্যাপকর 'নীহারিকা মতবাদের কিছুটা ভিন্ন ও বিস্তারিতভাবে পুনরালোচনা করতে গিয়ে বিবেচনায় আনেন যে, মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সম্বন্বিত গ্যাসীয় মেঘ তথা নীহারিকা (nebula) সূর্যকে ঘিরে রেখেছিল যাকে ধূলিকণা নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুকণার মধ্যে ঘর্ষণ ও সংঘর্ষের ফলে থালা আকৃতির মেঘ সৃষ্টি হয় এবং সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহগুলো গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী গ্রহের পরিবর্তে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

আধুনিক তত্ত্বগুলো (Modern Theories) :

মহাবিশ্বের উৎপত্তি (Origin of the Universe):

মহাবিশ্বের উৎপত্তির যুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল বিগ ব্যাং তত্ত্ব (*Big Bang Theory*) বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। 1920 খ্রিস্টাব্দে এডুইন হাবেল প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জ (galaxies) একে অপর থেকে দূরে সরে যায়। পরীক্ষণের মাধ্যমে তোমরা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের অর্থ বুঝতে পারো। একটি বেলুন নিয়ে এবং তার মধ্যে কয়েকটি বিন্দু (বিন্দুগুলো নক্ষত্রপুঞ্জ বোঝাবে) চিহ্নিত করো। তুমি যখন বেলুনে হাওয়া ভরবে তখন বেলুনের উপর চিহ্নিত বিন্দুগুলো বেলুনের সম্প্রসারণের কারণে একে অপর থেকে দূরে সরতে থাকবে। একইরকমভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর মধ্যেও দূরত্ব বাড়তে থাকবে। যা হোক তুমি দেখতে পাবে বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি ছাড়াও বেলুনের অঙ্কিত বিন্দুগুলো নিজেরাও প্রসারিত হচ্ছে। এটা বাস্তব

অনুযায়ী নয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে। কিন্তুপর্যবেক্ষণের ফলাফল নক্ষত্রপুঞ্জের প্রসারণের ব্যাপারটিকে সমর্থন করে না। তাই বেলুনের উদাহরণ আংশিকভাবে সঠিক।

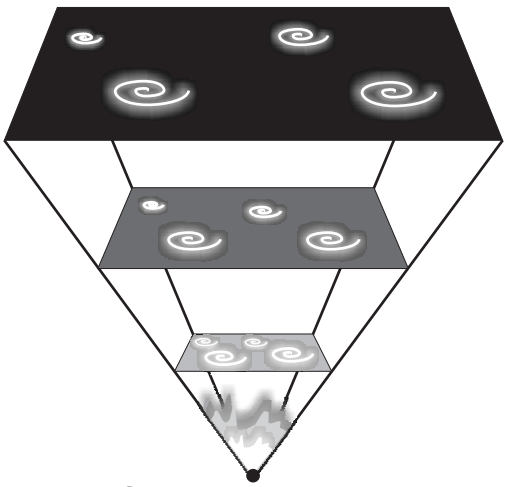

এক অকল্পনীয় অতি ক্ষুদ্র বিন্দু (Singularity)

চিত্র **2.1** : বিগ ব্যাং

নিম্নলিখিত ধাপগুলোতে বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে মহাবিশ্ব গঠন দেখানো হয়েছে। এই ধাপগুলো হল :

(i) শুরুতে বিশ্ব সৃষ্টির সব পদার্থ একটি স্থানে অতিক্ষুদ্র একটি বলের আকারে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এর আয়তন ছিল এত ক্ষুদ্র যে কল্পনার বাইরে। এর তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি।

(ii) বিগ ব্যাং-এ ক্ষুদ্র বলটি প্রবলবেগে ফেটে যায় এবং আয়তনে অনেক অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আজ থেকে 13.7 বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং-এর ঘটনা তথা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল। এমনকি আজ পর্যন্ত এর আয়তন বেড়ে চলেছে। আয়তনের এই বেড়ে যাওয়ার কারণে কিছু কিছু শক্তি পদার্থে পরিবর্তিত হয়। বিগ ব্যাং-এর পরে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের কম সময়ের মধ্যে আয়তন বেড়ে যাওয়া ছিল অতি দ্রুত, তারপর আয়তন বেড়ে যাওয়ার গতি কমে যায়। বিগ ব্যাং সংগঠনের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে প্রথম পরমাণু গঠন শুরু হয়।

(iii) বিগ ব্যাং-এর তিন লক্ষ বছরের মধ্যে উষ্ণতা প্রায় 4500 K (কেলভিন)-এ নেমে যায় এবং পারমাণবিক পদার্থের উদ্ভব হয়। মহাবিশ্ব স্বচ্ছ (transparent) হয়ে ওঠে।

মহাবিশ্বের প্রসারণের কারণে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। পূর্বোক্ত ধারণার আর একটি বিকল্প ছিল হোয়েলের স্থিতিশীল অবস্থা (steady state) ধারণাটি — এতে বলা হয় মহাবিশ্বকে যে-কোনো সময়ে একই রকম বলে মনে করা হয়। সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব সম্পর্কে বৃহত্তর প্রমাণ উপলব্ধ হয়ে ওঠায় বৈজ্ঞানিক সমাজ বর্তমানে মহাবিশ্বের বিস্তারের যুক্তি সমর্থন করে।

নক্ষত্রের গঠন (Star Formation) :

শুরুতে মহাবিশ্বের পদার্থ ও শক্তির বণ্টন সমান ছিল না। এই প্রাথমিক ঘনত্বের পার্থক্যগুলো মহাকর্ষীয় শক্তির পার্থক্য বাড়ায় এবং এই কারণে পদার্থগুলো একসঙ্গে চলে আসে বা একত্রিত হয়। এগুলোই নক্ষত্রপুঞ্জ গঠনের ভিত্তি তৈরি করে। বিশাল সংখ্যক নক্ষত্র নিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ গঠিত হয়। নক্ষত্রপুঞ্জ হাজার হাজার আলোকবর্ষের পরিমাপের বিস্তৃত দূরত্বে ছড়িয়ে থাকে। প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাস 80,000-150,000 আলোকবর্ষের মধ্যে হয়ে থাকে। একটি নক্ষত্রপুঞ্জ গঠন হওয়া শুরু হয় হাইড্রোজেন গ্যাস সমন্বিত সুবিশাল গ্যাসীয় মেঘ থেকে যাকে বলা হত নীহারিকা। ক্রমবর্ধমান নীহারিকা ক্রমশ গ্যাসীয় পিণ্ডে পরিণত হয়। এই পিণ্ডগুলো অবিরত বৃদ্ধি পেয়ে এবং ঘনতর হয়ে গ্যাসীয় অবয়ব তৈরি করে যার থেকে নক্ষত্র গঠিত হয়। এটা মেনে নেওয়া হয় যে, 5-6 বিলিয়ন বছর আগে নক্ষত্র গঠিত হয়েছিল।

> আলোকবর্ষের মাধ্যমে দূরত্বের পরিমাপ করা হয়, সময়ের নয়। আলো সেকেন্ডে 3,00,000 কিমি গতিতে চলে। এই হিসাবে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। এক আলোকবর্ষ = 9.461×10^{12} কিমি। সূর্য ও পৃথিবীর গড় দূরত্ব হল 149,598,000 কিমি। আলোকবর্ষ হিসাবে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে 8.311 মিনিট।

গ্রহগুলোর গঠন (Formation of Planets):

নিম্নলিখিতগুলো গ্রহবিকাশের পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়।

(i) নক্ষত্রগুলো হল নীহারিকার মধ্যস্থিত গ্যাসপুঞ্জ। মহাকর্ষীয় বলের কারণে এই পুঞ্জের ভিতরে গ্যাসীয় মেঘের একটি কেন্দ্র তৈরি হয় যাকে ঘিরে চাকতির আকারে এক বিশাল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলা আবর্তন করতে থাকে।

(ii) পরবর্তী পর্যায়ে গ্যাসীয় মেঘ ঘনীভূত হতে শুরু করে এবং কেন্দ্রের চারদিকের পদার্থগুলো ছোটো ছোটো গোলাকার খণ্ডে পরিণত হয়। এই ছোটো ছোটো খণ্ডগুলো একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রহাণুতে (Planet-esimals) পরিণত হয়। খণ্ডগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও মহাকর্ষীয় কারণে উপাদানগুলো একত্রে জুড়ে গিয়ে বড়ো খণ্ড তৈরি করে। গ্রহকণিকাসমূহ হল বিশাল সংখ্যক ছোটো ছোটো খণ্ডের সমন্বয়।

(iii) শেষ পর্যায়ে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহকণিকাসমূহ একত্রিত হয়ে কিছু সংখ্যক বড়ো বড়ো অবয়ব তৈরি করে যা গ্রহতে পরিণত হয়।

আমাদের সৌরজগৎ (Our Solar System):

আমাদের সৌরজগৎ 8টি গ্রহ নিয়ে গঠিত। যে নীহারিকা থেকে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয় তার ধ্বংস হয়ে মূল গঠন শুরু হয় 5-5.6 বিলিয়ন বছর আগে কোনো এক সময়ে এবং গ্রহগুলো গঠিত হয় 4.6 বিলিয়ন বছর আগে। আমাদের সৌরজগৎ 8টি গ্রহ, 63 উপগ্রহ, লক্ষ লক্ষ গ্রহাণুপুঞ্জের মতো ক্ষুদ্রতর অংশ, ধূমকেতু এবং বিশাল পরিমাণ ধূলিকণা ও গ্যাসসমূহ নিয়ে গঠিত।

আটটি গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, এবং মঙ্গল এদেরকে বলা হয় অন্তঃস্থ গ্রহ (inner planet)। কারণ এগুলো সূর্য এবং গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়ের মাঝে অবস্থিত। অন্য চারটি গ্রহকে বলে বহিঃস্থ গ্রহ (outer planet)। প্রথম চারটিকে বলা হয় পৃথিবীস্বরূপ গ্রহ (terrestial) যার অর্থ পৃথিবীর মতো শিলা এবং ধাতু দ্বারা গঠিত এবং তুলনামূলকভাবে বেশি ঘনত্বযুক্ত। অবশিষ্ট চারটিকে জোভিয়ান (Jovian) অথবা বিশাল আকারের গ্যাসীয় গ্রহ (Gas Giant Planet) বলা হয়। 'Jovian' - মানে হল বৃহস্পতির মতো গ্রহ। এগুলো পৃথিবীস্বরূপ গ্রহগুলো থেকে অনেক বড়ো মূলত হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন সমন্বিত ঘন বায়ুমণ্ডল যুক্ত হয়। প্রায় 4.6 কোটি বছর আগে সব গ্রহগুলো প্রায় একই সময়ে গঠিত হয়। সম্প্রতিকালে অর্থাৎ আগস্ট, 2006 পর্যন্ত প্লুটো একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক অতীতে আবিষ্কৃত হয় যে, প্লুটো অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর (2003 UB_{313}) মতো, বলা যেতে পারে **ক্ষুদ্র গ্রহ (dwarf planet)**। আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

অন্তঃস্থ গ্রহগুলো কেন শিলাযুক্ত হয় যেখানে অন্য গ্রহগুলো মূলত গ্যাসীয় রূপে আছে?

পৃথিবীস্বরূপ এবং জোভিয়ান গ্রহগুলোর পার্থক্যের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো দায়ী :

(i) পৃথিবীস্বরূপ গ্রহগুলো গঠিত হয়েছিল **আদি নক্ষত্র** (Parent Star) এর কাছাকাছি স্থানে, এতে প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে গ্যাস ঘনীভূত হয়ে শক্ত উপাদানে পরিণত হয়। Jovian গ্রহগুলো গঠিত হয় দূরবর্তী স্থানে।

(ii) সূর্যের কাছে অবস্থিত তীব্র সৌরবায়ু পৃথিবীস্বরূপ গ্রহগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস ও ধূলো জ্বালিয়ে দেয়। দূরবর্তী অবস্থানের কারণে সৌরবায়ু জোভিয়ান গ্রহগুলো থেকে গ্যাস অপসারণের মতো তীব্র নয়।

(iii) পৃথিবীরস্বরূপ গ্রহগুলো আকারে ছোটো হওয়ায় এবং তাদের নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য নির্গত গ্যাসকে ধরে রাখতে পারে না।

চাঁদ (The Moon):

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবীর উৎপত্তির মতোই চাঁদের গঠন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। 1838 সালে স্যার জর্জ ডারউইন তার প্রস্তাবনায় বলেন যে, শুরুতে পৃথিবী এবং সূর্য

সৌরজগৎ (The Solar System)

	বুধ	*শুক্র*	*পৃথিবী*	*মঙ্গল*	*বৃহস্পতি*	*শনি*	*ইউরেনাস*	*নেপচুন*
দূরত্ব *	0.387	0.723	1.000	1.524	5.203	9.539	19.182	30.058
ঘনত্ব@	5.44	5.245	5.517	3.945	1.33	0.70	1.17	1.66
ব্যাসার্ধ#	0.383	0.949	1.000	0.533	11.19	9.460	4.11	3.88
উপগ্রহগুলো	0	0	1	2	প্রায় 53	প্রায় 53	প্রায় 27	13

* সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব জ্যোতির্বিদ্যার এককে — 149,598,000 km = 1 @ ঘনত্ব গ্রাম/সেমি^{3}-এ

\# ব্যাসার্ধ : নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ 6378.137 km = 1

Source: http://ptanetarynames.wr.usgs.gov/page/planets

দ্রুতগতিতে আবর্তিত দুটি পৃথক বস্তু হিসাবে গঠিত হয়েছিল। সমগ্র বস্তুপিণ্ডটি ডাম্বেল আকৃতির অবয়বরূপে গড়ে ওঠে এবং অবশেষে ভেঙে যায়। এটাও প্রস্তাবিত ছিল যে, বর্তমান প্রশান্ত মহাসাগরীয় খাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উপাদান দিয়ে চাঁদের গঠন হয়েছিল।

যা হোক, চাঁদের গঠন সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাগুলোর একটিও বর্তমানের বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেননি। সাধারণত এটাও বলা হয় যে, পৃথিবীর উপগ্রহরূপে চাঁদের গঠন বিশাল প্রভাব (Gaint impact) এর ফলশ্রুতি যাকে বর্ণনা করা হয় - 'মহাবিস্ফোরণ' (The Big Splat) হিসাবে। পৃথিবী গঠনের কিছুদিন পর মঙ্গলের তিনগুণ বড়ো আয়তনের এক মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয় এবং বিস্ফোরণে পৃথিবী থেকে এক বিশাল অংশ মহাকাশে এসে পড়ে। ঐ বিস্ফোরিত পদার্থ পৃথিবীর কক্ষপথ অনুসরণ করে চলতে থাকে এবং 4.44 বিলিয়ন বছর আগে ক্রমান্বয়ে বর্তমান চাঁদ গঠন করে।

পৃথিবীর বিবর্তন (Evolution of the Earth):

তোমরা কি জান পৃথিবীর গ্রহ প্রাথমিক অবস্থায় অনুর্বর, পাথুরে উত্তপ্ত বস্তু ছিল এবং যা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সমন্বিত পাতলা বায়ুমণ্ডল যুক্ত ছিল। এটি পৃথিবীর বর্তমান ছবি থেকে অনেকটাই আলাদা। অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাথুরে, অনুর্বর, উত্তপ্ত পৃথিবীর রূপান্তর ঘটে সুন্দর পৃথিবীতে যেখানে আছে অফুরন্ত জল এবং জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুসংগঠিত বায়ুমণ্ডল। পরবর্তী অংশে তোমরা দেখতে পাবে 4600 মিলিয়ন বছর ও বর্তমান সময়-এর মধ্যবর্তী সময়কাল কেমন ছিল এবং গ্রহপৃষ্ঠে জৈব বিবর্তনের কথা।

পৃথিবী স্তরে স্তরে গঠিত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের একেবারে বহিঃপ্রান্ত থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত সর্বস্তরে উপাদানগুলো সমভাবে নেই। বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলোর ঘনত্ব কম। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গভীরতর গভীরতায় পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাদান দ্বারা গঠিত।

পৃথিবীর স্তরপূর্ণ গঠন কীভাবে হয়েছে?

শিলামণ্ডলের ক্রমবিকাশ (Evolution of Lithosphere):

আদিম পর্যায়ে পৃথিবী অস্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। ঘনত্বের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে অভ্যন্তরের উপাদানগুলো তাদের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে তুলনামূলক ভারী উপাদানগুলো (লোহার মতো) কেন্দ্র অভিমুখে এবং হালকা উপাদানগুলো ভূ-পৃষ্ঠ অভিমুখে সরে যেতে থাকে। সময়ের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থগুলো ঠান্ডা, কঠিন ও ঘনীভূত হয়ে আকারে ছোটো হয়ে যায়। এইভাবে পরবর্তীকালে পৃষ্ঠদেশের বাইরের অংশ ভূ-ত্বকে পরিণত হয়। চাঁদের গঠনের সময়ে বিশাল প্রভাবে (giant impact) পৃথিবী আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবী গঠনের উপাদান বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইটি হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যে স্তরগুলো আমরা পাই তা হল — ভূ-ত্বক, গুরুমণ্ডল, বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল, অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল। ভূ-ত্বক থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত উপাদানের ঘনত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রত্যেকটি স্তরের ভৌতধর্মগুলো তথা বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলের ক্রমবিবর্তন (Evolution of Atmosphere and hydrosphere):

পৃথিবীর চারদিকে যে বায়ুমণ্ডল আছে তা প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। অধ্যায় 8-এ তোমরা বায়ুমণ্ডলের গঠন ও কাঠামোর সম্পর্কে জানবে।

বর্তমানে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার ক্রমবিকাশ তিনটি ধাপে হয়। প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হল আদিম বায়ুমণ্ডলের অবলুপ্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলের ক্রমবিকাশে পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যন্তরের অবদান আছে। অবশেষে বায়ুমণ্ডলের গঠন ও সংস্করণ জীবজগৎ তথা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে।

এটা মনে করা হত যে, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সমন্বিত প্রাথমিক বায়ুমণ্ডলের সৌরবায়ুর কারণে অবলুপ্তি ঘটেছে। এটা শুধু পৃথিবীর ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য পৃথিবীস্বরূপ গ্রহদের ক্ষেত্রেও, যেগুলো সৌরবায়ুর প্রভাবে তাদের আদিম পরিবেশ হারিয়ে ফেলেছিল। পৃথিবী শীতল হওয়ার সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরের কঠিন অংশ থেকে গ্যাস ও জলীয়বাষ্প নির্গত হয়। এটা থেকেই বর্তমান বায়ুমণ্ডলের বিবর্তন শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় বায়ুমণ্ডল বিশাল পরিমাণ জলীয়বাষ্প, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন নিয়ে গঠিত ছিল। ভূ-অভ্যন্তর থেকে গ্যাসসমূহের বাইরে আসার প্রক্রিয়াকে বলে গ্যাস নিঃসরণ (degassing)। অবিরাম অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত জলীয় বাষ্প ও গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছে।

পৃথিবীর শীতলীকরণ-এর সময় জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত (dissolved) হয়ে বৃষ্টির জলে পরিণত হয় এবং বেশি বেশি ঘনীভবন ও বৃষ্টির কারণে উষ্ণতা আবারও কমে যায়। সমুদ্র থেকে উত্থিত নিম্নচাপ বৃষ্টি তৈরি করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে তা পতিত

ভূতাত্ত্বিক সময়সূচি

যুগ	অধিযুগ	সময়কাল	উপযুগ	বর্তমান থেকে পূর্বের বছরে	বৈশিষ্ট্যমূলক জীব / উল্লেখযোগ্য ঘটনা
	সেনোজোয়িক বা নবজীবীয় (65 লক্ষ বছর আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)	কোয়াটার্নারি	হলোসিন	0 - 10,000	মানুষের বর্তমান রূপে আবির্ভাব
			প্লাইস্টোসিন	10,000 - 2 মিলিয়ন	হোমো সেপিয়ান্স
		টার্সিয়ারি	প্লায়োসিন	2 - 5 মিলিয়ন	আদি মানবের পূর্বপুরুষ তথা ল্যাজবিহীন বানর :
			মায়োসিন	5 - 24 মিলিয়ন	সপুষ্পক গুল্ম ও উদ্ভিদ
			অলিগোসিন	24 - 37 মিলিয়ন	বনমানুষ (গেরিলা জাতীয়)
			ইয়োসিন	37 - 57 মিলিয়ন	শশক তথা খরগোশ জাতীয় প্রাণী
			প্যালিওসিন	57 - 65 মিলিয়ন	ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণী
					বড়ো ও ছোটো ইঁদুর
	মেসোজোয়িক বা মধ্যজীবীয় 65-245 লক্ষ স্তন্যপায়ী	ক্রেটাসিয়াস		65 - 144 মিলিয়ন	ডাইনোসরের বিলুপ্তি
		জুরাসিক		144 - 208 মিলিয়ন	ডাইনোসরের যুগ
		ট্রায়াসিক		208 - 245 মিলিয়ন	ব্যাঙ এবং কচ্ছপের সৃষ্টি
	প্যালিওজোয়িক বা পুরাজীবীয় 245-570 লক্ষ	পার্মিয়ান		245 - 286 মিলিয়ন	উভচর প্রাণীর পরিবর্তে সরীসৃপের প্রাধান্য
		কার্বোনিফেরাস		286 - 360 মিলিয়ন	প্রথম সরীসৃপ :
					মেরুদণ্ডী প্রাণী : কয়লাক্ষেত্র
		ডেভোনিয়ান		360 - 408 মিলিয়ন	উভচর প্রাণী
		সিলুরিয়ান		408 - 438 মিলিয়ন	স্থলভাগে জীবনের প্রথম চিহ্ন
					প্রথম গাছের উদ্ভব
		অর্ডোভিসিয়ান		438 - 505 মিলিয়ন	প্রথম মাছের উদ্ভব
		কেম্ব্রিয়ান		505 - 570 মিলিয়ন	পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ছিল না: সমুদ্রে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব
প্রোটেরোজোয়িক	প্রাক কেম্ব্রিয়ান 570 মিলিয়ন - 4800 মিলিয়ন			570 - 2,500 মিলিয়ন	নরম শরীরযুক্ত সন্ধিপদ প্রাণী
আর্কিয়ান				2,500 - 3,800 মিলিয়ন	নীলাভ সবুজ শৈবাল
					এককোশী ব্যাকটেরিয়া
হেডেন				3,800 - 4,800 মিলিয়ন	মহাসাগর ও মহাদেশের গঠন
					মহাসাগর এবং বায়ুমণ্ডল
					কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।
নক্ষত্রের উদ্ভব	5000 - 13,700 মিলিয়ন			5,000 মিলিয়ন	সূর্যের উদ্ভব / উৎপত্তি
সুপারনোভা				12,000 মিলিয়ন	
বিগ ব্যাং				13,700 মিলিয়ন	মহাবিশ্বের উৎপত্তি

হয়। পৃথিবী গঠনের 500 মিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীতে মহাসাগর গঠিত হয়।

আমাদের এটা বলা হয়, মহাসাগর 4000 মিলিয়ন বছর বয়সি। 3800 মিলিয়ন বছরের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে জীবনের বিবর্তন শুরু হয়। এখন থেকে 2500-3000 মিলিয়ন বছর আগে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহুদিন ধরে জীবন সাগরের মধ্যেই সীমিত ছিল। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাসাগরে অক্সিজেন যুক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে প্রায় 2000 মিলিয়ন বছর আগে মহাসাগরগুলো অক্সিজেন দ্বারা সম্পৃক্ত হয় এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের প্রাচুর্য দেখা যায়।

জীবনের উদ্ভব (Origin of Life) :

পৃথিবীর বিবর্তনের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের সম্পর্ক আছে। সন্দেহাতীতভাবে এটা পরিষ্কার যে, প্রাথমিক স্তরে পৃথিবী এমনকি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল জীবের বিকাশ সংগঠনের সহায়ক ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জীবের উৎপত্তিকে এক ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা প্রথমে জটিল জৈব অণু তৈরি করে এবং তাদেরকে একত্রিত করে। এই সমাবেশটি এমন ছিল যে, এগুলো নিজেদেরকে নিষ্ক্রিয় বস্তু থেকে জীবন্ত পদার্থে রূপান্তর করতে পারে। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই গ্রহের উপর বিদ্যমান জীবনের তথ্যটি পাওয়া যায় শিলাস্থিত জীবাশ্মে। 3000 মিলিয়ন বছরে বেশি পুরোনো ভূতাত্ত্বিক গঠনে নীলাভ শৈবালের বর্তমান রূপ সদৃশ আণুবীক্ষণিক অবয়ব দেখা যায়। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, 3800 মিলিয়ন বছর আগে জীবন কখনো-কখনো শুরু হয়েছিল। 18 পৃষ্ঠায় ভূতাত্ত্বিক সময়সূচিতে জৈব বিবর্তনে এককোশী ব্যাকটেরিয়া থেকে আধুনিক মানুষের জীবন বৃত্তান্তের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর বাছাই করো :

(i) নীচের কোন্‌টি পৃথিবীর বয়স ?

(a) 4.6 মিলিয়ন বছর (c) 4.6 বিলিয়ন বছর

(b) 13.7 বিলিয়ন বছর (d) 13.7 ট্রিলিয়ন বছর

(ii) নীচের কোন্‌টিতে সবচেয়ে বেশি সময় বোঝায় ?

(a) যুগ (c) অধিযুগ

(b) সময়কাল (d) উপযুগ

(iii) নীচের কোন্‌টি বায়ুমণ্ডলের বর্তমান রূপের সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত নয় ?

(a) সৌরবায়ু (c) গ্যাস

(b) পৃথকীভবন (d) সালোকসংশ্লেষ

(iv) নীচের কোন্‌টি অন্তঃস্থ গ্রহগুলোকে বোঝায় ?

(a) সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী গ্রহগুলো

(b) সূর্য ও গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়ের মধ্যবর্তী গ্রহগুলো

(c) গ্যাসীয় অবস্থাযুক্ত গ্রহগুলো

(d) উপগ্রহ বিহীন গ্রহগুলো

(v) পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় বর্তমান থেকে কত বছর আগে ?

(a) 13.7 বিলিয়ন (c) 4.6 বিলিয়ন

(b) 3.8 মিলিয়ন (d) 3.8 বিলিয়ন

2. 30 টি শব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(i) পৃথিবীস্বরূপ গ্রহগুলো শিলাযুক্ত কেন?

(ii) পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলোতে মূল পার্থক্য কী?

(a) কান্ট এবং লাপ্লেস

(b) চেম্বারলেন এবং মোল্টন

(iii) পৃথকীভবন প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝ?

(iv) প্রাথমিক স্তরে ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি কী রকম ছিল?

(v) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রথম দিকে কোন্ গ্যাসগুলো ছিল?

3. 150 টি শব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(i) বিগ ব্যাং তত্ত্বের ব্যাখ্যা লেখো।

(ii) পৃথিবীর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের তালিকা তৈরি করো এবং প্রত্যেক পর্যায়ের বিশদ বর্ণনা দাও।

প্রকল্পমূলক কাজ :

নিম্নলিখিত লেখাগুলো অনুয়ায়ী 'প্রকল্প স্টারডাস্ট' সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করো (ওয়েবসাইট : *www.sci.edu/public.html* and *www.nasm.edu*)

(i) কোন্ সংস্থা এই 'নক্ষত্র মধ্যস্থিত ধুলা প্রকল্প' বা 'Stardust' প্রকল্প চালু করেছে?

(ii) বিজ্ঞানীরা কেন নক্ষত্র মধ্যস্থিত ধুলা (Stardust) সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়?

(iii) 'নক্ষত্র মধ্যস্থিত ধুলা' কোথা থেকে সংগৃহীত হয়?

অধ্যায়

3

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

INTERIOR OF THE EARTH

পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমরা কি কল্পনা করতে পারো? তোমরা কি ভাবতে পারো? পৃথিবী একটি ক্রিকেট বলের মতো শক্ত বল অথবা ফাঁপা বল, যার উপরে রয়েছে শিলার পুরু আবরণ, যাকে বলা হয় শিলামণ্ডল। তুমি কি দূরদর্শনে কখনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ছবি বা আলোকচিত্র দেখেছ? আগ্নেয় গহ্বর থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত লাভা, ধূলা, ধোঁয়া আগুন এবং ম্যাগমা উদ্‌গমনের কথা মনে আছে কি? কিছু পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে বুঝতে হয় কারণ কেউ পৃথিবীর অভ্যন্তরে পৌঁছাতে পারেনি এবং পারবেও না।

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন মূলত পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলোর ফলাফল। অন্তর্জাত এবং বহির্জাত প্রক্রিয়াগুলো অবিরাম ভূমিরূপের আকৃতি তৈরি করে চলেছে। অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাবকে বিবেচনার বাইরে রাখলে কোনো অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোনো অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির ঐ অঞ্চলের মানবজীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব আছে। সেজন্য ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। পৃথিবী কেন নড়ে ওঠে, সুনামি তরঙ্গের কীভাবে উৎপত্তি হয়, তা বুঝতে গেলে, আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের কিছু বিবরণ জানতে হবে। পূর্বের অধ্যায়ে তোমরা লক্ষ করেছ যে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে পৃথিবীর গঠনের উপাদানগুলো বিস্তৃত আছে। এটা একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার কীভাবে বিজ্ঞানীরা এই স্তরগুলো এবং ওই স্তরগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র এগুলোই আলোচিত হবে।

অভ্যন্তরীণ তথ্যের উৎসসমূহ (SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE INTERIOR) :

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6370 কিমি। কেউ পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে না। পর্যবেক্ষণ অথবা উপাদানগুলোর নমুনা সংগ্রহ করতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে তোমরা অবাক হয়ে যেতে পারো, কীভাবে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তর এবং এত গভীরে কী ধরনের উপাদান আছে সে সম্বন্ধে আমাদের বলেন। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে অনুমান এবং কিছু সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আমাদের অধিকাংশ ধারণা গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও তথ্যের একটি অংশ সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

প্রত্যক্ষ উৎস (Direct Sources) :

ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলায় এবং খনি থেকে পাওয়া শিলায় সহজেই পৃথিবী গঠনের কঠিন উপাদানগুলো পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় 3/4 কিমি গভীরতায় স্বর্ণখনিগুলো আছে। এই গভীরতায় উষ্ণতা বেশি বলে যাওয়া সম্ভব নয়। ভূত্বকের গভীর থেকে গভীরতর অংশের অবস্থা আবিষ্কার করার জন্য খনি উত্তোলন ছাড়াও বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরে ভেদ করে অনুসন্ধান করেছেন। বিজ্ঞানী জগৎ দুটি প্রধান প্রকল্পের উপর কাজ করেছেন। যেমন - "গভীর সমুদ্র খনন প্রকল্প (Deep Ocean Drilling Project)" এবং "সমন্বিত সমুদ্র খনন প্রকল্প (Integrated Ocean Drilling Project)", গভীরতম খনন সংগঠিত হয়েছে কুমেরু মহাসাগরের কোলাতে, এটি ভূ-গর্ভের 12 কিমি-এর গভীরে রয়েছে। এটি এবং অনেকগুলো গভীর খনন প্রকল্পে বিভিন্ন গভীরতায় উপাদানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশাল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হল আর এক ধরনের প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বেরিয়ে আসা গলিত পদার্থ (ম্যাগমা) গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এ ধরনের ম্যাগমার উৎস থেকে গভীরতা নির্ণয় করা কঠিন বিষয়।

পরোক্ষ উৎসসমূহ (Indirect Sources) :

পদার্থজাত সম্পদের বিশ্লেষণ পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। খনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জানি দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে গভীর থেকে গভীরতর অংশে তাপমাত্রা ও চাপ বাড়তে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তনের হার খুঁজে বের করা সম্ভব। পৃথিবীর মোট কতটা পুরু (thickness), এটা জেনে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন বিভিন্ন গভীরতায় তাপমাত্রা, চাপ, উপাদানের ঘনত্ব কী রকম হবে, প্রত্যেকটি স্তরের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশদ বিবরণ এই অধ্যায়ের পরের অংশে আলোচিত হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে পতিত উল্কা হল তথ্যের আর এক উৎস। এটা লক্ষ্যণীয় যে, উল্কা বিশ্লেষণ করে যে পদার্থগুলো পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর অভ্যন্তরের নয়। উল্কার উপাদান এবং গঠন পর্যবেক্ষণে পৃথিবীর উপাদানের মিল পাওয়া যায়। উল্কার কঠিন অংশগুলোর সঙ্গে আমাদের গ্রহের মিল আছে — এগুলোও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তথ্যের আর একটি উৎস হতে পারে।

অন্যান্য পরোক্ষ উৎসের মধ্যে আছে মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এবং ভূ-কম্পীয় কার্যকলাপ। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশে মহাকর্ষীয় বল (g) এক নয়। এটা মেরু অঞ্চলে বেশি এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে কম। কারণ কেন্দ্র থেকে মেরু অঞ্চলের দূরত্বের চেয়ে কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার দূরত্ব বেশি। পদার্থের ভরের উপর নির্ভর করে মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মধ্যে পদার্থের ভরের অসম বণ্টন মহাকর্ষীয় বলকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন স্থানে মাধ্যাকর্ষণের পাঠ অন্যান্য অনেক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পাঠ প্রত্যাশিত মান থেকে পৃথক হয়। এই পার্থক্যকে বলা হয় ***মাধ্যাকর্ষণ বৈপরীত্য*** *(gravity anomaly)*। মাধ্যাকর্ষণ বৈপরীত্য ভূ-ত্বকীয় উপাদানগুলোর ভর বণ্টনের সম্পর্কে আমাদের তথ্য দেয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্য দেয় এমন উৎসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভূমিকম্পের কার্যকলাপ। তাই আমরা বিশদভাবে এটি নিয়ে আলোচনা করব।

ভূমিকম্প (Earthquake) :

ভূমিকম্প তরঙ্গের গবেষণা করলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরগুলোর সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। সহজ ভাষায় ভূমিকম্প বলতে বোঝায় পৃথিবীর নড়ে ওঠা বা কেঁপে ওঠাকে। এটি একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। শক্তি নির্গমনের কারণে উৎপন্ন তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পৃথিবী কেন কেঁপে ওঠে? (Why does the earth shake?):

চ্যুতি বরাবর শক্তির উত্থান ঘটে। চ্যুতি হল ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলায় তীক্ষ্ণ ফাটল। শিলাস্তরের চ্যুতি বরাবর বিপরীতমুখী চলার ঝোঁক থাকে। উপরের শিলাস্তরের চাপে এবং ঘর্ষণজনিত কারণে এগুলো একত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়। যা হোক এদের মধ্যে কোনো এক সময়ে ঘর্ষণের এই বাধা অতিক্রম করার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে শিলাখণ্ডগুলো ভেঙে যায়, অবশেষে সেগুলো আকস্মিকভাবে একে অপরের উপর ধসে পড়ে। এটা শক্তি নির্গমনের কারণে হয় এবং শক্তি তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূগর্ভের যে স্থানে শক্তির নির্গমন ঘটে, তাকে বলে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (*focus* or *hypocentre*)। আর এই তরঙ্গশক্তি চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে কেন্দ্রে পৌঁছায়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে কাছে ভূ-পৃষ্ঠে যে বিন্দুতে প্রথম ভূ-কম্পন অনুভূত হয় তাকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (*epicentre*) বলে, এটি কেন্দ্র থেকে সোজাসুজি উপরে অবস্থিত।

ভূ-কম্প তরঙ্গ (Earthquake Waves) :

স্বাভাবিক ভূমিকম্পের সবগুলো শিলামণ্ডলে সংগঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে শিখবে। এখানে এটুকু জেনে নেওয়া যথেষ্ঠ যে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 200 কিমি গভীরতা পর্যন্ত শিলামণ্ডলের বিস্তৃতি। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো তরঙ্গকে লিপিবদ্ধ (record) করে যে যন্ত্র তাকে বলে **ভূমিকম্প নির্ণয়কারী যন্ত্র বা সিস্‌মোগ্রাফ**। চিত্র 3.1-এ দেখানো হয়েছে, ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবিধি বক্ররেখার দ্বারা সিস্‌মোগ্রাফে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ্যনীয় যে, বক্ররেখার দ্বারা তিন ধরনের আলাদা ভাগ দেখানো হচ্ছে — প্রত্যেকটি পৃথক ধরনের ভূ-কম্প তরঙ্গকে বোঝাচ্ছে। ভূকম্প তরঙ্গ প্রধানত দুই ধরনের হয় দেহতরঙ্গ (Body waves) এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Surface waves) শক্তি নির্গমনের কারণে ভূমিকম্পের কেন্দ্রে দেহ তরঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং তা পৃথিবীর দেহে তথা ভূগর্ভে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই একে দেহতরঙ্গ বলে। দেহতরঙ্গের

যখন ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলার সঙ্গে সংযোগ ঘটে, তখন শুরু হয় এক নতুন তরঙ্গের যাকে বলা হয় পৃষ্ঠতরঙ্গ। এই তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-অভ্যন্তর নানা ধরনের ঘনত্বযুক্ত উপাদানে তৈরি হওয়ার কারণে ভূকম্প তরঙ্গের গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। তরঙ্গ যখন বিভিন্ন ঘনত্বযুক্ত উপাদানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কারণে তাদের গতিপথও পরিবর্তিত হয়।

চিত্র **3.1** : ভূকম্প তরঙ্গ

দেহতরঙ্গ দু-ধরনের হয় — P এবং S তরঙ্গ। P তরঙ্গ খুব দ্রুত যায় এবং প্রথমে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় এদেরকে প্রাথমিক তরঙ্গও বলা হয়। P-তরঙ্গের সঙ্গে শব্দ তরঙ্গের মিল পাওয়া যায়। এই তরঙ্গগুলো কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তরঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। S-তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় কিছু সময় পরে, তাদের বলা হয় গৌণ তরঙ্গ। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এগুলো কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। S-তরঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বুঝতে সাহায্য করেছে। প্রতিফলনে তরঙ্গের প্রতিক্ষেপ ঘটে। প্রতিসরণের কারণে তরঙ্গ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিস্‌মোগ্রাফের সাহায্যে তরঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক্‌গুলো সিদ্ধান্তমূলকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। পৃষ্ঠতরঙ্গ হল সিস্‌মোগ্রাফের শেষ বিবরণ (Report)। এই তরঙ্গগুলো খুব ধ্বংসাত্মক হয়। এদের কারণে শিলাস্তরের স্থানচ্যুতি হয় এবং কাঠামো ভেঙে পড়ে।

ভূকম্প তরঙ্গের বিস্তার (Propagation of Earthquake Waves) :

বিভিন্ন ধরনের ভূকম্প তরঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের অতিক্রমণের সময় ভূকম্পের বিস্তারের কারণে শিলাস্তর কেঁপে ওঠে। P-তরঙ্গের সমান্তরালে কম্পনের সৃষ্টি হয়, বিস্তারের দিক্ অনুযায়ী P-তরঙ্গ উপাদানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। উপাদান তথা পদার্থের উপর চাপের প্রসারণ ও সংকোচনের কারণে উপাদানের ঘনত্বের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। অন্য তিনটি তরঙ্গের কম্পন বিস্তারের দিকের সঙ্গে উল্লম্বভাবে হয়ে থাকে। উল্লম্ব সমতলে S-তরঙ্গ সমকোণে প্রবাহিত হয়। এগুলো যে উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাতে উঁচুনীচু (troughs & crests) ভূমিভাগ তৈরি করে। S-তরঙ্গ হল সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক।

ছায়াবলয় বা ছায়া অঞ্চলের উদ্ভব (Emergence of Shadow Zone):

অনেক দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে যাওয়া ভূমিকম্পের লিপিবদ্ধ তথ্য সিস্‌মোগ্রাফে পাওয়া যায়। যা হোক, কিছু বিশেষ অঞ্চল আছে যেখানে তরঙ্গ পৌঁছায় না, এরকম অঞ্চলকে বলে **ছায়াবলয়**। প্রত্যেক ভূমিকম্পের ঘটনা বিচার করলে দেখা যায়, প্রতিটি ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ছায়াবলয় পাওয়া যায়। চিত্র 3.2 (ক) এবং (খ) তে P এবং S তরঙ্গের ছায়া অঞ্চল দেখানো হয়েছে। এটি পরিলক্ষিত হয় যে, সিস্‌মোগ্রাফ P ও S তরঙ্গের ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের 105° দূরত্ব পর্যন্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারে। যা হোক, সিস্‌মোগ্রাফে নির্ণীত হয়েছে 145°-এর নীচে P তরঙ্গ পৌঁছাতে পারে কিন্তু S তরঙ্গ পৌঁছতে পারে না। তাই উপকেন্দ্র থেকে $105^0 - 145^0$-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছায়াবলয় হিসাবে শনাক্ত করা হয়েছে। 105^0 -এর পরবর্তী অঞ্চলে S-তরঙ্গ পৌঁছায় না। S তরঙ্গের ছায়া অঞ্চল P তরঙ্গের ছায়া অঞ্চল থেকে বড়ো হয়। 105^0 থেকে 145^0 এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে P-তরঙ্গের ছায়াবলয়কে পৃথিবীর চারপাশে একটি বন্ধনীর (bend) মতো দেখায়। S-তরঙ্গের ছায়াবলয় শুধুমাত্র বিস্তৃতিতে বৃহত্তর নয়। এটা পৃথিবীপৃষ্ঠের 40% এর বেশি অংশ দখল করে আছে। যদি তুমি ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থান জান তাহলে যে-কোনো ভূমিকম্পের ছায়াবলয় আঁকতে পারবে (28 পৃষ্ঠায় 'কাজ' উল্লিখিত বক্স-এ জানতে পারবে কোনো স্থানের গঠিত ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থান কীভাবে বের করা যায়।)

ভূমিকম্পের প্রকারভেদ (Types of Earthquakes)

(i) ভূমিকম্পের মধ্যে সাধারণত সবচেয়ে যেটা বেশি হয়, তা হল **ভূ-গাঠনিক ভূমিকম্প** (*tectonic earthquakes*)। শিলাস্তর চ্যুতিরেখা বরাবর সরে যাওয়ার কারণে এর উৎপত্তি হয়।

(ii) এক বিশেষ ধরনের ভূ-গাঠনিক ভূমিকম্প হল **অগ্ন্যুৎপাতজনিত ভূমিকম্প** (*volcanic earthquake*) । সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে এটি হয়ে থাকে।

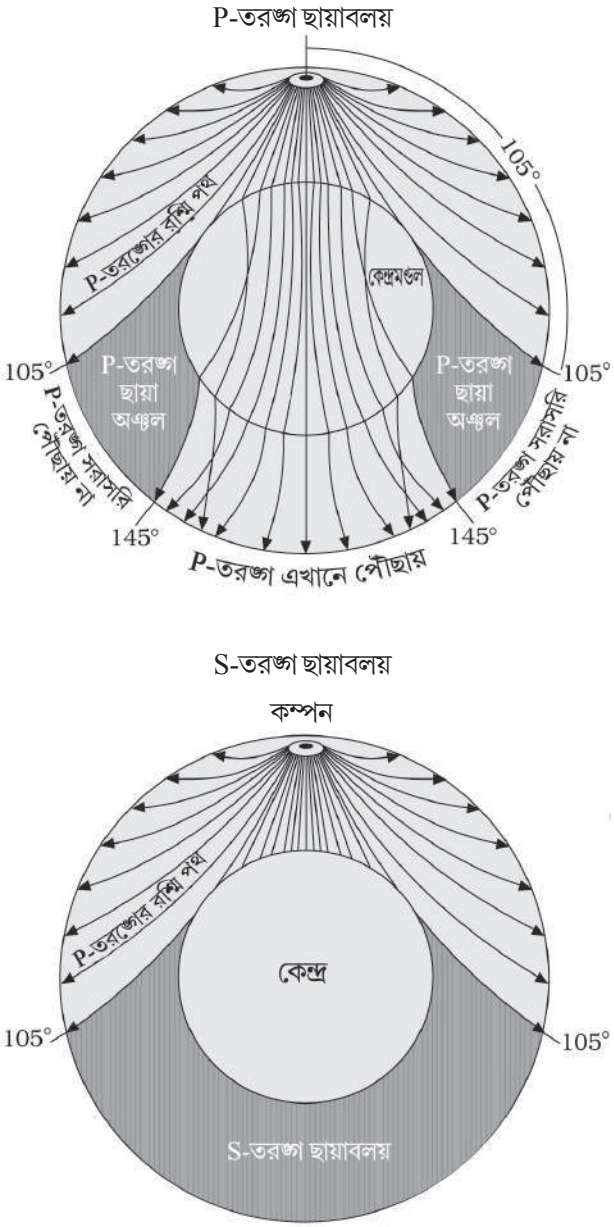

চিত্র 3.2 : (ক) এবং (খ) ভূমিকম্প দ্বারা ছায়া বলয়

(iii) যে অঞ্চলে খনির কাজ খুব বেশি হয়, সেখানে মাটির নীচের খনিগুলোর ছাদ মাঝে মাঝে মৃদু কম্পনে ধসে যায়। একে পতনজনিত **ভূমিকম্প বা ধসজনিত ভূমিকম্প** (*collapse earthquakes*) বলে।

(iv) রাসায়নিক অথবা পরমাণু বিস্ফোরণে যখন ভূমি নড়ে ওঠে তখন যে ভূমিকম্প হয়, তখন তাকে বলা হয় **বিস্ফোরণ ভূকম্পন** (*explosion earthquakes*)।

(v) এ ধরনের ভূমিকম্প বিশাল জলাধারযুক্ত অঞ্চলে হয় অর্থাৎ নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার গঠন করার ফলে বিপুল পরিমাণ জলরাশির চাপে শিলাস্তরের ভারসাম্য নষ্ট হলে যে ভূকম্পন তৈরি হয় তাকে **জলাধার প্রভাবিত ভূমিকম্প** (*reservoir induced earthquakes*) বলে।

ভূমিকম্পের পরিমাপক (Measuring Earthquakes) :

ভূমিকম্পের পরিমাপ করা হয় এর তীব্রতা অথবা প্রাবল্য অনুসারে। ভূকম্পের তীব্রতা পরিমাপক এই স্কেলকে বলে ***রিখ্‌টার স্কেল*** (*Richter scale*)। ভূকম্পের কারণে নির্গত শক্তির উপর নির্ভর করে কম্পনের মাত্রা নির্ধারিত হয়। এই মাপ প্রকাশিত হয় 0 – 10 এই নম্বরে। একজন ইতালীয় ভূকম্প বিজ্ঞানী মার্কেলির নাম অনুসারে তীব্রতা মাপার এই স্কেলের নাম হয় **মার্কেলি স্কেল**। ভূকম্প দ্বারা গঠিত দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতি দেখে এই স্কেলের মাধ্যমে ভূকম্পের তীব্রতার পরিমাপ করা হয়। এটি দেখে তীব্রতা মাপার পরিসর 1 – 12 পর্যন্ত হয়।

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effects of Earthquake)

ভূমিকম্প হল একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। নিম্নলিখিতগুলো হল ভূমিকম্পের তাৎক্ষণিক বিপদজনক ফলাফল।

(i) ভূমির কম্পন
(ii) পার্থক্যমূলক স্থলবসতি
(iii) ভূমিধস ও কর্দমপ্রবাহ
(iv) মৃত্তিকার তরলীকরণ
(v) বিপদগ্রস্ত ভূমিভাগ
(vi) হিমানী সম্প্রপাত
(vii) ভূতলের স্থানচ্যুতি
(viii) নদী বাঁধ ও স্বাভাবিক বাঁধ ভেঙে বন্যা
(ix) আগুন
(x) কাঠামো ভেঙে পড়া
(xi) পতনশীল বস্তু
(xii) সুনামি

উপরিউক্ত তালিকার প্রথম ছয়টি ভূমিরূপের উপর সংগঠিত হয়। অন্যগুলো ঐ অঞ্চলের জীবন ও সম্পত্তির উপর তাৎক্ষণিক ফলাফল বিশেষ। সমুদ্রের জলের নীচে কম্পনের মাত্রা যখন যথেষ্ট বেশি হয় তখন উপকেন্দ্রে সুনামির প্রভাব দেখা যায়। সুনামি ভূমিকম্প নয়, সুনামি হল কতগুলো তরঙ্গ যা কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের প্রকৃত সক্রিয়তা কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থায়ী হয় এবং রিখ্‌টার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা যদি 5-এর বেশি হয় তবে এর ফলাফল বিধ্বংসী হয়।

সমুদ্র তরঙ্গের ধ্বংসের একটি দৃশ্য - মেরিনা সৈকত

সুনামি দ্বারা সংগঠিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মানুষ হাঁটছে — কলম্বোর উপকূলীয় অঞ্চল, শ্রীলঙ্কা

সুনামি দ্বারা ধ্বংসের একটি দৃশ্য — থাইল্যান্ড

সুনামি দ্বারা গঠিত ধ্বংসের একটি দৃশ্য — ইন্দোনেশিয়া

ভূমিকম্প দ্বারা সংগঠিত ঘটনাবলির কম্পাঙ্ক (Frequency of Earthquake Occurrences):

ভূমিকম্প হল একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যদি বড়ো মাপের (উচ্চ তীব্রতাযুক্ত) ভূমিকম্প হয়, এটা জীবন ও সম্পত্তির বিশাল ক্ষতি করে। এমন নয় যে, ভূগোলকের সব অংশই বড়ো ভূকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বণ্টন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। লক্ষণীয় যে,

ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আমন সেতু — লাইন অফ কন্ট্রোল (LOC), উরি

উচ্চ তীব্রতা তথা 8+ যুক্ত ভূমিকম্প খুব কম হয়। এগুলো 1-2 বছরে একবার সংঘটিত হয়। অন্যদিকে মৃদু ভূকম্পনগুলো এক মিনিট স্থায়ী হয়।

পৃথিবীর গঠন (Structure of the Earth):

ভূ-ত্বক (The Crust):

ভূ-ত্বক হল পৃথিবীর একেবারে বাইরের কঠিন অংশ, এটা ভঙ্গুর প্রকৃতির । মহাসাগরীয় এবং মহাদেশীয় অঞ্চলে ভূ-ত্বকের ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের ঘনত্ব মহাদেশীয় ভূ-ত্বক থেকে তুলনায় কম। মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকের গড় ঘনত্ব যেখানে 5 কিমি সেখানে মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের ঘনত্ব 30 কিমি এর কাছাকাছি। প্রধান প্রধান পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের ঘনত্ব অধিকতর হয়। এটি হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে 70 কিমি পুরু হয়।

ভূ-ত্বক ভারী শিলা দ্বারা তৈরি যার ঘনত্ব 3 গ্রাম/সেমি^{3}। মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকে এধরনের শিলা পাওয়া যায়। যেমন- ব্যাসাল্ট। মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকে উপাদানের গড় ঘনত্ব হল 2.7 গ্রাম/সেমি^{3}।

গুরুমণ্ডল (The Mantle):

ভূ-ত্বকের ভেতরের অংশটি হল গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডল মোহো থেকে একনাগাড়ে 2900 কিমি গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। গুরুমণ্ডলের উপরের অংশকে বলে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার। অ্যাসথেনোস্ফিয়ার শব্দটির অর্থ হল হালকা বা পাতলা। এটি (অ্যাসথেনোস্ফিয়ার) 400 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। আগ্নেয়গিরির

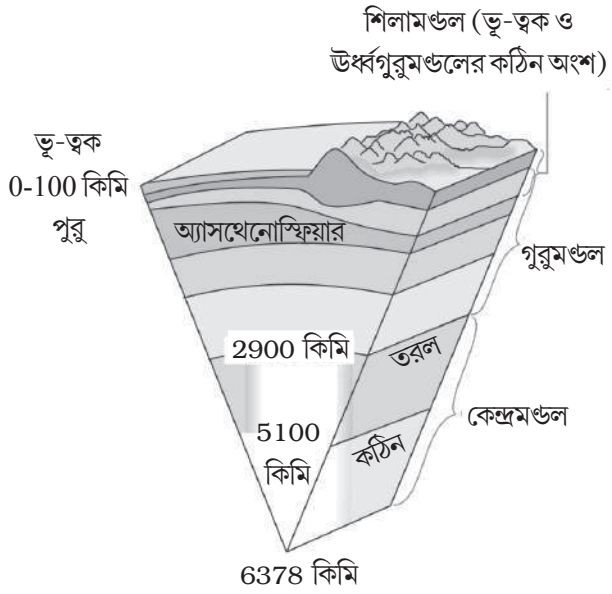

চিত্র 3.4 : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

অগ্ন্যুৎপাতের সময় ম্যাগমা প্রধানত অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়, যা ম্যাগমার (Magma) প্রধান উৎস।

ভূ-ত্বকের ঘনত্বের (3.4 গ্রাম/সেমি^{3}) থেকে অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের ঘনত্ব অধিকতর হয়, ভূ-ত্বক এবং গুরুমণ্ডলের উপরের অংশকে বলা হয় শিলামণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল (Lithosphere)। এর গভীরতা 10-200 কিমি পর্যন্ত। নিম্ন গুরুমণ্ডল অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের পর থেকে বিস্তৃত। এটা কঠিন অবস্থায় থাকে।

কেন্দ্রমণ্ডল (The Core):

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবেগ পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের অস্তিত্ব বুঝতে সাহায্য করে। গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের সীমানা 2900 কিমি গভীরতায় অবস্থান করে। বহিঃ কেন্দ্রমণ্ডল আছে তরল অবস্থায় যেখানে অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল আছে কঠিন অবস্থায়। গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের সীমানায় উপাদানগুলোর ঘনত্ব 5 গ্রাম/সেমি^{3} এবং 6300 কিমি গভীরতায় পৃথিবীর কেন্দ্রে ঘনত্ব হল 13 গ্রাম/সেমি^{3}। কেন্দ্রমণ্ডল প্রধানত অতি ভারী ভারী উপাদান নিয়ে গঠিত যেমন নিকেল এবং লোহা — একে **নিফে (নিকেল + ফেরাস) স্তর** বলে।

আগ্নেয়গিরি এবং আগ্নেয়গিরিজাত ভূমিরূপ (Volcanoes and Volcanic Landforms):

তোমরা আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অবস্থার আলোকচিত্র ও ছবি দেখেছ। আগ্নেয়গিরি এমন একটি স্থান যেখান থেকে গ্যাসসমূহ, ভস্ম, গলিত পদার্থ — লাভার ভূ-পৃষ্ঠে নির্গমন ঘটে। যে আগ্নেয়গিরি থেকে উপরিউক্ত পদার্থগুলোর নির্গমন প্রায়ই ঘটতে থাকে অথবা সাম্প্রতিক অতীতে নির্গমন ঘটে থাকে, ঐ আগ্নেয়গিরিকে বলে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। কঠিন ভূ-ত্বকের নীচের যে স্তর আছে, তাকে বলে **গুরুমণ্ডল**। গুরুমণ্ডলের ঘনত্ব ভূ-ত্বক থেকে বেশি। গুরুমণ্ডলের দুর্বলতম অঞ্চলকে বলে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার। এর মধ্য দিয়েই গলিত পদার্থগুলো ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডলের উপাদানগুলোকে বলা হয় **ম্যাগমা**। একসময় এটি ভূ-ত্বকের দিকে চলে আসে এবং ভূ-ত্বকে পৌঁছে যায় — তখন একে (ম্যাগমাকে) **লাভা** বলা হয়। লাভা প্রবাহের পথে পাইরোক্লাস্ট জাতীয় বর্জ্যপদার্থ, আগ্নেয় বোমা (volcanic bombs), ভস্ম, ধূলা, গ্যাসমসূহ যেমন- নাইট্রোজেন যৌগ, সালফার যৌগ, সামান্য পরিমাণ ক্লোরিন, হাইড্রোজেন এবং আর্গন ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

আগ্নেয়গিরি (Volcanoes):

অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি এবং ভূ-পৃষ্ঠে গঠিত ভূমিরূপের উপর নির্ভর করে আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ করা হয়। আগ্নেয়গিরির প্রধান ভাগগুলো নিম্নরূপ :

শিল্ড আগ্নেয়গিরিসমূহ (Shield Volcanoes):

লাভা ঘেরা শিল্ড আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর সব আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এ ধরনের আগ্নেয়গিরির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরিগুলো। এই আগ্নেয়গিরিগুলো

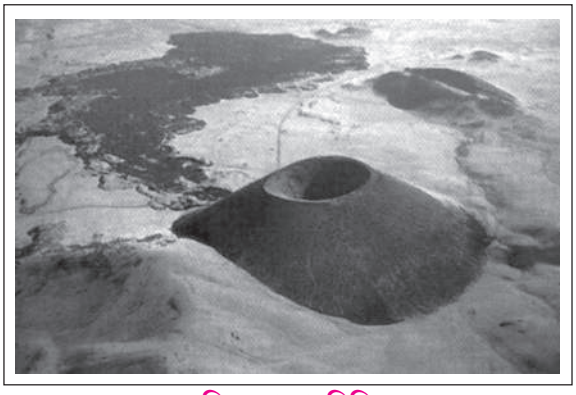

শিল্ড আগ্নেয়গিরি

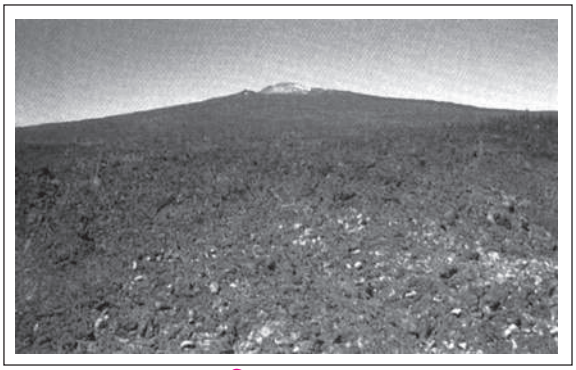

সিন্ডার শঙ্কু

মূলত ব্যাসাল্ট বা অত্যন্ত তরল লাভা দ্বারা গঠিত হয় যা অগ্ন্যুৎপাতের সময় বেরিয়ে আসে। এই কারণে এই আগ্নেয়গিরিগুলো খাড়া হয় না। আগ্নেয় গ্রীবায় (vent) জল প্রবেশ করলেই এগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটে, না হলে এগুলো বৈশিষ্ট্যগতভাবে কম বিস্ফোরক হয়। ঊর্ধ্বমুখী লাভা যখন শঙ্কু আকৃতির আগ্নেয় গ্রীবা দিয়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এসে **সিন্ডার শঙ্কু** (cinder cone) গঠন করে।

আগ্নেয়গিরিসমূহ (*Composite Volcanoes*):

এই আগ্নেয়গিরিগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলো অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত ব্যাসাল্ট থেকে অধিকতর ঠান্ডা ও সান্দ্র লাভা দ্বারা তৈরি হয়। এই আগ্নেয়গিরিগুলোতে প্রায়ই বিস্ফোরক অগ্নুৎপাত হয়ে থাকে। লাভার সাথে প্রচুর পরিমাণ পাইরোক্লাস্ট জাতীয় পদার্থ এবং ভস্ম ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসে। এই উপাদানগুলো আগ্নেয় গ্রীবার (vent) চারদিকে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়ায় আগ্নেয় পর্বত বা বিমিশ্র আগ্নেয়গিরি (composite volcanoes) তৈরি হয়।

বিমিশ্র আগ্নেয়গিরি

ক্যালডেরা (*Caldera*):

এ ধরনের আগ্নেয়গিরি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি। এগুলো সাধারণত এতটাই বিস্ফোরক হয় যে, অগ্নুৎপাতের সময় দীর্ঘকায় ভূ-কাঠামো না তৈরি করে প্রবণতা থাকে প্রবল বিস্ফোরণে ওইগুলোরই (আগ্নেয়গিরির) শীর্ষদেশ ভেঙে পড়ার। পতনজনিত কারণে নির্মিত অবনমিত ভূ-ভাগকে বলে **ক্যালডেরা**।

ব্যাসাল্ট অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ (*Flood Basalt Provinces*):

এই আগ্নেয়গিরিগুলোর ভেতর থেকে অত্যন্ত তরল লাভা বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। কয়েক হাজার কিমি জুড়ে পৃথিবীর কিছু কিছু অংশ এরকম পুরু ব্যাসাল্ট লাভাপ্রবাহ তথা লাভা দ্বারা আচ্ছাদিত। এরকম ধারাবাহিক লাভাপ্রবাহ চলতে থাকে। যার মধ্যে কিছু প্রবাহ 50 মিটারেরও বেশি পুরু হতে পারে। পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি লাভাপ্রবাহ শত শত কিমি বিস্তৃত হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্য মালভূমি তথা মহারাষ্ট্র মালভূমির বেশির ভাগ অংশ ব্যাসাল্ট লাভাপ্রবাহ দ্বারা গঠিত অঞ্চল। এটা মনে করা হয় যে, ট্র্যাপ অঞ্চলটি বর্তমানের চেয়ে অতীতে অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে ছিল।

মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরাস্থিত আগ্নেয়গিরি (*Mid-Ocean Ridge Volcanoes*):

এই আগ্নেয়গিরিগুলো মহাসাগরীয় অঞ্চলে দেখা যায়। সমস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 70,000 কিমি-র বেশি দূরত্ব জুড়ে এই মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা রয়েছে। শৈলশিরার মধ্যভাগে অনবরত অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গঠিত ভূমিরূপসমূহ (VOLCANIC LANDFORMS)

উদ্‌বেধী ভূমিরূপ (Intrusive Forms)

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে নির্গত লাভা শীতল হয়ে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়। লাভা শীতল হয় দু-জায়গায় — ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছানোর পর অথবা ভূ-ত্বকের ভেতরে লাভা কোনো স্থানে শীতল হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আগ্নেয় শিলার শ্রেণিবিভাগ হয় - যেমন নিঃসারী শিলা (ভূ-পৃষ্ঠে এসে ঠান্ডা হয়) এবং পাতালিক শিলা (ভূ-ত্বকের মধ্যে ঠান্ডা হয়)। ভূ-ত্বকীয় অংশে লাভা ঠান্ডা হয়ে যে শিলা তৈরি হয় তা বিভিন্ন ধরনের হয়। এগুলিকে বলা হয় **উদ্‌বেধী শিলা**। এধরনের কিছু ভূমিরূপ 3.5 চিত্রে দেখানো হল।

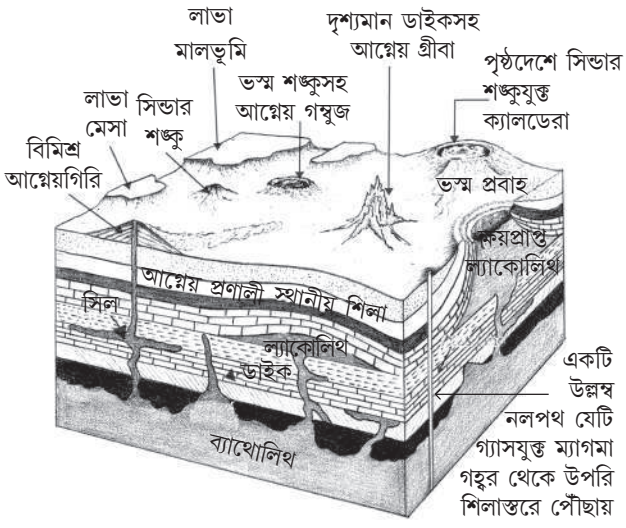

চিত্র 3.5 : আগ্নেয় ভূমিরূপ

ব্যাথোলিথ (*Batholiths*):

ম্যাগমাজাত এক বিশাল পরিমাণ উপাদান ভূ-ত্বকের অনেক গভীরে ঠান্ডা হয়ে বৃহদাকৃতি ঢিবি তৈরি করে। নগ্নীভবন প্রক্রিয়ায় উপরিস্থ উপাদানগুলো সরে গেলেই এগুলো দেখা যায়। এগুলো অনেকটা এলাকা জুড়ে অবস্থান করে এবং একই সঙ্গে কয়েক কিলোমিটার গভীরতাযুক্ত হয়ে থাকে। ব্যাথোলিথ হল **ম্যাগমা গহ্বর** (magma chamber) এর শীতল অংশ।

ল্যাকোলিথ (*Lacoliths*):

এগুলো হল বৃহদায়তন গম্বুজাকৃতি উদ্‌বেধী অবয়ব যার স্তরায়ন তল (base level) আছে এবং নীচ থেকে একটি নলের মতো প্রণালী দ্বারা সংযুক্ত। এটি বিমিশ্র আগ্নেয়গিরির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত আগ্নেয় গম্বুজগুলোর অনুরূপ, এগুলো গভীরতর গভীরতায় অবস্থান করে। এটি লাভার উৎস স্থান (localised source) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যার মাধ্যমে লাভা পৃষ্ঠদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। কর্ণাটক মালভূমি গ্রানাইট পাথরের গম্বুজাকৃতি পাহাড় যুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ এখন শল্কমোচন প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত ল্যাকোলিথ ও ব্যাথোলিথের উদাহরণ।

ল্যাপোলিথ, ফ্যাকোলিথ এবং সিল (*Lapolith, Phacolith and Sills*):

লাভা যখন ঊর্ধ্বমুখী হয়, হতে পারে তখন তার একটি অংশ অনুভূমিকভাবে সরে গিয়ে একটি নরম সমতল অংশ খুঁজে

কাজ : ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র শনাক্তকরণ

এর জন্য তোমার প্রয়োজন হবে

তিনটি সিস্‌মোগ্রাফ স্টেশন থেকে P-তরঙ্গ ও S-তরঙ্গের আগমনের তথ্য সংগ্রহ করা।

কার্যপ্রণালী (*Procedure*):

1. তিনটি স্টেশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রদত্ত ভূমিকম্পে P-তরঙ্গ ও S-তরঙ্গের আগমনের সময় খুঁজে বের করো।
2. প্রতিটি স্টেশনের P এবং S-তরঙ্গের আগমনের সময়ের ব্যবধান হিসাব করো। একে সময়ের ব্যবধান তথা time lag বলে। (লক্ষণীয় যে, সময়ের ব্যবধান ভূমিকম্পের কেন্দ্রের সঙ্গে সিস্‌মোগ্রাফ স্টেশনের দূরত্বের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।)

A. মৌলিক নিয়ম : সময়ের ব্যবধানের প্রতি এক সেকেন্ডে, ভূমিকম্প তোমার থেকে মোটামুটি 8 প্রায় কিমি দূরে থাকে।

3. উপরিউক্ত নিয়ম ব্যবহার করে প্রতিটি স্টেশনের সময়ের ব্যবধানকে দূরত্বে পরিবর্তিত করো। (# প্রতি সেকেন্ড সময়ের ব্যবধান * 8)।
4. একটি মানচিত্রে সিস্‌মোগ্রাফ স্টেশনগুলোকে চিহ্নিত করো।
5. সিস্‌মোগ্রাফ স্টেশনগুলোকে কেন্দ্র করে বৃত্তগুলো অঙ্কন করো। পূর্ববর্তী ধাপে তুমি হিসাব করে যে দূরত্ব (তিনটি স্টেশনের জন্য তিনটি দূরত্ব) বের করেছ তা হবে বৃত্তগুলির ব্যাসার্ধ (মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী দূরত্বকে পরিবর্তন করতে ভুলবে না)।
6. এই বৃত্তগুলো যে বিন্দুতে পরস্পরেক ছেদ করে, ঐ বিন্দুতেই উপকেন্দ্রের অবস্থান।

সাধারণ অনুশীলনে উপকেন্দ্রের শনাক্তকরণে কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর ভূ-ত্বকের পরিকাঠামো হিসেবে এগুলোকে ধরে নেওয়া হয়। শনাক্তকরণ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে গেলে শত শত কিলোমিটারের মধ্যে হতে পারে। এই কার্যপ্রণালীতে পরিকাঠামোর রূপরেখার সাধারণভাবে সরলীকৃত সংস্করণ নেওয়া হয়, সবগুলোর ক্ষেত্রে নীতি একই রকম হয়।

সাধারণ অনুশীলনে উপকেন্দ্রের শনাক্তকরণে কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর ভূ-ত্বকের পরিকাঠামো হিসেবে এগুলোকে ধরে নেওয়া হয়। শনাক্তকরণ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে গেলে শত শত কিলোমিটারের মধ্যে হতে পারে।

তথ্য						
স্টেশন (ভূকম্প সংগঠিত স্থান)	আগমনের সময়					
	P-তরঙ্গ			S-তরঙ্গ		
	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেন্ড	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেন্ড
S1	03	23	20	03	24	45
S2	03	22	17	03	23	57
S3	03	22	00	03	23	55
মানচিত্রের স্কেল 1 সেমি = 40 কিমি						

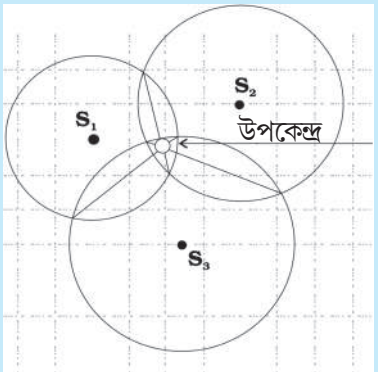

পায় এবং সেখানে জমাট বেঁধে পৃথক পৃথক রূপ গঠন করে। যখন একটি পিরিচ তথা থালা আকৃতির হয়, আকাশের মতো অবতল হয়, তখন তাকে ল্যাপোলিথ বলে। কোনো কোনো সময়ে তরঙ্গায়িত উদ্‌বেধী শিলা, ভাঁজযুক্ত আগ্নেয়শিলা অঞ্চলে অধোভঙ্গ তলে এবং ঊর্ধ্বভঙ্গের চূড়ায় অবস্থান করে। এই ধরনের তরঙ্গায়িত উপাদানগুলো ম্যাগমা গহ্বর (পরবর্তীকালে ব্যাথোলিথে পরিণত হয়) গঠনের সময় নিম্নস্থ উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই ভূমিরূপগুলোকে **ফ্যাকোলিথ** বলে।

প্রায় অনুভূমিক অথবা সমান্তরাল পাতের মতো উদ্‌বেধী আগ্নেয়শিলার অবয়বকে বলে **সিল অথবা শিট**। উপাদানের পুরুত্বের উপর নির্ভর করে সিল ও শিট -এর নামকরণ হয়। পাতলাটিকে বলে শিট এবং পুরু উদ্‌বেধী অবয়বকে বলে সিল।

ডাইকস্ (*Dykes*):

যখন লাভা ফাটল ও ফিসার দিয়ে ভূমিতে বেরিয়ে আসে এবং প্রায় ভূমির সঙ্গে উল্লম্বভাবে জমাট বেঁধে শক্ত হয়। একই অবস্থানে এটা শীতল হয়ে প্রাচীরের মতো কাঠামো গঠন করে, এ ধরনের কাঠামোকে বলে **ডাইকস্**। এগুলো সাধারণত উদ্‌বেধী রূপে পশ্চিম মহারাষ্ট্রীয় অঞ্চলে দেখা যায়। বিদার অগ্নুৎপাতের কারণে উদ্‌গত লাভা বিদার হিসাবে বিবেচিত হয়, যা নাকি দাক্ষিণাত্য মালভূমি গঠন করেছিল।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) নিম্নলিখিত ভূমিকম্প তরঙ্গাগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশি ধ্বংসাত্মক?

(a) P-তরঙ্গ (c) পৃষ্ঠ তরঙ্গ

(b) S-তরঙ্গ (d) উপরের কোনোটিই নয়।

(ii) নিম্নলিখিত কোন্‌টি পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের প্রত্যক্ষ উৎস?

(a) ভূকম্প তরঙ্গ (c) মহাকর্ষীয় বল

(b) আগ্নেয়গিরি (d) পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি

(iii) নিম্নলিখিত কোন্‌টি ডেকান ট্র্যাপ গঠনের কারণ :

(a) শিল্ড (c) বিমিশ্র

(b) ফিসার (d) ক্যালডেরা

(iv) নীচের কোন্‌টি শিলামণ্ডলকে বোঝায়?

(a) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গুরুমণ্ডল (c) ভূ-ত্বক এবং কেন্দ্রমণ্ডল

(b) ভূ-ত্বক এবং ঊর্ধ্বমণ্ডল (d) গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) দেহ তরঙ্গ কী?

(ii) পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের প্রত্যক্ষ উৎসগুলোর নাম লেখো।

(iii) ভূকম্প তরঙ্গ কেন ছায়াবলয় সৃষ্টি করে?

(iv) ভূকম্পীয় কার্যকলাপ ব্যতীত পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তথ্যের পরোক্ষ উৎসগুলো সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো।

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো 150 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে ভূ-কম্প বিস্তারের প্রভাবগুলো লেখো।

(ii) উদ্‌বেধী ভূমিরূপ বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন উদ্‌বেধী ভূমিকম্পের বিশদভাবে আলোচনা করো।

অধ্যায়

4

মহাসাগর ও মহাদেশসমূহের বণ্টন
DISTRIBUTION OF OCEANS AND CONTINENTS

পূর্বের অধ্যায়ে তোমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ (interior of the earth) সম্পর্কে জেনেছ। তোমরা ইতোমধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র সম্পর্কেও অবগত হয়েছে। তোমরা এটাও জান যে, ভূপৃষ্ঠের শতকরা 29 ভাগ মহাদেশসমূহ ও বাকি অংশ জলরাশি দ্বারা আবৃত। অতীতে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান বর্তমানে যেমন আছে তেমন ছিল না, ঠিক তেমনি বর্তমানে মহাদেশ ও মহাসাগরের অবস্থান যে ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হবে এটাও সর্বজন স্বীকৃত। যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন আসে অতীতে তাদের অবস্থান কেমন ছিল? কেন এবং কীভাবে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তিত করল? এমনকি যদি এটা সত্যি হয়, তবে কীভাবে মহাদেশের পরিবর্তন ঘটে, কীভাবে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে, তুমি আশ্চর্য হতে পারো যে, বিজ্ঞানীরাই বা কীভাবে তা জানল। কীভাবে বিজ্ঞানীরা অতীতে মহাদেশের অবস্থান নির্ণয় করল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর ও প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্নের উত্তর তোমরা এই অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে খুঁজে পাবে।

মহাদেশসমূহের সঞ্চরণ বা মহীসঞ্চরণ (CONTINENTAL DRIFT):

আটলান্টিক মহাসাগর ও তার বিপরীত দিকে সমুদ্র তটরেখা ভালো করে লক্ষ করলে তাদের তটরেখার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে তোমরা অবাক হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বিজ্ঞানীগণ এই সাদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশসমূহ কোনো এক সময়ে একত্রিত থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেছেন। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, 1596 সালে আব্রাহাম অর্টেলিয়াস (*Abraham Ortelius*) নামে একজন ডাচ (Dutch) মানচিত্র নির্মাণকারী সর্বপ্রথম এরকম অনুমান করেন। অ্যানটোনিও পেল্লেগ্রিনি (*Antonio Pellegrini*) একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তিনটি মহাদেশকে একসাথে দেখিয়েছিলেন। এরপর 1912 খ্রিস্টাব্দে জার্মান ভূপদার্থ বিজ্ঞানী তথা আবহবিদ আলফ্রেড ওয়েগনার (*Alfred Wegener*) যে ধারণাটি উপস্থাপন করেন, সেটিই সংশোধিত আকারে পরবর্তী সময়ে "মহীসঞ্চরণ মতবাদ" (continental drift theory) নামে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে। এটি ছিল মহাসাগর এবং মহাদেশগুলোর বণ্টন সংক্রান্ত তত্ত্ব।

ওয়েগনারের মতানুসারে, মহাদেশগুলো এক সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি বিরাট স্থলভাগ রূপে অবস্থান করত। আর এই একক মহাদেশকে বেষ্টন করে ছিল একটি বিশালাকার মহাসমুদ্র। তিনি এই বৃহৎ মহাদেশটির নাম দিয়েছিলেন '**প্যানজিয়া** (Pangaea)' যার অর্থ হল 'সমস্ত পৃথিবী'। আর বিশালাকার মহাসমুদ্রের নাম দেন '**প্যানথালাসা** (Panthalasa)' যার অর্থ হল 'সমস্ত জল' (all water)। তিনি এটাও বলেন, আনুমানিক 20 কোটি (200 মিলিয়ন) বছর আগে বৃহৎ মহাদেশটির ভাঙন শুরু হয়। প্যানজিয়া (Pangaea) প্রথমে দুটি অংশে বিভক্ত হয়। একটি হল লরেসিয়া (Laurasia) এবং অন্যটি হল গন্ডোয়ানাল্যান্ড (Gondwanaland)। লরেসিয়া ও গণ্ডোয়ানল্যান্ড পরবর্তী সময়ে ভেঙে আরও ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত হয়ে মহাদেশগুলো গঠিত হয়, যার অস্তিত্ব আমরা বর্তমানে দেখতে পাই। এই মহাদেশসমূহের সঞ্চরণের সমর্থনে নানান প্রমাণ রয়েছে। কিছু প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মহীসঞ্চরণের স্বপক্ষে প্রমাণ (Evidence in Support of the Continental Drift):

মহাদেশসমূহের আকারগত মিল (জিগ-স-ফিট) (*The Matching of Continents (Jig-Saw-Fit)*):

আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার তটরেখার মধ্যে একটি লক্ষণীয় মিল রয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের দুপাশের মহাদেশগুলোকে যদি একত্রিত করা যায় তবে দেখা যায় যে তারা পরস্পর মিশে একটি বিশাল ভূভাগ তৈরি করে। 1964 সালে বিজ্ঞানী বুলার্ড (Bullard) কম্পিউটার প্রোগ্রাম (computer programme) এর সাহায্যে এমনই একটি মানচিত্র তৈরি করেন। এটি বর্তমান তটরেখার পরিবর্তে 1000 ফ্যদম (fathom) রেখা দ্বারা অঙ্কন করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মহাসাগরের দু-পাশের সমসাময়িক শিলাসমূহের অবস্থান (*Rocks of Same Age Across the Oceans*):

আধুনিক যুগে রেডিওমেট্রিক ডেটিং পদ্ধতি (radiometric dating method) প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, মহাসাগরের উভয় তীরের মহাদেশগুলোর শিলাস্তর, স্তরক্রম, শিলাস্তরের ভাঁজের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। ব্রাজিল ও পশ্চিম আফ্রিকার উভয় উপকূলভাগে 200 কোটি (2000 মিলিয়ন) বছর আগের প্রাচীন শিলাস্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার সমুদ্র তটরেখার জুরাসিক যুগের (Jurassic age) বহু পুরাতন সামুদ্রিক অবক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অতীতে মহাসাগরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

টিলাইট (*Tillite*):

টিলাইট হল একটি পাললিক শিলা। হিমবাহ সঞ্চয়ের ফলে এটি তৈরি হয়। গন্ডোয়ানা যুগের পলল (sediment) বা পলি ভারতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের ছয়টি পৃথক ভূভাগে দেখা যায়। এই শিলার সর্বনিম্ন স্তরে টিলাইট-এর পুরু স্তর যা কি না ব্যাপক ও দীর্ঘায়িত হিমবাহ যুগের ইঙ্গিত বহন করে। একই রকম হিমবাহ গঠিত ভূমিরূপের সাদৃশ্য রয়েছে আফ্রিকা, ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপ, মাদাগাস্কার, অ্যান্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায়। সমগ্র ভূখণ্ডগুলোতে একই ধরনের গন্ডোয়ানা যুগের পলল সঞ্চয় পরিলক্ষিত হয় এবং এটি স্পষ্টভাবে অতীতের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। অতীতকালের জলবায়ুতে (palaeoclimates) এই ধরনের হিমবাহ টিলাইট গঠিত হয়েছিল যা মহীসঞ্চরণের উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয়।

প্লেসার সঞ্চয় (*Placer Deposits*):

আফ্রিকার ঘানা উপকূলে (Ghana coast) প্লেসার সঞ্চয় (placer deposits) দেখা যায়। এই প্লেসার সঞ্চয়ে মধ্যে স্বর্ণ বর্তমান। তবে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ঘানা উপকূল স্বর্ণ সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হলেও এই অঞ্চলে উৎস শিলা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। কিন্তু এই স্বর্ণ সমৃদ্ধ খনির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ব্রাজিলে। অনুমান করা যায় যে, অতীতে ঘানা এবং ব্রাজিল মালভূমি একই সঙ্গে অবস্থান করত এবং মহীসঞ্চরণের ফলে ঘানা ব্রাজিল মালভূমি থেকে পৃথক হয়ে বর্তমান অবস্থায় অবস্থান করছে। ঘানার স্বর্ণ সঞ্চয় তারই সাক্ষ্য বহন করে।

জীবাশ্মের বণ্টন (*Distribution of Fossils*):

যখন সামুদ্রিক প্রতিবন্ধকতার দুই বিপরীত পার্শ্বের স্বচ্ছ জলভাগ বা স্থলভাগে বসবাসকারী অনুরূপ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সেই পরিবেশে জীবনধারণের জন্য অভিযোজন করে থাকে, তখন তাদের বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, লেমুর (Lemur) এক প্রকার বানর জাতীয় প্রাণী যা ভারত, মাদাগাস্কার এবং আফ্রিকায় দেখা যায়। ধারণা করা হয় যে, এই তিনটি ভূভাগ অতীতে লেমুরিয়া (Lemuria) নামে একত্রে ছিল। আবার মেসোসিউরাস (Mesosaurus) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র সরীসৃপ জাতীয় জলজ প্রাণী যা অগভীর লবণাক্ত জলে অভিযোজিত হয় সেই প্রাণীর জীবাশ্ম পৃথিবীর দুটো স্থানেই পাওয়া যায়। একটি হল দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং অন্যটি হল ব্রাজিলের ইরাভার গঠিত অঞ্চল। বর্তমানে এই দুটো স্থানের মধ্যেকার দূরত্ব 4800 কিমি এবং দুটো স্থানের মধ্যে সুবিশাল মহাসাগর অবস্থান করছে।

মহীসঞ্চরণ জনিত বল (Force for Drifting):

মহাদেশগুলোর সঞ্চরণের কারণ হিসাবে ওয়েগনার (Wegener) দু-রকম বলের (force) কথা বলেছেন। একটি হল **বৈষম্যমূলক অভিকর্ষজ বল** (polar-fleeing force) এবং অন্যটি হল **জোয়ারি বল** (tidal force)। বৈষম্যমূলক অভিকর্ষজ বল পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা জান পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত এবং দুই মেরু চাপা। এর কারণ হল পৃথিবীর আবর্তন গতি। মহীসঞ্চরণের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে ওয়েগনার জোয়ারি বলের কথা বলেছেন। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তনের সময় চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে জলভাগে যে জোয়ার হয় সেই একই কারণে মহাদেশগুলোও সঞ্চারিত হয়। ওয়েগনার (Wegener) বিশ্বাস করতেন যে, বহু বছর ধরে এই বলগুলো কার্যকর ছিল। যদিও বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞরাই এই বলগুলোর (forces) কার্যকারিতা অস্বীকার করেন।

সঞ্চরণ পরবর্তী অধ্যয়ন (Post-drift Studies):

মহীসঞ্চরণের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, বেশির ভাগ প্রমাণ এবং ধারণা ফ্লোরা (flora) এবং ফনার (fauna) বণ্টন বা বিভিন্ন ধরনের পলল বা হিমবাহ অবক্ষেপ (deposits), যেমন টিলাইট-এর সঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে সকল নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো নানা ধরনের ভূতাত্ত্বিক তত্ত্বে নতুন তথ্য সংযোজিত করে। বিশেষত সমুদ্র তলদেশ সংক্রান্ত নানা তথ্য মহীসঞ্চরণ বিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনে দেয়।

পরিচলন স্রোত মতবাদ (*Convectional Current Theory*):

1930 এর দশকে আর্থার হোমস্ (Arthur Holmes) গুরুমণ্ডলে (mantle) পরিচলন স্রোতের (convection currents) প্রভাব অধিক হওয়ার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই স্রোত সাধারণত তেজস্ক্রিয় উপাদানের (radioactive elements) জন্যই সৃষ্টি হয়। গুরুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে এই স্রোতের তাপীয় (thermal) প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হোমসের (Holmes) এর মতে, গুরুমণ্ডলে পরিচলন স্রোতের তরঙ্গ প্রক্রিয়া বিদ্যমান। হোমস্ পরিচলন স্রোতের দ্বারা মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বৈজ্ঞানিকরা তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলোকে অস্বীকার করেন।

মহাসাগরীয় তলদেশের মানচিত্রীকরণ (*Mapping of the Ocean Floor*):

মহাসাগরগুলোর সৃষ্টি এবং আকার সংক্রান্ত বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর এটা স্পষ্ট যে, সমুদ্র তলদেশ শুধু বিস্তৃত সমতলই নয়, বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপও (relief) এখানে দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে (Post World War II) মহাসাগরীয় তলদেশ নিরীক্ষণ করার জন্য বিশেষ অভিযান চালিয়ে সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই মানচিত্রে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় যে, সমুদ্র তলদেশে যেমন সামুদ্রিক শৈলশিরা (oceanic mountain range) রয়েছে, তার পাশাপাশি গভীর মহীখাতও (deep trenche) রয়েছে। এই ধরনের ভূমিরূপগুলো সাধারণত মহাদেশীয় সীমানায় (continent margin) বা মহীঢালের সন্নিহিত স্থানে দেখা যায়। এই ভূমিরূপগুলোর মধ্যে মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা (mid-oceanic ridge) বেশি সক্রিয় এবং এটি আগ্নেয় উদ্গীরণের (volcanic eruptions) ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। শিলাস্তর সৃষ্টির সময়কাল (dating) নির্ণয়ের সময় এই তথ্য উঠে আসে যে, সামুদ্রিক পৃষ্ঠতলের শিলা মহাদেশীয় শিলা অপেক্ষা অনেক নবীন। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশগুলোর মহীঢালের পৃষ্ঠদেশের শিলা ও তাদের ভূতাত্ত্বিক সময়কালেও একই রকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

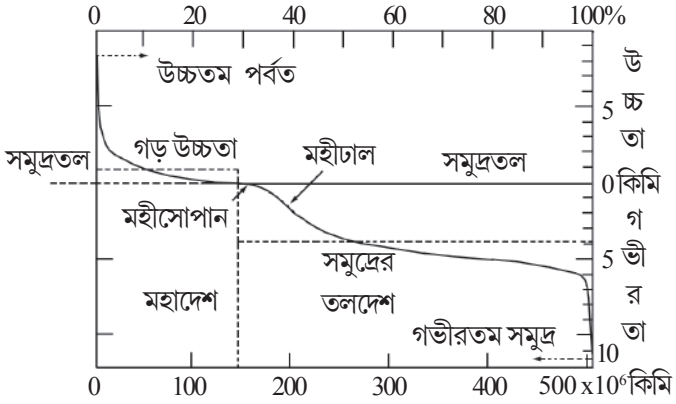

প্রত্যেক শ্রেণির উচ্চতানুযায়ী ক্রমবর্ধমান অঞ্চল

চিত্র **4.1** : মহাসাগরীয় তলদেশ

সমুদ্র তলদেশের গঠনশৈলী (Ocean Floor Configuration):

এই ভাগে আমরা মহাসাগরীয় তলের গঠনশৈলী সম্বন্ধীয় এমন কিছু তথ্য অধ্যয়ন করব, যা মহাসাগর এবং মহাদেশের সঞ্চরণ সম্বন্ধীয় ধারণা তৈরিতে সহায়ক হবে। মহাসাগরীয় তলদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাসাগরীয় তলদেশকে গভীরতা (depth) এবং ভূমিরূপের (relief) বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল মহাদেশীয় সীমা (continental margins), গভীর সমুদ্রের সমভূমি (deep-sea basins) এবং মধ্য সাগরীয় শৈলশিরা (mid-ocean ridges)।

মহাদেশীয় প্রান্তদেশ (*Continental Margins*):

মহাদেশীয় প্রান্তদেশ হল সমুদ্র উপকূলে মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগ এবং গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এর মধ্যে রয়েছে মহীসোপান, মহীঢাল, মহীউত্থান এবং গভীর সমুদ্রখাত। মহাদেশ এবং মহাসাগরসমূহের বণ্টন সম্পর্কে জানতে হলে গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাবিস্যাল্ সমভূমি বা গভীর সমুদ্রের সমভূমি (*Abyssal Plain*):

মহাদেশীয় প্রান্তদেশ (margin) এবং মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার (mid-oceanic ridge) মধ্যবর্তী অঞ্চল হল গভীর সমুদ্রের সমভূমি বা **অ্যাবিস্যাল সমভূমি** (abyssal plain)। মহাদেশীয় পলি (continental sediment) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মহাদেশীয় প্রান্তভাগ অতিক্রম করে এই অঞ্চলে সঞ্চিত হয়।

মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা (*Mid-Oceanic Ridge*):

মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা হল জলমগ্ন কতগুলো শৃঙ্গের (Ridge) সমষ্টি, যারা একে অপরের সাথে যুক্ত। মহাসাগরীয় জলরাশিতে ডুবে থাকা পৃথিবীপৃষ্ঠের সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘতম পর্বতশৃঙ্খল হল মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা। এই শৈলশিরার মধ্যভাগ উঁচু ফাটলবিশিষ্ট (rift system), ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (fractionated plateau) এবং পার্শ্ব অঞ্চল (flank zone) দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই শৈলশিরার মধ্যবর্ত ফাটলবিশিষ্ট অংশে অগ্ন্যুদ্গিরণ অধিক সক্রিয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির বণ্টন (Distribution of Earthquakes and Volcanoes):

ভূকম্পীয় গতিবিধি (seismic activity) এবং আগ্নেয়গিরি বণ্টন (distribution of volcanoes) চিত্র 4.2 তে দেখানো হয়েছে। চিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অংশে তটরেখা সংলগ্ন প্রায় সমান্তরালে একটি বিন্দুরেখা (line of dots) রয়েছে। এই রেখাটি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতীয় উপমহাদেশের কিছুটা দক্ষিণে এই রেখাটি দুটো ভাগে বিভক্ত, যার একটি পূর্ব আফ্রিকার দিকে প্রসারিত এবং অন্য ভাগটি মায়ানমার হয়ে নিউগিনির নিকটে একই রকম রেখায় যুক্ত হয়েছে। তোমরা লক্ষ করবে যে, বিন্দু রেখা মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরায় মিলিত হয়েছে। এখানে ছায়া বলয় (shaded belt) এর মাধ্যমে আল্পীয় হিমালয় (Alpine-Himalaya) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রান্তভাগ (rim of the Pacific Ocean) দেখানো হয়েছে। মধ্য মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীর অংশে অবস্থান করছে কিন্তু আল্পীয় হিমালয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

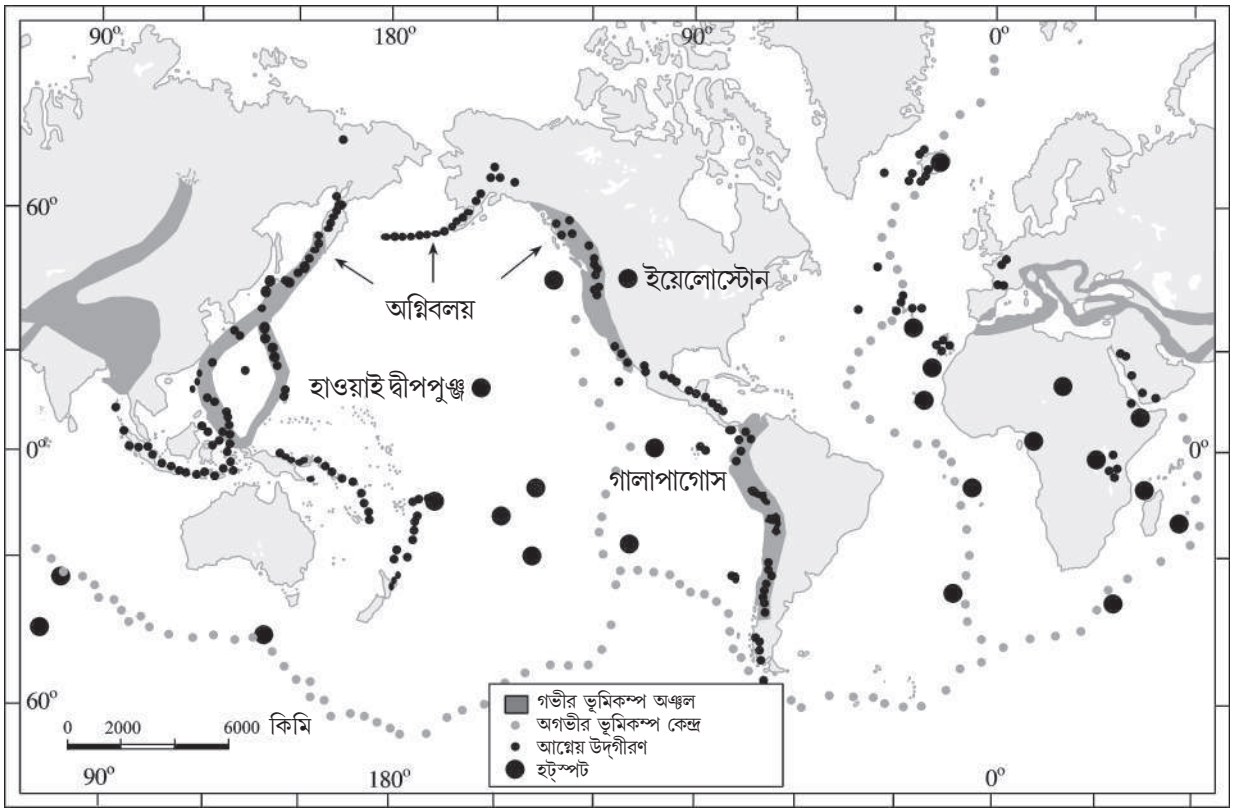

চিত্র **4.2** : ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির বণ্টন

অংশে ভূমিকম্পের কেন্দ্র গভীর অংশে অবস্থান করে। একই প্রক্রিয়ায় গাঢ় ছায়া চিত্রের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বণ্টন দেখানো হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রান্তভাগ **অগ্নি প্রান্ত বা রিম অফ্ ফায়ার** (rim of fire) নামেও পরিচিত। এখানে ব্যাপক মাত্রায় আগ্নেয় সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়।

সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতির ধারণা (Concept of Sea Floor Spreading):

উপরে উল্লিখিত বর্ণনায় মহীসঞ্চরণ পরবর্তী সময়কার অধ্যয়নে যে সকল তথ্য আমরা জানতে পারি তা পূর্বে ওয়েগনারের **মহী সঞ্চরণ তত্ত্বে** ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চতুর্থ সংশোধনে তিনি এই তথ্যগুলো সংযোজিত করেন।

মহাসাগরীয় তলদেশের মানচিত্রীকরণ এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিলাস্তরের পরা চুম্বকীয় (palaeomagnetic) অধ্যয়নের ফলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সামনে আসে :

(i) দেখা গেছে যে, মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা অঞ্চলে আগ্নেয় উদ্গিরণ (volcanic eruption) একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাপক পরিমাণে লাভা উদ্গিরণ হয়ে তলদেশে জমাট বাঁধে।

(ii) মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার মধ্যভাগ থেকে দুপাশে সমান দূরত্বে অবস্থিত শিলাস্তরের গঠন, সময়কাল, রাসায়নিক গ্রন্থন (chemical composition), চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলির (magnetic properties) মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার নিকটস্থ শিলা নবীন এবং সাধারণ মেরু (normal polarity) বৃত্তীয়। শৈলশিরার শীর্ষদেশ থেকে যত দূরে যাওয়া যায় শিলা গঠনের সময়কালও (formation of the age of rock) অধিক হয়ে থাকে।

(iii) মহাসাগরীয় শৃঙ্গের শীর্ষদেশের শিলা মহাদেশীয় প্রান্তদেশের শিলার তুলনায় অনেক নবীন (young)। মহাসাগরীয় শৃঙ্গের শীর্ষদেশের শিলা গঠনের সময়কাল 20 কোটি বছরের অধিক সেই তুলনায় কিছু কিছু মহাদেশীয় শিলার গঠনের সময়কাল 320 কোটি বছরেরও বেশি।

(iv) গভীর সমুদ্রপৃষ্ঠের তলদেশের স্তর অপ্রত্যাশিতভাবে পাতলা। বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন যে, মহাদেশের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠও যদি একই সময়ে গঠিত হত, তবে পলি সৃষ্টির সময় সঞ্চয় প্রক্রিয়াও দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠে পলি সঞ্চয়ের বয়স 20 কোটি বছরের বেশি পুরানো নয়।

(v) গভীর মহাসমুদ্রের অধিক গভীরতায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। কিন্তু মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা অঞ্চলের কম গভীরতায় ভূমিকম্পের কেন্দ্র (foci) পরিলক্ষিত হয়।

এই তথ্যসমূহ এবং মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার দুপাশের শিলার চুম্বকীয় উপাদান বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে **হেস** (Hess)

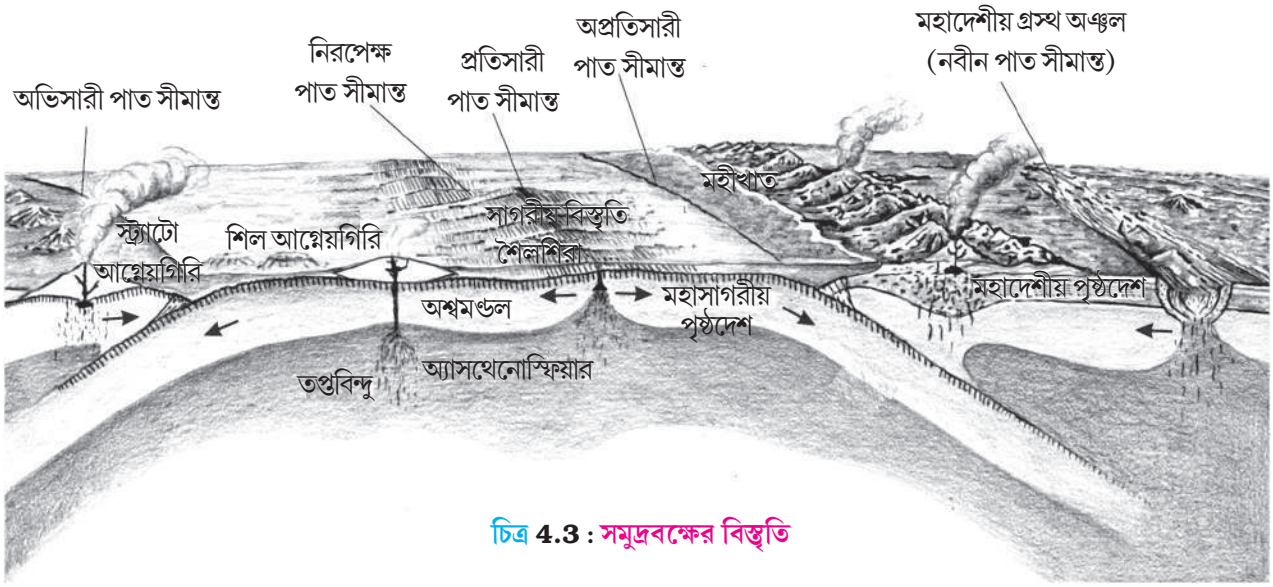

চিত্র **4.3** : সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি

1961 সালে যে তত্ত্ব (hypothesis) উপস্থাপন করেন সেটি **"সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি তত্ত্ব"** (sea floor spreading) নামে পরিচিত। হেসের মতানুযায়ী, মহাসাগরীয় শীর্ষদেশে ক্রমাগত অগ্ন্যুদ্‌গিরণের ফলে ফাটল বা ছিদ্র দেখা দেয় এবং ওই ছিদ্রপথ দিয়ে লাভা বেরিয়ে এসে দুদিকের ঢাল বরাবর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে সমুদ্র তলদেশের বিস্তৃতি ঘটে। মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশস্থ শিলা অপেক্ষাকৃত নবীন এবং তার পাশাপাশি এক মহাসাগরের তলদেশের বিস্তারের ফলে অন্য মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশের সংকোচনের কথা হেস তার সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি তত্ত্বে উল্লেখ করেন।

তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, আগ্নেয় উদ্‌গিরণের (volcanic eruption) ফলে মহাসাগরীয় বক্ষে (ocean floor) যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে মহীখাতগুলোর অবনমন ঘটে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

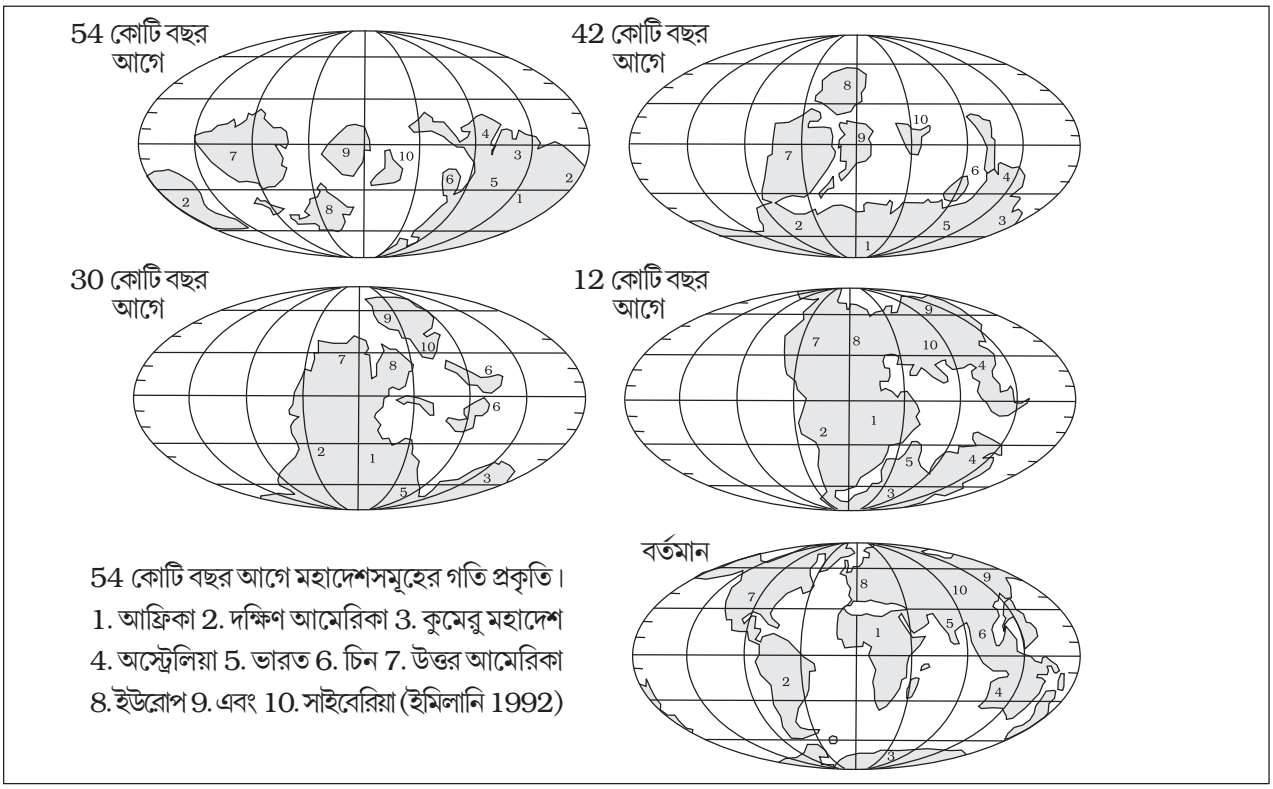

চিত্র **4.4** : ভূতাত্ত্বিক সময়কালে মহাদেশগুলোর অবস্থান

সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাটি চিত্র 4.3 তে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাত সংস্থান (Plate Tectonics):

সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি তত্ত্বের পর বিজ্ঞানীরা মহাদেশ ও মহাসাগরের বণ্টন সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। 1967 সালে ম্যাকেঞ্জি (McKenzie) পার্কার (Parker) এবং মরগ্যান (Morgan)-এর স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধ চিন্তাধারাকে একত্রিত করে নতুন ধারণা (concept) উপস্থাপন করেন, যা **"পাত সংস্থান তত্ত্ব"** (*Plate Tectonics Theory*) নামে পরিচিত। ভূসংস্থান পাত (tectonic plate বা লিথোস্ফিয়ারিক পাতও বলা হয়) হল একটি বিরাট (massive), অনিয়মিত আকৃতি বিশিষ্ট কঠিন শিলা বিশেষ, যেটি সাধারণত মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় উভয় অশ্বমণ্ডল (Lithosphere) দ্বারা গঠিত। পাতসমূহ অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার (asthenosphere) এর ওপর কঠিন (rigid) একক রূপে সমান্তরালভাবে সঞ্চরিত হয়। লিথোস্ফিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে গুরুমণ্ডলের উপরের স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত, লিথোস্ফিয়ার বা অশ্বমণ্ডলের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। অশ্বমণ্ডলের গভীরতা মহাসাগরীয় অঞ্চলে 5 থেকে 100 কিমি পর্যন্ত হয়, আবার মহাদেশীয় অঞ্চলে এর গভীরতা 200 কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটি পাত মহাদেশীয় পাত বা মহাসাগরীয় পাত হতে পারে এবং এটি সাধারণত নির্দিষ্ট পাতে মহাদেশ বা মহাসাগরের অধিক বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত হল প্রধানত একটি মহাসাগরীয় পাত আবার ইউরোপীয় পাতকে একটি মহাদেশীয় পাত বলা হয়। পাত ভূ-সংস্থান তত্ত্বে (plate tectonics theory) বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অশ্বমণ্ডল বা লিথোস্ফিয়ার 7টি প্রধান বা বৃহৎ পাত এবং কিছু মাঝারি পাত দ্বারা বিভক্ত। নবীন ভঙ্গিল পর্বত, শৈলশিরা, খাত বা চ্যুতি দ্বারা প্রধান বা বৃহৎ পাতগুলো বেষ্টিত (চিত্র 4.5)। প্রধান বা বৃহৎ পাতগুলো হল :

I. অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica) এবং এর সংলগ্ন মহাসাগরীয় পাত
II. উত্তর আমেরিকা (পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশস্থ অংশ যেটি দক্ষিণ আমেরিকা পাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সীমা নির্ধারণ করে) পাত।
III. দক্ষিণ আমেরিকা (পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশস্থ অংশ যেটি উত্তর আমেরিকা পাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সীমা নির্ধারণ করে) পাত।

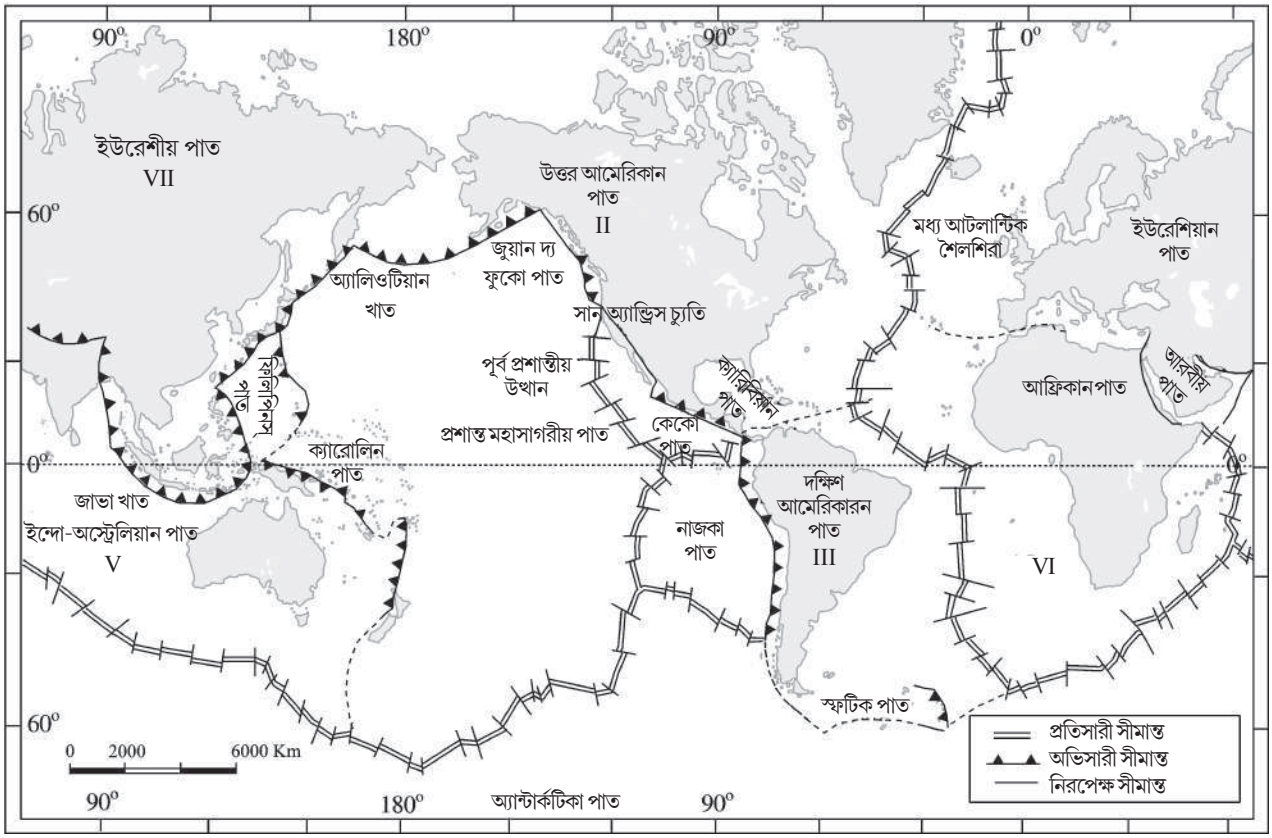

চিত্র **4.5** : পৃথিবীর প্রধান এবং মাঝারি পাতসমূহ

IV. প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত।
V. ইন্দো-অস্ট্রেলীয়-নিউজিল্যান্ড পাত।
VI. আফ্রিকাসহ পূর্ব আটলান্টিক তলদেশীয় পাত।
VII. ইউরেশীয় এবং সংলগ্ন মহাসাগরীয় পাত।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাঝারি পাতগুলোকে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল:

(i) কোকো পাত (*Cocos plate*) : মধ্য আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের মধ্যে অবস্থিত।
(ii) নাজকা পাত (*Nazca plate*) : দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের মধ্যে অবস্থিত।
(iii) আরবীয় পাত (*Arabian plate*) : অধিকাংশই সৌদি আরবীয় ভূখণ্ড (landmass) সংলগ্ন অঞ্চল।
(iv) ফিলিপিনস্ পাত (*Philippine plate*) : এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল।
(v) ক্যারোলিন পাত (*Caroline plate*) : ফিলিপিনস্ এবং ভারতীয় পাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল (নিউ গুয়েনার উত্তরে)
(vi) ফুজি পাত (*Fuji plate*) : অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে।

এই পাতসমূহ পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সময়কাল ধরে অবিরামভাবে চলনশীল। ওয়েগনার বিশ্বাস করতেন যে, শুধু মহাদেশগুলোই পাতের মধ্যে সঞ্চরণ হয় না, মহাদেশগুলো পাতের অংশ বিশেষ এবং পাতগুলো সঞ্চরণশীল, উপরন্তু এটিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ভূতাত্ত্বিক সময়কালেও পাতসমূহ গতিশীল ছিল ভবিষ্যতেও গতিশীল থাকবে। ওয়েগনার-এর মতে, প্রাথমিক অবস্থায় সব মহাদেশগুলোই সুপার মহাদেশ (super continent) **'প্যানজিয়া'** রূপে অবস্থান করত। যদিও পরবর্তী সময়ের অনুসন্ধান থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, সকল ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলো পাতের ওপর স্থিতাবস্থায় এলোমেলোভাবে সঞ্চরণ করত এবং বিভিন্ন মহাদেশীয় ভূখণ্ড এক বা একাধিক পাতের অংশ বিশেষ। এই পাতসমূহ অভিসারী হয়েই 'প্যানজিয়া' গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা পরা চুম্বকীয় তথ্য (palaeomagnetic data) প্রয়োগ করে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়কালে বর্তমান মহাদেশীয় ভূখণ্ডের (landmass) অবস্থান নির্ণয় করেন (চিত্র 4.4)। ভারতীয় উপমহাদেশের (বিশেষ করে উপদ্বীপীয় ভারতের) অবস্থান নাগপুর অঞ্চলের শিলা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্থির করেন।

তিন ধরনের পাত সীমানা দেখা যায় :

প্রতিসারী পাত সীমানা (Divergent Boundaries):

যখন দুটো পাত পরস্পর পরস্পরের থেকে বিপরীত দিকে সরে যায় এবং নতুন ভূত্বকের সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিসারী পাত বলে। এই পাত সঞ্চরণকে প্রসারিত স্থান (*spreading sites*)ও বলা হয়। মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা (Mid-Atlantic Ridge) হল প্রতিসারী পাত সীমান্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর দ্বারা ইউরেশীয় ও আফ্রিকান পাত থেকে আমেরিকান পাত পৃথক হয়েছে।

অভিসারী পাত সীমানা (Convergent Boundaries):

যেখানে একটি পাত অন্য একটি পাতের নীচে ঢুকে যায় এবং ভূত্বকের অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেখানে পাতের ডুবে যাওয়া অংশকে **নিমজ্জন মণ্ডল** (*subduction zone*) বলা হয়। পাত সাধারণত তিনটি উপায়ে অভিসারী (convergence) হয়। এগুলো হল (i) মহাসাগরীয় এবং মহাদেশীয় মধ্যবর্তী পাত; (ii) দুটো মহাসাগর মধ্যবর্তী পাত; এবং (iii) দুটো মহাদেশ মধ্যবর্তী পাত।

নিরপেক্ষ বা ট্রান্সফর্ম পাত সীমানা (Transform Boundaries):

যেখানে ভূত্বকের পাতে কোনো গঠন বা ধ্বংস কোনোটিই দেখা যায় না। সেখানে পাত দুটো শুধু পরস্পরের পাশাপাশি অনুভূমিকভাবে অতিক্রম করে। রূপান্তর চ্যুতি (Transform fault) হল একটি সমতলভূমি যা মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরাকে সমকোণে পৃথক করেছে। শৈলশিরার শীর্ষদেশে সর্বত্র একই সময় অগ্ন্যুদ্গিরণ (eruption) হয় না। পৃথিবীর অক্ষ থেকে পাতের যে অংশ যত দূরে সরতে থাকে সেখানে গতিশীলতায় তত পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবও বিভিন্ন পাতের পৃথকীকৃত ব্লকে (separated block) লক্ষ করা যায়।

> তোমরা কি কখনও ভেবেছ কীভাবে এই পাত সঞ্চরণের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়?

পাতের গতিশীলতার মাত্রা (Rates of Plate Movement):

মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরার সমান্তরালে যে স্বাভাবিক বা অনুলোম চ্যুতি এবং বিলোম বা বিপরীত চুম্বকীয় ক্ষেত্রের বিচ্যুতি বিজ্ঞানীদেরকে পাতের সঞ্চরণের বা গতিশীলতার মাত্রা নির্ধারণে সাহায্য করে। এই প্রবাহের মাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্নতা দেখা যায়। সুমেরু উচ্চভূমিতে (Arctic Ridge) এই গতিশীলতার মাত্রা সবচেয়ে কম (2.5 সেমির কম/বছর)। অপরদিকে পূর্বীয় দ্বীপ বা ইস্টার দ্বীপের নিকটে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উত্থিত অংশ (East Pacific Rise) যা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত চিলির পশ্চিমাংশ থেকে প্রায় 3,400 কিমি দূরে অবস্থিত সেখানে এই প্রবাহ মাত্রা সর্বাধিক। (15 সেমির বেশি/বছর) দেখা যায়।

পাত সঞ্চরণ সংক্রান্ত বল (Force for the Plate Movement):

যে সময় ওয়েগনার তাঁর মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব (theory of continental drift) উপস্থাপন করেন, সেই সময়কার অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী একটি কঠিন গতিহীন বস্তু। কিন্তু সমুদ্রবক্ষের বিস্তৃতি এবং পাত সংস্থান তত্ত্বে এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয় যে, ভূত্বক এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ দুটোই স্থির এবং গতিহীন নয় বরং এরা গতিশীল। বর্তমানে পাতের গতিশীলতা একটি সর্বজনগৃহীত তথ্য। ধারণা করা হয় যে, কঠিন পাতের (rigid plate) নীচে চলমান শিলা (Mobile rock) রয়েছে, সেটি চক্রাকার পদ্ধতিতে (circular

manner) চলমান। উত্তপ্ত পদার্থ ভূত্বকের উপরে ওঠে আসে, প্রসারিত হয় এবং শীতল হয়ে পুনরায় অধিক গভীরতায় ডুবে যায়। এই চক্রটির বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, যাকে বিজ্ঞানীরা **পরিচলন কোশ বা পরিচলন স্রোত** (convection cell or convective flow) বলে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীর মধ্যস্থিত তাপ প্রধানত দুটো উৎস থেকে আসে, যথা - তেজস্ক্রিয় ক্ষরণ (radioactive decay) এবং অবশিষ্ট তাপ (residual heat)। আর্থার হোমস্ (Arthur Holmes) সর্বপ্রথম 1930 সালে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেন এবং পরবর্তী সময়ে হ্যারি হেস (Harry Hess) সমুদ্রবক্ষের বিস্তারের তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কঠিন পাতের নীচে অবস্থিত উত্তপ্ত, গলিত গুরুমণ্ডলের ধীর প্রবাহ পাতের গতিশীলতায় চালনা বল (driving force) রূপে কাজ করে।

ভারতীয় পাতের সঞ্চালন (Movement of the Indian Plate):

উপদ্বীপীয় ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কিছু অংশ নিয়ে ভারতীয় পাতটি গঠিত। হিমালয়ের নিমজ্জিত অঞ্চল (subduction zone) উত্তরের পাত সীমান্ত বরাবর মহাদেশ গঠন করে যা হল মহাদেশীয় অভিসারী (*continent convergence*) পাত। পূর্ব দিকে এটি মায়ানমারের রাকিনোওমা (Rakinyoma Mountains) পর্বত থেকে জাভা খাতের বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালা (island arc) পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব সীমান্তটি হল একটি প্রসারিত স্থান (*spreading site*) যেটি দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মহাসাগরীয় শৈলশিরা গঠন করে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব দিকে নিমজ্জিত হয়েছে। পশ্চিম সীমান্তটি পাকিস্তানের কির্থার পর্বত (Kirthar Mountain) পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি পুনরায় ম্যাকরানা উপকূল (Makrana coast) বরাবর প্রসারিত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব চাগোস দ্বীপপুঞ্জ (Chagos Archipelago) ও লোহিত সাগরের (Red Sea) তলদেশের ফাটল (rift) পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় পাত এবং কুমেরু পাতের (Antarctic plate) মধ্যবর্তী সীমান্তটি হল মহাসাগরীয় শৈলশিরা (প্রতিসারী সীমান্ত) যা মোটামুটিভাবে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে নিউজিল্যান্ডের কিছুটা দক্ষিণে প্রসারিত স্থানের সাথে মিলিত হয়েছে।

ভারত একটি বিশাল উপদ্বীপ ছিল এবং বিশাল মহাসাগরের অস্ট্রেলিয়া উপকূলে অবস্থান করত। 225 মিলিয়ন বছর পূর্বে টেথিস সাগর একে এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক করে। 200 মিলিয়ন বছর পূর্বে 'প্যানজিয়া' ভেঙে ভারত তার উত্তরমুখী সঞ্চালন শুরু করে। হিমালয়ের দ্রুত উত্থানের ফলে আনুমানিক 40-50 মিলিয়ন বছর পূর্বে ভারত এশিয়া মহাদেশের সাথে ধাক্কা খায়। চিত্র 4.6 এ 71 মিলিয়ন বছর থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ভারতের অবস্থান দেখানো হল। এটিতে ভারত উপমহাদেশ এবং ইউরেশীয় পাতের

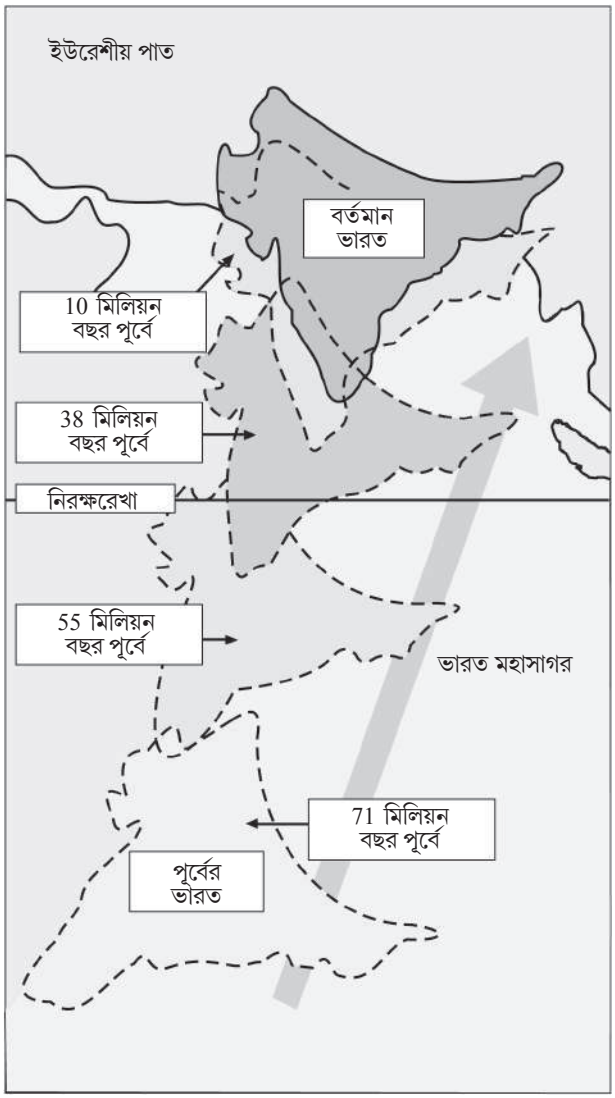

চিত্র 4.6 : ভারতীয় পাতের চলাচল

অবস্থানও দেখানো হয়েছে। বর্তমান সময়কাল থেকে 140 মিলিয়ন বছর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশটি দক্ষিণে 50° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত ছিল। দুটো বৃহৎ পাত টেথিস সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তিব্বতীয় ব্লকটি এশীয় ভূভাগের সন্নিকটে চলে এসেছিল। ভারতীয় পাত ইউরেশীয় পাতের দিকে সঞ্চরণের সময় একটি মুখ্য ঘটনা ঘটে যা হল লাভা উদ্‌গিরণের ফলে ডেকান ট্র্যাপ বা দাক্ষিণাত্য মালভূমির (Deccan Trap) গঠন। এটি আনুমানিক 60 মিলিয়ন বছর পূর্বে শুরু হয় এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলে। লক্ষ করার বিষয় এই যে, উপমহাদেশটি তখনও নিরক্ষরেখার সন্নিহিত ছিল। 40 মিলিয়ন বছর পূর্বে হিমালয়ের গঠনকার্য শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলছে এবং হিমালয়ের উচ্চতা এখনও বেড়ে চলেছে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর বাছাই করো :

(i) নিম্নে উল্লিখিত কোন্ বিজ্ঞানী ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন ?

(a) অ্যালফ্রেড ওয়েগনার (c) অ্যাব্রাহাম ওর্টেলিয়াস

(b) অ্যান্টোনিও পেল্লেগ্রিনি (d) এডমন্ড হেস

(ii) পোলার ফ্লিয়িং বল (Polar fleeing force) টি সম্পর্কযুক্ত :

(a) পৃথিবীর বার্ষিক গতির সঙ্গে (c) পৃথিবীর আবর্তন গতির সঙ্গে

(b) মাধ্যাকর্ষণ-এর সঙ্গে (d) জোয়ার ভাটার সঙ্গে

(iii) এদের মধ্যে কোন্‌টি মাঝারি (minor) পাত নয় ?

(a) নাজকা (c) ফিলিপিনস্

(b) আরবীয় (d) অ্যান্টার্কটিকা

(iv) সমুদ্রবক্ষের বিস্তার সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নে উল্লিখিত কোন্ ঘটনাকে বিচার করা হয়নি ?

(a) মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরায় আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা।

(b) মহাসাগরীয় তলদেশে শিলায় অনুলোম ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অংশের পর্যবেক্ষণ।

(c) বিভিন্ন মহাদেশে জীবাশ্মের বণ্টন।

(d) মহাসাগরীয় তলদেশের শিলার বয়সকাল।

(v) ভারতীয় পাতের সঙ্গে হিমালয় পর্বতশ্রেণির পাতটি নিম্নে উল্লিখিত কোন্ পাত সীমান্তের প্রকার বিশেষ :

(a) মহাসাগরীয় মহাদেশীয় অভিসারী

(b) প্রতিসারী সীমান্ত

(c) ট্রান্সফর্ম বা নিরপেক্ষ সীমান্ত

(d) মহাদেশীয় - মহাদেশীয় অভিসারী

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) ওয়েগনার (Wegener) মহীসঞ্চরণের ক্ষেত্রে কোন্ বলগুলোর কথা প্রস্তাব করেন ?

(ii) কীভাবে গুরুমণ্ডলে পরিচলন স্রোত সৃষ্টি হয় এবং বজায় থাকে ?

(iii) পাতের নিরপেক্ষ সীমানা এবং অভিসারী বা প্রতিসারী সীমানার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী ?

(iv) ডেকান ট্র্যাপ বা দাক্ষিণাত্য মালভূমি গঠনের সময় ভারতীয় ভূখণ্ডের অবস্থান কীরূপ ছিল ?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) মহীসঞ্চরণ তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তি দাও।

(ii) সঞ্চরণ মতবাদ এবং পাত সংস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যসমূহ আলোচনা করো।

(iii) মহাদেশীয় সঞ্চরণ মতবাদের পরবর্তী আবিষ্কারগুলো কী ছিল যা বিজ্ঞানীদের মহাসাগর এবং মহাদেশের বণ্টন সংক্রান্ত অধ্যয়নে পুনরুজ্জীবিত করে ?

প্রকল্পমূলক কাজ :

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত একটি কোলাজ (collage) তৈরি করো।

একক : III

ভূমিরূপ

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- *শিলা এবং খনিজ পদার্থ — শিলার মুখ্য শ্রেণিবিভাগ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ।*
- *ভূমিরূপ এবং এর বিবর্তন।*
- *ভূমিরূপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াসমূহ — আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয়, ক্ষয় এবং সঞ্চয়; মৃত্তিকা গঠন।*

অধ্যায়

5

খনিজ এবং শিলা
MINERALS AND ROCKS

বিভিন্ন প্রকার উপাদানের সমন্বয়ে পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানসমূহ পৃথিবীর বহির্ভাগে কঠিন অবস্থায় রয়েছে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে উত্তপ্ত এবং গলিত অবস্থায় রয়েছে।

পৃথিবীর শতকরা 98 ভাগ আটটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। যথা - অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম (সারণি 5.1)। অবশিষ্ট 02 শতাংশ টাইটেনিয়াম, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, কার্বন, নিকেল এবং অন্যান্য উপাদান দ্বারা গঠিত।

সারণি **5.1** : পৃথিবীর ভূ-ত্বকের প্রধান উপাদানসমূহ

ক্রমিক নং	*উপাদানসমূহ*	*ওজন অনুযায়ী (%)*
1.	অক্সিজেন	46.60
2.	সিলিকন	27.72
3.	অ্যালুমিনিয়াম	8.13
4.	লোহা	5.00
5.	ক্যালশিয়াম	3.63
6.	সোডিয়াম	2.83
7.	পটাশিয়াম	2.59
8.	ম্যাগনেসিয়াম	2.09
9.	অন্যান্য	1.41

ভূত্বকের উপাদানসমূহ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। তবে এগুলো অন্যান্য উপাদানের সাথে মিলে বহুপ্রকার পদার্থ সৃষ্টি করে। এইসব পদার্থগুলোকে খনিজ বলা হয়।

সুতরাং, একটি খনিজ হল প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জৈব এবং অজৈব পদার্থ যার সুবিন্যস্ত পারমাণবিক গঠন পদ্ধতি রয়েছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি খনিজ দুই বা ততোধিক উপাদান দ্বারা গঠিত। কিন্তু কখনো-কখনো এক উপাদান দ্বারা গঠিত খনিজ পদার্থও পাওয়া যায়। যেমন-সালফার, কপার, তামা, সোনা, গ্রাফাইট প্রভৃতি।

যদিও শিলামণ্ডল গঠনকারী উপাদানসমূহ সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি এইসব উপাদানসমূহ একসঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ সৃষ্টি করে। ভূ-ত্বকে এখনও পর্যন্ত দু-হাজার খনিজ পদার্থ সনাক্ত ও নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু সাধারণভাবে সৃষ্ট খনিজ পদার্থগুলোর প্রায় সবকটিই ছয়টি প্রধান খনিজ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এদের প্রধান শিলা গঠনকারী খনিজ পদার্থ বলা হয়।

সকল প্রকার খনিজের মূল উৎস হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত উত্তপ্ত ম্যাগমা। যখন ম্যাগমা শীতল হয়, খনিজের স্ফটিকতা প্রকাশিত হয় এবং খনিজের এক সুসংবদ্ধ ক্রমবিন্যাস ও পর্যায়ক্রমিক জমাট বাঁধা শুরু হয়, যার ফলে শিলা গঠিত হয়। অজৈব খনিজসমূহ যেমন কয়লা, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস যথাক্রমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

(i) **বাহ্যিক স্ফটিকাকার (External crystal form)** : মূলত অভ্যন্তরীণ আণবিক বিন্যাস যেমন-ঘনক, অক্টাহেড্রনস্ (octahedrons), ষড়ভুজাকৃতি প্রিজম (hexagonal prisms) ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত।

(ii) **বিদারণ (Cleavage)** : নির্দিষ্ট দিকে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা, অপেক্ষাকৃতভাবে সমতল পৃষ্ঠ তৈরি করে - অভ্যন্তরীণ আণবিক বিন্যাসের ফল - যে-কোনো দিকে এবং যে-কোনো কোণে বিদীর্ণ হতে পারে।

(iii) **ফাটল (Fracture)** : অভ্যন্তরীণ আণবিক বিন্যাস এতই জটিল হয় যে সেখানে অণুর মসৃণতা থাকে না; খনিজের কণাসমূহ বিদারণের অনুকূলে না ভেঙে অনিয়মিত বা অসমান হারে ভেঙে যায়।

(iv) **দীপ্তি (Lustre)** : দীপ্তি হল বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি পদার্থের বাহ্যিক অবস্থা বা রূপ। প্রত্যেকটি খনিজেরই নিজস্ব দীপ্তি রয়েছে, যথা - ধাতব, চকচকে, মসৃণ প্রভৃতি।

(v) **বর্ণ (Colour)** : আণবিক গঠনের উপর নির্ভর করে কিছু খনিজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ লক্ষ করা যায় — ম্যালাকাইট (malachite), অ্যাজুরাইট (azurite), চাল্‌কোপাইরাইট (chalcopyrite) ইত্যাদি এবং কিছু খনিজের অশুদ্ধির (impurities) ওপর নির্ভর করে তাদের বর্ণ নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ অশুদ্ধতার কারণে কোয়ার্টজ সাদা, সবুজ, লাল, হলুদ প্রভৃতি বর্ণের হয়।

(vi) **প্রতিফলন (Streak)** : প্রতিফলন হল কোনো খনিজের ভূমিচূর্ণের রঙ বা বর্ণ। এটি খনিজের বর্ণের মতো একই বর্ণের হতে পারে অথবা আলাদা হতে পারে। যেমন-ম্যালাকাইট (malachite) হচ্ছে সবুজ বর্ণের এবং সবুজ প্রতিফলন দান করে, ফ্লোরাইট (fluorite) বেগুনি বর্ণের বা সবুজ বর্ণের হয় কিন্তু সাদা প্রতিফলন দান করে।

(vii) **স্বচ্ছতা (Transparency) — স্বচ্ছ : (transparent) :** স্বচ্ছতায় আলোক কিরণ এমনভাবে যায় যে, বস্তুগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে, আবার ঈষদস্বচ্ছতায় - আলোক কিরণ যায় কিন্তু বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ফলে বস্তুগুলো দেখা যেতে পারে না, অস্বচ্ছতায় আলো একদমই যায় না।

(viii) **গঠন (Structure)** : প্রত্যেকটি কেলাসের নিজস্ব বিন্যাস থাকে। এগুলো সূক্ষ্ম, মধ্যম অথবা স্থূল দানাযুক্ত বা কণাযুক্ত হয়। তন্তুযুক্ত গঠন আলাদা করা যায়, এটি অপসারী বা বিকিরণকারী হয়ে থাকে।

(ix) **কঠোরতা (Hardness)** : আপেক্ষিক প্রতিরোধ চিহ্নিতকরণ, দশটি চিহ্নিত খনিজের মধ্য থেকে 1-10 শ্রেণির মধ্যে কঠোরতা মাপা হয়। এই খনিজগুলো হচ্ছে — 1. ট্যাল্ক; 2. জিপসাম; 3. ক্যালসাইট; 4. ফ্লোরাইট; 5. অ্যাপাটাইট; 6. ফেল্ডস্পার 7. কোয়ার্টজ; 8. পোখরাজ (topaz); 9. কোরান্ডাম; 10. হিরা। এর সাথে তুলনা করে উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, একটি নখের কঠোরতা 2.5 এবং কাচ অথবা ছুরির ধারালো অংশের কঠোরতা 5.5 ।

(x) **আপেক্ষিক ভার (Specific gravity)** : আপেক্ষিক ভার হল প্রদত্ত বস্তুর ভার এবং তত সমপরিমাণ জলের ভারের অনুপাত; প্রথমে বায়ুতে বস্তুটির ওজন বা ভার নিয়ে তারপর জলে ওই বস্তুটির ওজন নেওয়ার পর এই দুই ওজনের পার্থক্যকে বায়ুতে নেওয়া ওজন বা ভার দিয়ে ভাগ করা হয়।

কিছু প্রধান খনিজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Some Major Minerals and their Characteristics) :

ফেল্ডস্পার (Feldspar) :

সিলিকন এবং অক্সিজেন সকল প্রকার ফেল্ডস্পার-এর সাধারণ উপাদান এবং সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি উপাদান কতগুলো বিশেষ বিশেষ ফেল্ডস্পারে পাওয়া যায়। ভূ-ত্বকের অর্ধাংশ ফেল্ডস্পার দ্বারা গঠিত। এটি হালকা পীত বর্ণ থেকে হাল্‌কা গোলাপি বর্ণের হয়। চিনামাটির বাসনপত্র এবং কাচ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

কোয়ার্টজ (Quartz) :

এটি বালি এবং গ্রানাইট-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে সিলিকা থাকে। এটি একটি কঠিন খনিজ যা কার্যত জলে অদ্রবীভূত। এটি শ্বেতবর্ণের হয় অথবা রঙহীন হয় এবং রেডিও ও রাডারে ব্যবহার করা হয়। এটি গ্রানাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাইরক্সিন (Pyroxene) :

পাইরক্সিনে ক্যালশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং সিলিকা থাকে। ভূ-ত্বকের 10 শতাংশ পাইরক্সিন দ্বারা গঠিত। ইহা সাধারণত উল্কাপিণ্ডে পাওয়া যায়। এর রং বা বর্ণ সবুজ বা কালো হয়।

এম্ফিবোল (Amphibole) :

অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে এম্ফিবোল-এর প্রধান উপাদানসমূহ। এদের দ্বারা ভূ-ত্বকের সাত শতাংশ গঠিত। এটি সবুজ বা কালো বর্ণের হয় এবং অ্যাসবেস্টস (asbestos) শিল্পে ব্যবহৃত হয়। হর্নব্লেন্ড (hornblende) হল এম্ফিবোল-এর আরেকটি প্রকার।

অভ্র (Mica) :

এতে পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, সিলিকা প্রভৃতি থাকে। ভূ-ত্বকের 4 শতাংশ অভ্র দ্বারা তৈরি। এটি সাধারণত আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় পাওয়া যায়। এটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

অলিভিন (Olivine) :

অলিভিনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম, লোহা এবং সিলিকা। গয়না তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত সবুজ বর্ণের কেলাস। এটি প্রায়শই ব্যাসল্ট শিলায় পাওয়া যায়।

এসব প্রধান খনিজমসূহ ছাড়াও অন্যান্য খনিজ যেমন-ক্লোরাইড, ক্যালসাইট, ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট, বক্সাইট এবং বেরাইট শিলার মধ্যে অল্প পরিমাণে বর্তমান থাকে।

ধাতব খনিজ (Metallic Minerals) :

ধাতব খনিজসমূহে ধাতব পদার্থ পাওয়া যায় এবং এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(i) ***মূল্যবান ধাতব খনিজ (Precious metals)*** : সোনা, তামা, প্লাটিনাম (platinum) ইত্যাদি।

(ii) ***লৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Ferrous metals)*** : লোহা এবং স্টিল তৈরিতে লোহার সাথে মিশ্রিত অন্যান্য ধাতুসমূহ।

(iii) ***অলৌহবর্গীয় ধাতব খনিজ (Non-ferrous metals)***: তামা, সিসা, জিঙ্ক, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু এই শ্রেণির অন্তর্গত।

অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals) :

এইপ্রকার খনিজসমূহে ধাতব পদার্থ পাওয়া যায় না। সালফার, ফসফেট এবং নাইট্রেট হচ্ছে অধাতব খনিজের উদাহরণ। সিমেন্ট হলো অধাতব খনিজের মিশ্রণ।

শিলা (Rocks)

ভূ-ত্বক শিলা দ্বারা গঠিত। একটি শিলা এক বা ততোধিক খনিজের মিশ্রণ। শিলা কঠিন বা কোমল এবং বিভিন্ন বর্ণেরও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ গ্রানাইট কঠিন, সোপস্টোন (soapstone) কোমল হয়। গ্যাব্রো কালো এবং কোয়ার্টজাইট (quartzite) দুধের মতো সাদা হতে পারে। শিলায় খনিজ সংগঠকের নির্দিষ্ট গঠন প্রণালী থাকে না। শিলায় প্রাপ্ত সবচেয়ে সাধারণ খনিজ হল ফেল্ডস্পার এবং কোয়ার্টজ।

> পেট্রোলজি (Petrology) হলো শিলার বিজ্ঞান। একজন পেট্রো অধ্যয়নবিদ (Petrologist) শিলার সকল দিকের উপর যেমন - খনিজের গঠন, নক্শা, বিন্যাস, গঠন প্রণালী বা কাঠামো, উৎপত্তি, প্রাপ্তিস্থান, পরিবর্তন এবং অন্যান্য শিলার সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতির অধ্যয়ন করেন।

শিলা এবং ভূমিরূপ, শিলা এবং মৃত্তিকার মধ্যে যেহেতু নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যামান তাই একজন ভূগোলবিদের শিলা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিলার বিভিন্ন প্রকার আছে যেগুলোকে তাদের গঠন পদ্ধতি অনুসারে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল : (i) আগ্নেয় শিলা — ম্যাগমা এবং লাভা থেকে জমাট বাঁধে বা শক্ত হয়; (ii) পাললিক শিলা — বহির্জাত প্রক্রিয়ার দ্বারা শিলার অংশের সঞ্চয়ের ফল। (iii) রূপান্তরিত শিলা — বর্তমান শিলার পুনঃকেলাসিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট।

আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks) :

যেহেতু পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের ম্যাগমা ও লাভা থেকে আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি, তাই একে প্রাথমিক শিলা বলা হয়। আগ্নেয় শিলা (Ignis ল্যাটিন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ 'Fire' বা আগুন) সৃষ্টি হয় যখন ম্যাগমা শীতল হয় এবং জমাট বাঁধে। তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে ম্যাগমা কী। যখন ম্যাগমা ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহে বা গতিতে শীতল হয়ে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয় তখন একে আগ্নেয় শিলা বলা হয়। এই শীতল ও জমাট বা কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ভূ-ত্বকে বা ভূ-পৃষ্ঠে হতে পারে।

আগ্নেয় শিলাকে বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এর বিন্যাস কণার আকার ও ব্যবস্থা অথবা পদার্থের অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। গলিত পদার্থসমূহ যদি খুব গভীরে ধীরগতিতে শীতল হয়, তাহলে খনিজের কণাসমূহের আকার যথেষ্ট বড়ো হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠে আকস্মিক শীতলতার ফলে খনিজের কণাসমূহ ছোটো এবং সূক্ষ্ম আকারের হয়। আগ্নেয় শিলা সৃষ্টিকারী কণাসমূহ যদি শীতলতার মধ্যম পর্যায়ে থাকে, তাহলে কণাগুলোর আকারও মধ্যম আকৃতির হয়। গ্রানাইট (Granite), গ্যাব্রো (gabbro), প্যাগমাটাইট (pegmatite), ব্যাসল্ট (basalt), জ্বালামুখী ব্রেসিয়া (volcanic breccia) এবং টাফ (tuff) হল আগ্নেয় শিলার কিছু উদাহরণ।

পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks) :

'পাললিক' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'sedimentum' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে "প্রতিস্থাপিত হওয়া (settling)"। ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ (আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত) ভূ-ভাগের উপরিতলে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং নগ্নীভবনের বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা বিভিন্ন আকারে খণ্ডিত হয়ে থাকে। এসকল খণ্ডিত অংশসমূহ বিভিন্ন বহির্জাত মাধ্যমসমুহ দ্বারা পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থসমুহ নিবিড়ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে শিলায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **লিথিফিকেশন (*lithification*)** বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার পাললিক শিলায় সঞ্চিত পদার্থের স্তরসমূহ লিথিফিকেশনের পরও তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যতা বজায় রাখে। এ কারণেই আমরা পাললিক শিলায় বিভিন্ন ঘনত্ব বা সান্দ্রতামূলক স্তর দেখতে পাই যেমন-বেলেপাথর, শেল (shale) প্রভৃতি।

গঠনের উপর নির্ভর করে পাললিক শিলাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় : (i) যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত — উদাহরণ : বেলেপাথর, কংগ্লোমারেট, চুনাপাথর, শেল, লোয়েশ ইত্যাদি (ii) জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত — উদাহরণ : সিরাইট্, চক, চুনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি; (iii) রাসায়নিক উপায়ে গঠিত — উদাহরণ : চুন (chert), চুনাপাথর, হেলাইট, পটাশ ইত্যাদি।

রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks) :

'রূপান্তরিত' শব্দের অর্থ 'গঠনের পরিবর্তন'। এই শিলাসমূহ সৃষ্ট হয় চাপ, আয়তন ও তাপের (সংক্ষেপে PVT) পরিবর্তনের ফলে। যখন গাঠনিক প্রক্রিয়াসমূহ (tectonic processes) দ্বারা শিলাসমুহ নিম্নস্তরে বলপূর্বক যেতে বাধ্য হয় অথবা যখন ভূ-ত্বকের গলিত ম্যাগমা উপরে উঠার সময় ভূপৃষ্ঠীয় শিলার সংস্পর্শে আসে অথবা নিম্নস্তরের শিলা যখন উপরের স্তরের শিলা দ্বারা প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয় তখন রূপান্তর ঘটে। রূপান্তর হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ইতিমধ্যে সমন্বিত মৌলিক শিলাসমূহের পদার্থসমূহ পুনঃ কেলাসিত এবং পুনঃগঠিত হয়।

বিশেষ কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া শিলার ভাঙন এবং চূর্ণ-বিচুর্ণের কারণে মৌলিক শিলার খনিজসমূহের যান্ত্রিক বিচুর্ণীভবন এবং পুনর্গঠনকে **গতিশীল রূপান্তর (Dynamic Metamorphism)** বলে। তাপের ফলে রূপান্তরের কারণে শিলার পদার্থসমূহ রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত এবং পুনঃকেলাসিত হয়। তাপের ফলে রূপান্তর অথবা তাপীয় রূপান্তরকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় — সংযোগ রূপান্তর এবং আঞ্চলিক রূপান্তর। সংযোগ রূপান্তরে শিলাগুলো অভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত ম্যাগমা ও লাভার সংস্পর্শে আসে এবং শিলার পদার্থসমূহ প্রচণ্ড তাপের ফলে পুনঃকেলাসিত হয়। প্রায়শই ম্যাগমা অথবা লাভা থেকে নতুন পদার্থ শিলায় সংযোজিত হয়। আঞ্চলিক রূপান্তরে, শিলা পুনঃকেলাসিত হয় কারণ গাঠনিক চাপের পাশাপাশি অত্যধিক চাপ অথবা তাপ অথবা উভয়ের কারণে শিলা বিকৃত হয় বলে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শিলার কিছু কণা অথবা খনিজ স্তর বা রেখারূপে বিন্যস্ত থাকে। রূপান্তরিত শিলায় খনিজসমূহ বা কণাসমূহের এরূপ বিন্যস্তীকরণকে **মোচন (*foliation*)** অথবা **রেখাঙ্কণ (*lineation*)** বলে। কখনো-কখনো বিভিন্ন শ্রেণির খনিজ বা পদার্থসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে সরু থেকে স্থূল আকারে বিন্যস্ত থাকে। এগুলো দেখতে হাল্কা এবং গাঢ় বর্ণের হয়। রূপান্তরিত শিলায় এরূপ গঠনকে বাঁক (*banding*) বলে এবং এরূপ বাঁক দেখানো শিলাকে **বাঁকযুক্ত শিলা (*banded rocks*)** বলে। রূপান্তরিত শিলার শ্রেণিবিভাগ নির্ভর করে যে শিলা রূপান্তরিত হবে তার মৌলিক শিলা বা প্রাথমিক শিলার উপর। রূপান্তরিত শিলাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - ফোলিত বা পত্রোদ্গত (foliated) শিলা এবং অ-ফোলিত বা অপত্রোদ্গত (non-foliated) শিলা। রূপান্তরিত শিলার কিছু উদাহরণ হল - নিস্, গ্রানাইট, সায়নাইট (syenite), স্লেট (slate) শিষ্ট (schist), মার্বেল, কোয়ার্টজাইট প্রভৃতি।

শিলাচক্র (Rock Cycle) :

শিলা দীর্ঘকাল তার মৌলিক রূপে থাকে না বরং রূপান্তরের বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। শিলাচক্র একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাচীন শিলা নবীন শিলায় পরিবর্তিত হয়।

আগ্নেয়শিলা হচ্ছে প্রাথমিক শিলা এবং অন্যান্য শিলাসমূহ (পাললিক এবং রূপান্তরিত) এসব প্রাথমিক শিলা থেকে সৃষ্ট হয়। আগ্নেয়শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিবর্তিত হতে পারে। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা থেকে প্রাপ্ত খণ্ডিত অংশসমূহ থেকে পাললিক শিলা গঠিত হয়। পাললিক শিলাসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খণ্ডিত হতে পারে এবং এই ক্ষুদ্র অংশসমূহ পাললিক শিলা সৃষ্টির উৎস

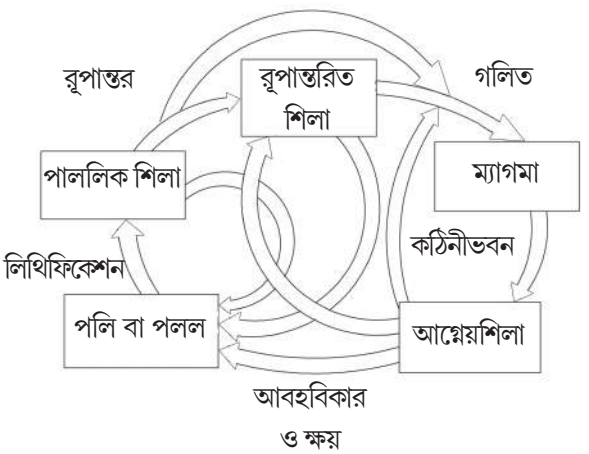

চিত্র **5.1 : শিলাচক্র (Rock Cycle)**

হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠীয় শিলা (আগ্নেয়, রূপান্তরিত ও পাললিক) গঠিত হওয়ার পর নিমজ্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলাসমূহ নীচে গুরুমণ্ডলে (পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে) চলে যেতে পারে (পাত নিমজ্জন এলাকায় একটি পাত অন্য পাতের নীচে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে নিমজ্জিত হয়) এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এটি গলিত ম্যাগমায় পরিণত হয় যা আগ্নেয় শিলার মূল উৎস (চিত্র 5.1)।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

(i) নিম্নে বর্ণিত কোন্ দুটি গ্রানাইটের প্রধান উপাদান ?

(a) লোহা এবং নিকেল (c) সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম

(b) লোহা এবং তামা (d) লৌহ অক্সাইড এবং পটাশিয়াম

(ii) নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি রূপান্তরিত শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ?

(a) পরিবর্তনশীল (c) কেলাসিত

(b) স্তূপাকার (d) মোচন বা পত্রোদ্গম

(iii) নীচের কোন্‌টি এক উপাদানযুক্ত খনিজ নয়?

(a) সোনা (c) অভ্র

(b) রূপা (d) গ্রাফাইট

(iv) নীচের কোন্‌টি সবচেয়ে কঠিনতম খনিজ?

(a) পোখরাজ (c) কোয়ার্টজ

(b) হিরা (d) ফেল্ডস্পার

(v) নীচের কোন্‌টি পাললিক শিলা নয়?

(a) টায়লাইট (c) ব্রেসিয়া

(b) বোরক্স (d) মার্বেল

2. নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর 30টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) শিলা বলতে কী বোঝ? শিলার তিনটি প্রধান শ্রেণির নাম লেখো।

(ii) আগ্নেয় শিলা কী? আগ্নেয় শিলার গঠন পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

(iii) পাললিক শিলা কী? পাললিক শিলার গঠন প্রণালী বর্ণনা করো।

(iv) শিলাচক্র দ্বারা প্রধান শিলাগুলোর মধ্যে কী রকম সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 150 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) 'খনিজ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করো। খনিজের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ এদের প্রধান শ্রেণিবিভাগগুলো লেখো।

(ii) ভূ-ত্বকের প্রধান শিলাসমূহের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির ব্যাখ্যা করো। তোমরা কীভাবে এদের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণ করবে?

(iii) রূপান্তরিত শিলা কাকে বলে? রূপান্তরিত শিলার শ্রেণিবিভাগসমূহ বর্ণনা করো এবং এগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়?

প্রকল্পমূলক কাজ :

বিভিন্ন প্রকার শিলার নমুনা সংগ্রহ করো এবং এদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাছাই করার চেষ্টা করো এবং এদের প্রকারভেদ শনাক্ত করো।

অধ্যায় 6

ভূমিরূপ প্রক্রিয়াসমূহ
GEOMORPHIC PROCESSES

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে জানার পর, কীভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূত্বক এবং অভ্যন্তর ভাগ গঠিত হয়েছে তা বোঝার পর, ভূ-ত্বকীয় পাতগুলো যে চলনশীল এবং ভূমিকম্প সম্পর্কিত তথ্যসমূহ জানার পর এখন আমাদের জানতে হবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের সেই অংশ সম্পর্কে যেখানে আমরা বসবাস করি। নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নটির মাধ্যমে আমরা অধ্যায়টি শুরু করতে পারি।

পৃথিবীর উপরিভাগটি এত এবড়ো-থেবড়ো কেন?

ভূ-পৃষ্ঠ পরিবর্তনশীল। তোমরা আগেই জেনেছ যে, ভূ-পৃষ্ঠ উল্লম্ব এবং অনুভূমিকভাবে আলোড়িত হয়েছে। যদিও অতীতে এই আলোড়ন বর্তমানের তুলনায় কিছুটা দ্রুত হয়। অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলোর বিভিন্নতার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। ভূ-পৃষ্ঠ অবিরত বর্হিজাত শক্তিগুলো দ্বারা প্রভাবিত, এই বর্হিজাত শক্তিগুলোর মূল উৎস হল সূর্যালোক। যদিও অন্তর্জাত শক্তিগুলো এখনও সক্রিয় রয়েছে কিন্তু তাদের তীব্রতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ অবিরত বাহ্যিক শক্তিগুলো দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে যার উৎস হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোও কাজ করছে। বাহ্যিক শক্তিগুলো বর্হিজাত শক্তিরূপে (*exogenic forces*) পরিচিত এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো অন্তর্জাত শক্তি (*endogenic forces*) নামে পরিচিত। বহির্জাত শক্তিগুলোর কার্যকারণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অবনমন হয়ে থাকে **অবরোহণ** (degradation) ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নভূমিগুলো ভরাট হয়ে উত্থিত ও **আরোহণ** (aggradation) হয়। ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত নির্মোচনের ফলে ক্ষয় হওয়ার প্রক্রিয়াকে **পর্যায়ন** (Gradation) বলে। অন্তর্জাত শক্তিগুলো ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশকে ক্রমাগত উত্থিত করে চলেছে, এজন্য বহির্জাত শক্তিগুলো ভূ-পৃষ্ঠের অসমানতাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে না। তাই, ভূ-পৃষ্ঠের অসামঞ্জস্য ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন এই দুই বিপরীত ধর্মী শক্তি অর্থাৎ অন্তর্জাত ও বহির্জাত শক্তি কার্যকর থাকবে। সাধারণ অর্থে, অর্ন্তজাত শক্তিগুলো ভূ-গঠনকারী এবং বর্হিজাত শক্তিগুলো ভূ-ত্বক ক্ষয়কারী শক্তি। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ যথেষ্ট সংবেদনশীল। মানব সম্প্রদায় তাদের জীবনধারণের জন্য এর উপর নির্ভরশীল এবং এই কারণে বহুকাল ধরে এই ভূ-পৃষ্ঠকে মানুষ নিবিড় ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে চলেছে। তাই এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য তার প্রকৃতিকে ভালোভাবে জানতে হবে যাতে আমরা এর সমতা নষ্ট না করে ব্যবহার করতে পারি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষণ করতে পারি। পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল জীবজ উপাদান পৃথিবীর পরিবেশের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার জন্য কিছু না কিছু করে থাকে। যদিও মানব সমাজ প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ অবশ্যই ব্যবহার করব কিন্তু তার অপচয় করব না। কারণ আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই সম্পদ গচ্ছিত রেখে যেতে চাই। পৃথিবী পৃষ্ঠের অধিকাংশ ভাগ দীর্ঘ সময় ধরে (প্রায় হাজার বছর) পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। মানুষের ব্যবহার ও অপব্যবহারের কারণে এর কার্যক্ষমতা খুবই দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাই যদি ঐ সকল প্রক্রিয়া যা ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে অংশগ্রহণ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠ কী ধরনের পদার্থ দ্বারা গঠিত তা জানা ও বোঝা যায় তবে ভূ-পৃষ্ঠজাত পদার্থের অপব্যবহার বহুলাংশে কমানো যেতে পারে, একান্তই যদি কমানো না যায় তবে অন্তত পক্ষে কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

ভূমিরূপ প্রক্রিয়াসমূহ (GEOMORPHIC PROCESSES):

তোমরা নিশ্চয় ভূমিরূপ প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে চাইবে? সাধারণভাবে অন্তর্জাত ও বহির্জাত শক্তিসমূহ যা ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের রূপকে পরিবর্তন করে তাদের ভূমিরূপ প্রক্রিয়া বলে। ভূ-বিপর্যয় ও অগ্ন্যুদ্গম হল অন্তর্জাত

ভূমিরূপ প্রক্রিয়া। এসকল বিষয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয়, ক্ষয়ীভবন এবং সঞ্চয় হল বহির্জাত ভূমিরূপ প্রক্রিয়া। বর্হিজাত ভূমিরূপ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

প্রকৃতির যে-কোনো বহির্জাত উপাদান (যেমন-জল, বরফ, বায়ু প্রভৃতি) যা পার্থিব উপাদানগুলোকে উৎপাটন করে বহন করতে সক্ষম তাদের ভূমিরূপ মাধ্যম বা ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি বলা হয়। এই সকল প্রাকৃতিক উপাদানগুলো যখন সচল হয় তখন ঢালের কারণে ভূ-গাঠনিক উপাদানগুলো পদার্থসমূহ অপসারণ করে এবং পরিবহণ করে অন্যত্র কোনো নিম্নভূমিতে গিয়ে সঞ্চিত করে। ভূমিরূপ প্রক্রিয়া এবং ভূমিরূপের মাধ্যমগুলোকে (বিশেষত বহির্জাত) আলাদা করে বর্ণনা না করলে তারা এক এবং অভিন্ন।

প্রক্রিয়া হল ভূ-পৃষ্ঠজাত পদার্থগুলোর উপর কার্যকরী বল যা ঐ সকল পদার্থকে প্রভাবিত করে। মাধ্যম হল একটি সচল প্রতিনিধি (প্রবহমান জল, চলনশীল বরফ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ এবং স্রোত প্রভৃতি) যা পার্থিক বস্তুর অপসারণ, পরিবহণ ও সঞ্চয় সাধন করে থাকে। প্রবাহমান জলধারা, ভৌমজল, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্র তরঙ্গ এবং স্রোত প্রভৃতিকে **ভমিরূপ মাধ্যম** বলা যায়।

তোমাদের কি মনে হয় ভূমিরূপ মাধ্যম ও ভূমিরূপ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সব ধরনের নিম্ন ঢালগামী বস্তুর নির্দেশমূলক শক্তি হবার পাশাপাশি ভূপৃষ্ঠের উপাদানগুলোর মধ্যেও পীড়নের সৃষ্টি করে। পরোক্ষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পীড়নের প্রভাবে সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। মাধ্যাকর্ষন শক্তি ও ঢালের অনুপস্থিতিতে কোনো প্রকার ভূমিরূপ প্রক্রিয়া ঘটবে না। ফলে বস্তুর চলন ঘটবে না এবং কোনো প্রকার ক্ষয়, পরিবহণ ও সঞ্চয় ঘটে না। সুতরাং ভূমিরূপ প্রক্রিয়ার মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পীড়নও ততই গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই আমরা ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকি এবং এই শক্তির প্রভাবেই বস্তুসমূহের চলন ঘটে থাকে। আবার ভূ-অভ্যন্তরস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল প্রকার চলনই সাধারণত ঢালের কারণে হয়ে থাকে এবং সেই চলন উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমির দিকে, উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে হয়ে থাকে।

অন্তর্জাত প্রক্রিয়া (Endogenic Processes) :

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তিই হল অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলোর মূল উৎস। এই শক্তি মূলত সৃষ্টি হয় তেজস্ক্রিয়তা, আবর্তনজনিত কারণ জোয়ারভাটার সংঘর্ষ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকালে উৎপন্ন তাপশক্তির কারণে। এই সকল শক্তির প্রভাবে যে অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলো দেখা যায় তার ফলে শিলামণ্ডলে ভূ-বিপর্যয় ও অগ্ন্যুদ্গম ঘটে থাকে। ভূ-তাপীয় শক্তি এবং তাপপ্রবাহের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকার ফলে অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলো ভূ-পৃষ্ঠের উপর সমানভাবে কাজ করে না, তাই ভূ-গাঠনিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভূ-ত্বকের গঠনও অসমতল।

ভূ-বিপর্যয় (Diastrophism) :

যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূ-ত্বক উত্থিত বা অবনমিত বা সৃষ্টি হয় তাকে ভূ-বিপর্যয় বলে। ভূ-বিপর্যয় প্রধানত চার প্রকার — (i) গিরিজনি আলোড়ন, যার প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিশালায়তনের ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের দীর্ঘ ও সংকীর্ণ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে; (ii) মহীভাবক আলোড়ন, যার প্রভাবে বিশালায়তন মহাদেশের উৎপত্তি হয়; (iii) ভূমিকম্প, যা ভূ-ত্বকে কম্পন ঘটায় এবং (iv) পাত সংস্থান যা ভূ-ত্বকীয় পাতগুলোর অনুভূমিক চলনের জন্য দায়ী।

গিরিজনি প্রক্রিয়ায়, ভূ-ত্বক তীব্রভাবে ভাঁজপ্রাপ্ত হয়। আবার মহীভাবক প্রক্রিয়া দ্বারা ভূ-ত্বকের সাধারণ পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই গিরিজনি প্রক্রিয়াকে পর্বত গঠনের প্রক্রিয়া এবং মহীভাবক প্রক্রিয়াকে মহাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া বলা হয়। এই চারটি প্রক্রিয়া যথা গিরিজনি, মহীভাবক, ভূমিকম্প এবং পাতসংস্থানের মাধ্যমে ভূ-ত্বকে টান ও পীড়নের সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রক্রিয়া শিলায় চাপ (Pressure), আয়তন (Volume) এবং তাপমাত্রার (Temperature) (PVT) পরিবর্তন করে এবং শিলাকে রূপান্তরিত করে।

মহীভাবক প্রক্রিয়া এবং গিরিজনি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

অগ্ন্যুদ্গম (Volcanism) :

যে প্রক্রিয়ায় ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ (magma), যথা-ম্যাগমা, উল্ম বায়ু, গ্যাস, ধোঁয়া, প্রস্তর খণ্ড, বাষ্প, কর্দম, ভস্ম প্রভৃতি ভূ-ত্বকের কোনো দুর্বল অংশ দিয়ে বা ফাটলের

মাধ্যমে ও বিভিন্ন ছিদ্রপথ দিয়ে উন্মুক্ত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে জমা হয় বা ভূ-ত্বকে অনুপ্রবেশ করে সেই প্রক্রিয়াকে অগ্ন্যুদ্‌গম বলে। অগ্ন্যুদ্‌গমের প্রভাবে অনেক নিঃসারী ও উদ্‌বেধী আগ্নেয় ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুদ্‌গমের বিভিন্ন দিক নিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী অধ্যায়ে (একক-II) আগ্নেয়শিলার অংশেও এর উল্লেখ রয়েছে।

অগ্ন্যুদ্‌গম এবং আগ্নেয়গিরি এই দুটো শব্দ কী বোঝায়?

বহির্জাত প্রক্রিয়াসমূহ (Exogenic Processes) :

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ, ভৌমজল প্রভৃতি বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিগুলো দীর্ঘকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে ক্রিয়াশীল থেকে ভূমিরূপের বিবর্তন ঘটায় বা ভূমিরূপে ভাঙ্কর্যের সৃষ্টি করে তাকে বর্হিজাত প্রক্রিয়া বলে। বহির্জাত প্রক্রিয়াসমূহ বায়ুমণ্ডল থেকে মূলত সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং ভূ-অভ্যন্তরে উৎপন্ন শক্তি দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

তোমরা কেন মনে কর যে, ভূমির ঢাল ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত সেই সকল বস্তুর উপর তার আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে যেগুলো ঢালে অবস্থান করছে এবং এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পদার্থসমূহের ঢালে নিম্নমুখী চলন ঘটে থাকে। প্রতি একক ক্ষেত্রে চালিত শক্তিকে পীড়ন বলে। কঠিন বস্তুকে ধাক্কা দিলে (push) বা টানলে (pull) ওই বস্তুতে পীড়নের সৃষ্টি হয়। এই পীড়নের ফলেই শিলার বিকৃতি ঘটে। যেসকল শক্তি ভূ-গাঠনিক উপাদানগুলোর উপর কাজ করে তাকে কৃন্তন পীড়ন (shear stresses বা পৃথকীকরণের শক্তি) বলে। এই কৃন্তন পীড়ন শিলা এবং অন্যান্য ভূ-গাঠনিক উপাদানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কৌণিক বিচ্যুতি ঘটায় বা স্থানচ্যুতি (slippage) ঘটায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের পাশাপাশি আণবিক চাপও এইসকল ভূ-গাঠনিক উপাদানগুলোর উপর বিভিন্নভাবে চাপ দেয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাপমাত্রার পরিবর্তন, গলন, কেলাসিত হওয়া প্রভৃতি। রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে মৃত্তিকার দানাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দ্রবনীয় খনিজ পদার্থগুলো দ্রবীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ক্ষয়ীভবন সাধারণত শিলাস্তরে পীড়নের ফলেই সংঘটিত হয়।

তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত --- এই দুটো হল গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ুগত উপাদান যা বিভিন্ন বর্হিজাত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এইসকল বর্হিজাত প্রক্রিয়াকে একত্রে নগ্নীভবন বলে। ল্যাটিন শব্দ 'denude' থেকে *denudation* অর্থাৎ নগ্নীভবন শব্দটি এসেছে। যার অর্থ অনাবৃত্ত থাকা। আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয়, ক্ষয়কারী শক্তিসমূহের সম্মিলিত কার্যের ফলে পদার্থের অপসরণ, নীচের শিলাস্তর উন্মুক্তকরণ ও ভূমির উচ্চতা হ্রাস হল নগ্নীভবন। চিত্র 6.1 এর প্রবাহ চিত্রটিতে নগ্নীভবন ও তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো দেখানো হল। এই চার্টটি থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে প্রতিটি প্রক্রিয়ার পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট চালিকা শক্তি রয়েছে।

যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন, তাই ভূ-পৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু অঞ্চলও

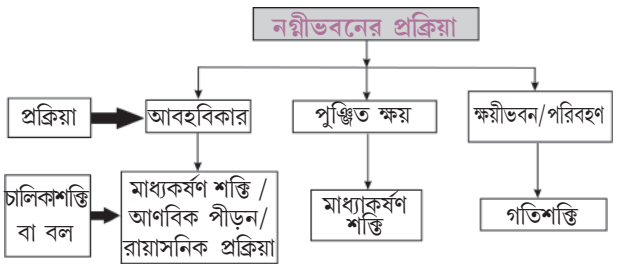

চিত্র 6.1 : নগ্নীভবনের প্রক্রিয়া এবং তাদের চালিকা শক্তিসমূহ

গড়ে উঠেছে। এই সকল জলবায়ু অঞ্চল মূলত অক্ষাংশভেদে, ঋতুভেদে এবং জলভাগ ও স্থলভাগের বৈচিত্র্যের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। জলবায়ু অঞ্চলের বৈচিত্র্যের জন্য বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যেও অঞ্চলভেদে বৈষম্য দেখা যায়। কোনো অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি, ঘনত্ব এবং বণ্টন যা বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল, সেটাও পরোক্ষভাবে বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে। আবার বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে কিছু স্থানীয় অবস্থার কারণে বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলোর রকমফের দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - উচ্চতাগত পরিবর্তন, দিকবৈচিত্র্য, পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী ঢালের তুলনায় উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী ঢালে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের পরিমাণে বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতিবেগের পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ ও পরিমাণ এবং এর তীব্রতা, বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের মধ্যে সম্পর্ক, দৈনিক তাপমাত্রার প্রসার, হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্কের পুনরাবৃত্তি, বরফের গভীরতা, ভূমিরূপসমূহ প্রভৃতি যে-কোনো জলবায়ু অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সব প্রকার বর্হিজাত প্রক্রিয়ার একমাত্র চালিকা শক্তিটি কী?

যখন জলবায়ুগত উপাদানগুলো সমান থাকে, তখন বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলোর ক্রিয়ার তীব্রতা শিলার প্রকৃতি ও গঠনের উপর নির্ভর করে। শিলার গঠন বলতে এখানে শিলার ভাঁজ, চ্যুতি, শিলা স্তরের নতি, বাঁক, দিক, ফাটলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, স্তরায়নতল, শিলা গঠনকারী খনিজের নমনীয়তা ও কাঠিন্য,

খনিজের সংবেদনশীলতা, শিলার প্রবেশ্যতা ও অপ্রবেশ্যতা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের শিলার ক্ষয় প্রতিহত করার ক্ষমতা বিভিন্ন, তাই সেগুলো বিভিন্নভাবে বর্হিজাত প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। একটি শিলা কোনো একটি ভূমিরূপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেশি ক্ষয় প্রতিহতকারী হয় আবার অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় তেমনভাবে প্রতিহত করতে পারে না। অপরদিকে, একই শিলা ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করার ফলে দেখা যায় একটি জলবায়ু অঞ্চলে যে শিলা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অন্য জলবায়ু অঞ্চলে তা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর জন্য ভূমিরূপ গঠনেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। বেশিরভাগ বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব খুবই কম এবং ধীর প্রক্রিয়া হওয়ার স্বল্পকালীন সময়ে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে শিলার উপর ক্রমাগত ক্রিয়ার ফলে তাদের প্রভাব খুব ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অবশেষে, এটা বলা যায় যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ মূলত ভূ-গাঠনিক বিবর্তনের ফলে গঠিত হয় এবং শিলাসমূহের গঠন ও প্রকারভেদের পার্থক্য, ভূমিরূপ প্রক্রিয়াসমূহের বৈষম্য ও তাদের কার্যাবলির অনুপাত প্রভৃতির জন্য এই প্রক্রিয়াসমূহ আজও ক্রিয়াশীল।

নিম্নে বর্হিজাত প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হল —

আবহবিকার (WEATHERING):

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিয়োজিত হয়ে মূল শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাকে আবহবিকার বলা হয়। আবহবিকারের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো এককভাবে বা একত্রিতভাবে শিলার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে শিলাকে খণ্ড খণ্ড করে।

> আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ও রাসায়নিক বিয়োজনকে আবহবিকার বলে।

যেহেতু আবহবিকারে বস্তুসমূহের সামান্য সরণ ঘটে আবার কখনও তেমন কোনো সরণ ঘটে না, তাই আবহবিকার একটি অন্তঃস্থ বা বহিঃস্থ প্রক্রিয়া।

> আবহবিকারের ফলে যে সামান্য সরণ ঘটে থাকে, তাকে কি পরিবহণ এর সমর্থক বলা যায়? যদি না হয় তবে কেন?

আবহবিকার প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন জটিল ভূ-তাত্ত্বিক, জলবায়ুগত, ভূমিরূপগত ও স্বাভাবিক উদ্ভিদজাত উপাদান দ্বারা

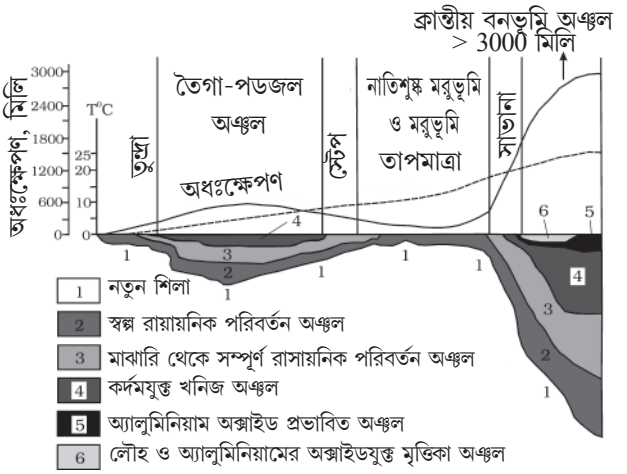

চিত্র 6.2 : জলবায়ু অঞ্চল ও আবহবিকারের গভীরতা (স্ট্রাকহভ্, 1967, থেকে গৃহীত ও রূপান্তরিত)

নিয়ন্ত্রিত। এদের মধ্যে জলবায়ুর ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু ও অঞ্চলভেদে শুধুমাত্র আবহবিকারের প্রক্রিয়ার তফাত ঘটে না আবহবিকার জাত পদার্থের গভীরতারও পার্থক্য হয় (চিত্র 6.2)।

> **কাজ**
> চিত্র 6.2 তে অক্ষরেখার মানগুলো চিহ্নিত করো এবং জলবায়ু অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিশদভাবে তুলনা করো।

আবহবিকারের তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে। যথা - (i) রাসায়নিক আবহবিকার, (ii) যান্ত্রিক আবহবিকার এবং জৈব আবহবিকার। খুব কম সময়ই এমন দেখা যায় যে, কোনো একটি প্রক্রিয়া এককভাবে কাজ করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো একটি প্রক্রিয়ার আধিপত্য অধিক পরিলক্ষিত হয়।

রাসায়নিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াসমূহ (Chemical Weathering Processes):

রাসায়নিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াসমূহ যথা - জারণ, অঙ্গারযোজন, জলযোজন, দ্রবণ, লঘুকরণ প্রভৃতি শিলার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং শিলায় বিয়োজন, দ্রবীভূতকরণ বা লঘুকরণ ঘটায়। এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল প্রভৃতির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া রাসায়নিক আবহবিকার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার জন্য বায়ু ও জলের উপস্থিতি এবং পাশাপাশি তাপও একান্তভাবে কাম্য। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড মৃত গাছপালা ও প্রাণীর বিয়োজন ঘটিয়ে ভূ-অভ্যন্তরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন শিলার উপর এই

রাসায়নিক উপাদানগুলো যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা অনেকটা পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়া পরীক্ষার মতো।

দ্রবণ (*Solution*):

যখন জল অথবা অ্যাসিডের সঙ্গে কোনো কিছু দ্রবীভূত হয়, তখন তাকে দ্রবণ বলে। এই পদ্ধতিতে দ্রবণের মাধ্যমে কঠিন খনিজের অপসরণ ঘটে, যা আবার খনিজের দ্রাব্যতার উপর নির্ভরশীল। জলের সংস্পর্শে এলে অনেক খনিজ পদার্থ ভেঙে যায় এবং সহজে জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জলে দ্রাব্য শিলা সৃষ্টিকারী খনিজ যথা - নাইট্রেট, সালফেট এবং পটাশিয়াম প্রভৃতি এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই খনিজগুলো বৃষ্টিবহুল জলবায়ুতে খুব সহজেই ধৌত প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয় এবং কোনো অবশিষ্টাংশও থাকে না। আবার, শুষ্ক জলবায়ুতে সেগুলো একত্রে জমা হয়ে থাকে। ক্যালশিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম বাই কার্বনেট যা চুনাপাথরে অবস্থিত কার্বনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ জলে (যা জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হবার ফলে সৃষ্টি হয়) দ্রবীভূত হয় এবং জলের সঙ্গে দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়। জৈবপদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড মৃত্তিকাস্থিত জলের সাথে বিক্রিয়া করে। সাধারণ খাদ্য। লবণও একটি শিলা গঠনকারী খনিজ যা দ্রবণ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অঙ্গারযোজন (*Carbonation*):

অঙ্গারযোজন হল কার্বনেট এবং বাই কার্বনেটের খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া। এটি ফেলস্পার এবং কার্বনেট শিলার ভাঙনে সাহায্য করে। বায়ুমণ্ডল এবং মৃত্তিকায় অবস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে যা দুর্বল অ্যাসিডরূপে কাজ করে। এই কার্বনিক অ্যাসিড ক্যালশিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটকে দ্রবীভূত করে, দ্রবণরূপে অপসারিত করে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো অবশিষ্টাংশ থাকে না এবং প্রক্রিয়াটির শেষে চুনাপাথর গুহার সৃষ্টি হয়।

জলযোজন (*Hydration*):

শিলার খনিজের সাথে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল যুক্ত হওয়াকে **জলযোজন** বলে। খনিজগুলোতে জল যুক্ত হলে প্রসারিত হয়। খনিজের এই প্রসারণ শিলার আয়তন বৃদ্ধি করে। ক্যালশিয়াম সালফেট জলের সঙ্গে যুক্ত হলে জিপসামে পরিণত হয়। যা ক্যালশিয়াম সালফেট অপেক্ষা অধিক বিক্রিয়াশীল । এই প্রক্রিয়াটি বিপরীতক্রমেও ঘটে এবং দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে শিলা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খণ্ড বিখণ্ড হয়। অধিকাংশ কর্দম জাতীয় খনিজ শিলার আর্দ্রকরণ এবং শুষ্ককরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে শিলার উপরিস্থিত পদার্থের অপসরণে সহায়ক হয়। শিলার সচ্ছিদ্রতার ফলে শিলায় অবস্থিত লবণ এভাবে বারংবার জলযোজনের মাধ্যমে শিলায় আবহবিকার ঘটায়। জলযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলার যে আয়তন পরিবর্তন হয় তা শল্কমোচন ও ক্ষুদ্র কণা বিশরণ জাতীয় যান্ত্রিক আবহবিকারে সহায়তা করে।

জারণ এবং লঘুকরণ (*Oxidation and Reduction*):

আবহবিকার জারণের অর্থ অক্সিজেনের সঙ্গে খনিজের মিলন, যা অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড গঠন করে। জারণ সেই অঞ্চলেই ঘটে যেখানে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন খুব সহজেই শিলার সংস্পর্শে আসে। এই প্রক্রিয়ায় যে খনিজগুলো সব থেকে বেশি অংশগ্রহণ করে সেগুলো হল লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার প্রভৃতি। এই পদ্ধতিতে শিলার বিয়োজন অক্সিজেনের প্রভাবে হয়ে থাকে। লৌহের লাল রং জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদামি বা হলুদ হয়ে পড়ে। যখন জারণঘটিত খনিজ অক্সিজেনবিহীন পরিবেশের সংস্পর্শে আসে তখন লঘুকরণ ঘটে। এই ধরণের ঘটনা সাধারণত ভৌম জলস্তরের নীচে স্থির জলযুক্ত এবং জলমগ্ন স্থানে ঘটে থাকে। লঘুকরণের ফলে লৌহের লাল রং নীলাভ ধূসর বা সবুজাভ ধূসরে পরিণত হয়।

এইসকল আবহবিকারের প্রক্রিয়াগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জলযোজন, অঙ্গারযোজন এবং জারণ প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে থাকে এবং রাসায়নিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আমরা কি লোহার মরিচা পড়াকে জারণের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি? রাসায়নিক আবহবিকারে জল কতটা অপরিহার্য? জলবিরল উষ্ণ মরুভূমিতে কি রাসায়নিক আবহবিকার ঘটতে পারে?

যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াসমূহ (Physical Weathering Processes) :

প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াসমূহ কিছু কিছু প্রযুক্ত শক্তির উপর নির্ভর করে। এই প্রযুক্ত শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল — (i) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন-চাপ, ভার (load) এবং কৃন্তন পীড়ন, (ii) প্রসারণ শক্তি যা তাপমাত্রা পরিবর্তন, কেলাস গঠন বা প্রাণীদের কার্যকলাপের ফলে তৈরি হয়, (iii) জলের চাপ যা

আর্দ্রকরণ এবং শুষ্ককরণ প্রক্রিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হবার ফলে গঠিত হয়। এই সকল শক্তির বেশির ভাগই পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হয় যা শিলার ভাঙনে অংশগ্রহণ করে। বেশির ভাগ যান্ত্রিক আবহবিকার তাপীয় প্রসারণ এবং চাপ নির্মোচনের ফলে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলো ক্ষুদ্র এবং ধীরগতি সম্পন্ন হলেও তা ভূ-পৃষ্ঠের বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে শিলাসমূহের ক্ষয়সাধন করতে পারে। শিলাগুলোও সংকোচন ও প্রসারণ কার্যের পুনরাবৃত্তি চলার ফলে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

চাপহ্রাস ও প্রসারণ (*Unloading and Expansion*):

ক্রমাগত ক্ষয়কার্যের ফলে যখন উপরিস্থিত শিলাস্তর অপসারিত হয় তখন উল্লম্বভাবে চাপ হ্রাস পায়, ফলস্বরূপ শিলা প্রসারিত হয় এবং শিলাস্তরের বিচূর্ণীভবন ঘটে। ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে শিলাস্তরের ফাটল দেখা যায়, বাঁকযুক্ত ভূ-পৃষ্ঠের অংশে খিলানকার ফাটল বৃহদায়তন শিলাস্তরের অপসরণ বা শল্কমোচিত শিলা ফলক গঠন করে। এভাবে চাপহ্রাসের ফলে গঠিত শল্কমোচিত শিলা ফলকের দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠে কয়েকশ মিটার থেকে শুরু করে কয়েক হাজার মি. পর্যন্ত অনুভূমিকভাবে বিস্তৃত হতে পারে। বৃহদাকৃতি, গোলাকার, মসৃণ পৃষ্ঠযুক্ত শল্কমোচিত গম্বুজ এই প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় (চিত্র 6.3)।

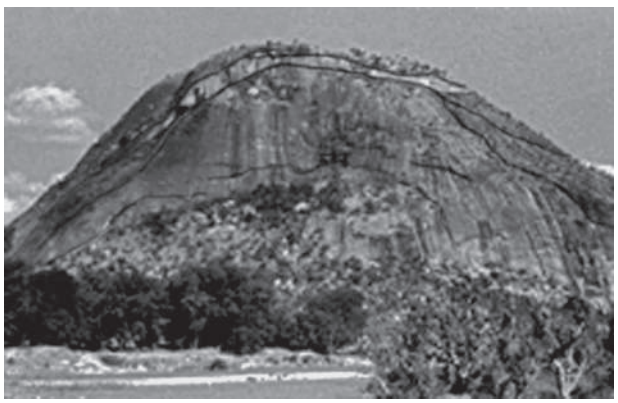

চিত্র **6.3 : অন্ধ্রপ্রদেশের ভঙ্গির (ভুবনগিরি) নিকটে অবস্থিত একটি বৃহৎ শল্কমোচিত গম্বুজ।**

তাপমাত্রা পরিবর্তন এবং প্রসারণ (*Temperature Changes and Expansion*):

শিলাগঠনকারী বিভিন্ন খনিজের তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে প্রসারণ ও সংকোচনের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাপমাত্রা বাড়লে শিলা মধ্যস্থ প্রতিটি খনিজের প্রসারণ ঘটে এবং এই খনিজসমূহ তাদের নিকটস্থ খনিজসমূহের সাথে পরস্পর ধাক্কা খায়। দৈনিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে শিলার পৃষ্ঠস্থ খনিজ কণাগুলোর এরূপ চলাচল সবসময় হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াটির সক্রিয়তা এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে দৈনিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার অত্যন্ত বেশি সেখানে দেখা যায়। আমরা আগেই জেনেছি যে এই প্রক্রিয়াগুলো খুবই ধীর গতিতে হয়, শিলা ক্রমাগত আঘাতপ্রাপ্ত হবার ফলে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলা এই প্রক্রিয়া দ্বারা তুলনামূলকভাবে ভূগর্ভস্থ শিলা অপেক্ষা বেশি প্রসারিত হয় এবং শিলাগুলোর মধ্যে পীড়নের সৃষ্টি করে যা পরবর্তী সময়ে শিলার স্ফীতি এবং ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিলার খনিজসমূহের তাপ গ্রহণে বৈষম্যের ফলে যে প্রসারণ ও সংকোচনের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তা শিলায় শল্কমোচন ঘটায় যার প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে মসৃণ, গোলাকার শিলার উন্মোচন ঘটে। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এধরনের মসৃণ পৃষ্ঠতলযুক্ত, গোলাকার ছোটো থেকে বড়ো বোল্ডারকে টর (Tor) বলে যা শল্কমোচনের ফলে সৃষ্টি হয়।

শল্কমোচিত গম্বুজ ও শল্কমোচিত টরের মধ্যে পার্থক্য কী?

হিমায়ন, গলন এবং হিমায়িত কিলক গঠন (*Freezing, Thawing and Frost Wedging*):

হিমায়িত আবহবিকার শিলার ছিদ্র ও ফাটলে জল জমে তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে বরফে পরিণত হওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পুনরায় জলে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির কারণে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি মূলত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এবং মধ্য অক্ষাংশে বেশি কার্যকর, যেখানে পর্যায়ক্রমে হিমায়ন ও গলন প্রক্রিয়াটি বেশি সক্রিয়। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে শিলায় প্রতিনিয়ত হিমায়িত কীলক গঠিত হতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় হিমায়নের হারের গুরুত্ব সর্বাধিক। হিমায়ন যদি দ্রুত হারে ঘটে তখন শিলার অকস্মাৎ প্রসারণ ঘটে এবং চাপ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসারণ শিলার ফাটল, ছিদ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশের মধ্যে যে পীড়নের সৃষ্টি হয় তার ফলে ফাটলগুলো প্রশস্ত হতে থাকে যা শেষ পর্যন্ত শিলাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়।

লবণ আবহবিকার (*Salt Weathering*):

শিলার তাপীয় প্রভাব, জলযোজন ও কেলাসগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলামধ্যস্থ লবণের প্রসারণ ঘটে। অধিকাংশ লবণ যেমন - ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম এবং বেড়িয়াম প্রভৃতির প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই সকল লবণের প্রসারণ তাপমাত্রা ও লবণগুলোর তাপীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। মরু অঞ্চলে 30^0-50^0C তাপমাত্রা এই সকল

লবণের প্রসারণ ঘটায়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলার ছিদ্রে অবস্থিত লবণের কেলাস গঠনের ফলে মূল শিলার বিদারণ ঘটে, যা অবশেষে ভেঙে পড়ে। এভাবে শিলার বিদারণ ঘটার ফলে শিলার মধ্যে ক্ষুদ্রকণা বিশরণ ঘটে থাকে।

লবণের কেলাস গঠন সকল প্রকার লবণ আবহবিকারের মধ্যে অধিক প্রভাবশালী। যে সকল অঞ্চল পর্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ক হয় সেখানে লবণের কেলাস গঠন হওয়ার সম্ভাবনা অধিক যা নিকটবর্তী খনিজগুলোকে একদিকে ঠেলে দেয়। মরু অঞ্চলে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জিপসাম কেলাস শিলার উপরের স্তরের উত্তোলন ঘটার ফলে উত্তোলিত অংশের উপর পঞ্চভূজাকার ফাটলের সৃষ্টি হয়। লবণের কেলাস গঠনের মাধ্যমে চক খুব সহজেই ভেঙে পড়ে। এছাড়া চুনাপাথর, বেলেপাথর, শেল, নিস্ এবং গ্রানাইট শিলাতেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জৈবিক কার্যকলাপ এবং আবহবিকার (Biological Activity and Weathering):

জৈব আবহবিকার বিভিন্ন জৈব উপাদানের চলন ও বৃদ্ধিজনিত কারণে শিলা গঠনকারী খনিজ এবং আয়নের অপসরণ এবং তাদের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। বিভিন্ন প্রাণী যথা কেঁচো, উইপোকা, রডেন্ট প্রভৃতি যে গর্ত বা কীলক গঠন করে তা ভূ-পৃষ্ঠকে উদ্ভাসিত করে নতুন মৃত্তিকা স্তরের সৃষ্টি করে এবং মৃত্তিকাকে রাসায়নিক আবহবিকারের জন্য উন্মুক্ত করে। এই প্রক্রিয়া বায়ু ও জলের অনুপ্রবেশে সাহায্য করে। মানুষ তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যথা-লাঙল চালানো, মৃত্তিকা কর্ষণ, গাছপালা বিনষ্ট করা প্রভৃতির মাধ্যমে জল, বায়ু এবং খনিজসহ বিভিন্ন পার্থিব উপাদানের সাথে নতুন যোগসূত্র গঠন করে। পচনশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ হিউমিক, কার্বনিক এবং অন্যান্য অ্যাসিড গঠনে সাহায্য করে, যা গঠনকারী মৌলের ক্ষয় এবং দ্রাব্যতা বৃদ্ধি করে। কোনো কোনো গাছের শিকড় শিলার মধ্যে অসাধারণ চাপের সৃষ্টি করে যা শিলাগঠনকারী পদার্থের যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

আবহবিকারের বিশেষ প্রভাবসমূহ

শল্কমোচন (*Exfoliation*):

শল্কমোচনের প্রক্রিয়াটি পূর্বেই যান্ত্রিক আবহবিকারের চাপহ্রাস, তাপীয় সংকোচন ও প্রসারণ এবং লবণ আবহবিকারে আলোচনা করা হয়েছে। শল্কমোচন মূলত একটি আবহবিকার জাত ভূমিরূপ, আবহবিকারের প্রক্রিয়া নয়। ফ্লেকিং এর (Flaking off) মাধ্যমে বক্রতল যুক্ত আদি শিলাস্তর বা শিলার উপরিভাগ অপসারিত হয় এবং তার ফলস্বরূপ মসৃণ এবং গোলাকার তলযুক্ত শিলা গঠিত হয়। তাপ পরিবর্তনের ফলে শিলা সংকুচিত ও প্রসারিত হয়

চিত্র 6.4 : শল্কমোচন (ফ্লেকিং) এবং ক্ষুদ্র কণা বিশরণ

এবং শল্কমোচন ঘটে। শল্কমোচিত গম্বুজ এবং শল্কমোচিত টর চাপহ্রাস এবং তাপীয় প্রসারণের ফলে সংগঠিত হয়।

আবহবিকারের গুরুত্ব (Significance of Weathering):

আবহবিকার প্রক্রিয়া শিলার ভাঙনের মাধ্যমে রেগোলিথ ও মৃত্তিকা গঠনেই শুধু সহায়তা করে না, এটি ক্ষয়ীভবন এবং পুঞ্জিত ক্ষয়ের জন্যও অপরিহার্য। কোনো অঞ্চলের বায়োম এবং জৈব বৈচিত্র্য নির্ভর করে সেই অঞ্চলে গড়ে ওঠা বনভূমির উপর, আবার বনভূমির প্রকৃতি নির্ভর করে আবহবিকার জাত শিলাস্তরের গভীরতার উপর। আবহবিকার ছাড়া ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়াও সঠিকভাবে চলতে পারে না। অর্থাৎ, আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয়, ক্ষয়ীভবন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং ক্ষয়কাজের মাধ্যমে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় ও ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। আবহবিকার এবং আবহবিকার জাত পদার্থের সঞ্চয় মূল্যবান খনিজ, আকরিকের সঞ্চয় ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এই সকল খনিজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি, যেগুলো কোনো দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল আবহবিকার।

> যখন শিলা আবহবিকার প্রাপ্ত হয় তখন কিছু পদার্থ রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে ভৌমজল দ্বারা ধৌত হয়ে ভূগর্ভে মূল্যবান খনিজের ভাণ্ডার গড়ে তোলে। তাই আবহবিকারের এই প্রক্রিয়া ছাড়া ঐ সকল মূল্যবান খনিজের ভাণ্ডার বিশেষ থাকত না এবং অর্থনৈতিকভাবে তার উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশুদ্ধকরণও সম্ভব হত না। একেই সমৃদ্ধিকরণ (enrichment) বোঝায়।

পুঞ্জিত ক্ষয় বা স্থানান্তর (Mass Movements) :

উচ্চভূমির ঢালের মৃত্তিকা, শিলা ভগ্নস্তূপ ও অন্যান্য পদার্থরাশি প্রত্যক্ষভাবে অভিকর্ষের টানে ঢাল বেয়ে নেমে এলে তাকে পুঞ্জিত ক্ষয় বা স্থানান্তর বলে। অর্থাৎ বায়ু, জলপ্রবাহ বা বরফ সবসময় বিভিন্ন ক্ষয়জাত পদার্থের পরিবহণ করে না, কখনো -কখনো এইসকল ক্ষয়জাত পদার্থও জল, বায়ু বা বরফকে তার সাথে পরিবাহিত করতে পারে। এই ধরনের স্থানান্তরের গতি খুব ধীর থেকে গভীর স্তর পর্যন্ত প্রভাবিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশ হল বিসর্পণ (creep), প্রবাহ, ধস এবং প্রপাত প্রভৃতি পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান ভূ-পৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহের উপর তার বল প্রয়োগ করে এবং তাদের পুঞ্জিত স্থানান্তর বা পুঞ্জিত ক্ষয় ঘটায়। সুতরাং, আবহবিকার পুঞ্জিত স্থানান্তরের প্রাথমিক শর্তাবলি না হলেও আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয়ে সাহায্য করে ও ত্বরান্বিত করে। সেই কারণে আবহবিকারযুক্ত ঢালে পুঞ্জিত ক্ষয়ের পরিমাণ আবহবিকারহীন ঢালের তুলনায় বেশি।

পুঞ্জিত স্থানান্তর শুধুমাত্র অভিকর্ষজ বল দ্বারা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ ও সমুদ্র স্রোত প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ, পুঞ্জিত স্থানান্তর ক্ষয়ের মধ্যে পরিগণিত হয় না, যদিও এই প্রক্রিয়ায় পদার্থ সমূহের (অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে) স্থানান্তর ঘটে। ঢালের ওপর অবস্থিত পদার্থ সমূহের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং এই সমস্ত পদার্থের তখনই অপসরণ ঘটে যখন তাদের কৃন্তন প্রতিবন্ধকতার (shearing resistance) তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বল অধিক হয়। দুর্বল, অসংহত, পাতলা স্তরযুক্ত শিলা, চ্যুতি, খাড়া ঢালযুক্ত শিলাস্তর, উল্লম্ব ভৃগু বা খাড়া ঢাল, পর্যাপ্ত পরিমাণে অধঃক্ষেপণ এবং মুষলধার বৃষ্টিপাত ও গাছপালার অভাব ইতাদি পুঞ্জিত ক্ষয়ে সাহায্য করে।

পুঞ্জিত স্থানান্তরে সক্রিয়তা নিম্নলিখিত কারণে বৃদ্ধি পায় — (i) প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক উপায়ে শিলার নিম্নস্থ স্তরের অপসরণ (ii) কৃত্রিমভাবে বা স্বাভাবিকভাবে ঢালের উপর পদার্থের অতিরিক্ত ভার সৃষ্টি হওয়া (iii) পাহাড়ের ঢালের মান ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া, (iv) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য ঢালের বৃদ্ধি পাওয়া, (v) ঢাল থেকে পদার্থ বা ভার অপসারণ (vi) ভূমিকম্প, যন্ত্রাদি ব্যবহার বা বিস্ফোরণ প্রভৃতি ঘটানো, (vii) অতিরিক্ত পরিমাণে জলের নিম্নস্তরে স্থানান্তর, (viii) বিভিন্ন হ্রদ, জলাশয়, নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে জলের উত্তোলনের ফলে নদীর তীরবর্তী স্থানে জলের ধীর প্রবাহ দেখা যায়। (ix) নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস প্রভৃতি।

স্ফীতি (মৃত্তিকায় হিমায়ন ও অন্যান্য কারণে স্ফীতি), প্রবাহ, এবং ধস হল পুঞ্জিত স্থানান্তরের তিনটি প্রক্রিয়া। 6.5 নং চিত্রে বিভিন্ন প্রকার পুঞ্জিত স্থানান্তর ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের আর্দ্রতার পরিমাণ ও স্থানান্তরের গতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

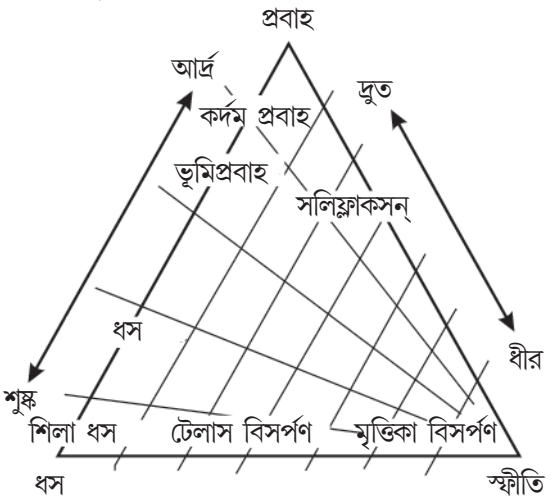

চিত্র 6.5 : বিভিন্ন প্রকার পুঞ্জিত স্থানান্তর, তাদের স্থানান্তরের গতি এবং আর্দ্রতার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হল। (After White head, 2001)

পুঞ্জিত স্থানান্তরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (i) ধীর স্থানান্তর ও (ii) দ্রুত স্থানান্তর।

ধীর স্থানান্তর (Slow Movements) :

বিসর্পণ বা *Creep* হল ধীর প্রবাহের একটি রূপ যা মৃত্তিকা বেষ্টিত মাঝারি ঢালযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পদার্থের স্থানান্তর অত্যন্ত ধীরগতিতে হয় এবং তা খুবই অপ্রত্যক্ষ যা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছাড়া বোঝা খুব কঠিন। এক্ষেত্রে মৃত্তিকা বা শিলা ভগ্ন স্তুপ স্থানান্তরিত হয়। তোমরা কি কখনও টেলিফোনের খুঁটি, বৈদ্যুতিক খুঁটি প্রভৃতিকে তাদের রৈখিক অবস্থানের তুলনা একটু হেলে থাকতে দেখেছ? যদি দেখে থাক, তবে জানবে যে, তা হল মৃত্তিকা বিসর্পণের প্রভাব। ঢালের প্রকৃতি ও পদার্থের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের বিসর্পণ লক্ষ্য করা যায়। যথা - মৃত্তিকা বিসর্পণ, ট্যালাস বিসর্পণ, শিলা বিসর্পণ; শিলা হিমবাহ বিসর্পণ প্রভৃতি। এই পর্যায়ে আর একটি প্রক্রিয়াও রয়েছে যা **মৃত্তিকাপাত বা** *solifluction* নামে পরিচিত। মৃত্তিকাপাতে জল দ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা কণাগুলো নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে ভূমির ঢাল বরাবর নিচের দিকে নামতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে অধিক দেখা যায়। ঐ সকল অঞ্চলে যখন গভীরভাবে বরফাবৃত মৃত্তিকার উপরিস্তরের মৃত্তিকায় গলন হয় তখন উপরিস্তরটি বৃষ্টিদ্বারা পরিপৃক্ত হয় এবং নিম্নস্তর অপ্রবেশ্য হওয়ায় উপরের অংশের ধীর প্রবাহের মাধ্যমে চলন ঘটে।

দ্রুত স্থানান্তর (Rapid Movements) :

দ্রুত পুঞ্জিত স্থানান্তর মূলত আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় এবং মৃদু থেকে খাড়া ঢালযুক্ত অংশে ঘটে থাকে। সূক্ষ্ম দানাযুক্ত মৃত্তিকা জলের সংস্পর্শে সিক্ত হয়ে কোনো উচ্চস্থান থেকে ঢাল বরাবর নিচের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করলে তাকে **মৃত্তিকা প্রবাহ** (*earthflow*) বলে। মাঝে মাঝে পদার্থের স্লাম্প ঘটে বা খাড়া সিঁড়ির মতো ঢালের সৃষ্টি করে। যার ফলে খাড়া ঢালযুক্ত ঊর্ধ্বাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ঢালের নিম্নাংশে স্ফীতিশীল ভগ্নস্তূপ গঠন করে। যখন ঢাল খাড়া হয় তখন গভীর আবহবিকারপ্রাপ্ত আগ্নেয়শিলাও স্থলিত হয়ে যায়।

এই শ্রেণির অপর প্রক্রিয়াটি হল কর্দম প্রবাহ। পাহাড়ের ঢালে গাছপালার অভাবে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আবহবিকারজাত পদার্থের স্তর জল দ্বারা সম্পৃক্ত হলে ধীর বা দ্রুত গতিতে যখন একটি নির্দিষ্ট খাতে বাহিত হয় তখন তাকে **কর্দম প্রবাহ** (*mudflow*) বলে। এটি দেখতে অনেকটা উপত্যকার মধ্যে কর্দম যুক্ত নদীর মতো হয়। কর্দম প্রবাহের দ্বারা রাস্তা, সেতু, বাড়িঘর প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সক্রিয় আগ্নেয়গিরির পাহাড়ের ঢালে কর্দম প্রবাহ প্রায়শই ঘটে। আগ্নেয় ধূলা, ছাই এবং অন্যান্য পদার্থ প্রবল বর্ষণে কাদায় রূপান্তরিত হয় এবং নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে জনবসতির প্রবল ক্ষতি করে। এই শ্রেণির তৃতীয় প্রক্রিয়াটি হল ভগ্নস্তূপ সম্প্রপাত, যা আর্দ্র অঞ্চলের খাড়া ঢালের বৈশিষ্ট্য, যেখানে গাছপালা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। ভগ্নস্তূপ সম্প্রপাত কর্দম প্রবাহ থেকে অনেক বেশি দ্রুত প্রবাহিত হয়। এটি হিমানী সম্প্রপাতের সমতুল্য।

> দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত এবং উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতে গত দশকে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার ফলে বিধ্বংসী কর্দম প্রবাহ ঘটে, যা বিস্ফোরণ চলাকালীন ও বিস্ফোরণ পরবর্তী সময়েও ঘটেছিল।

ভূমিধস (Landslides) :

ভূমিধস তুলনামূলকভাবে দ্রুত এবং অনুধাবনযোগ্য পুঞ্জিত স্থানান্তর। এই প্রকার স্থানান্তরে যে সকল পদার্থ স্থানান্তরিত হয় তা তুলনামূলকভাবে শুষ্ক হয়। শিলাস্তরের স্খলন মূলত শিলার গঠন ও আকার, আবহবিকারের প্রকৃতি এবং ঢালের কৌণিক মানের ওপর নির্ভর করে। স্থানান্তরের প্রকৃতি অনুযায়ী, নানা প্রকার ভূমিধস লক্ষ করা যায়।

পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলে যখন শিলা ভগ্নস্তূপ দ্রুত গতিতে পিছলে নীচের দিকে নামে তখন পদার্থ সমূহের ঢালের নিরিখে যে পশ্চাৎ ঘূর্ণন ঘটে তাকে **স্লাম্প** (*Slump*) বলে (চিত্র 6.6)। ভূমিজ পদার্থের দ্রুত প্রবাহের ফলে যখন ভগ্নস্তূপের ধস পশ্চাৎ ঘূর্ণন ব্যতীত হয়ে থাকে তখন তাকে **ভগ্নস্তূপ ধস** (*debris slide*) বলে। খাড়া ঢাল বেয়ে যখন ভগ্নস্তূপ সহসা গড়িয়ে নীচে পড়তে থাকে তখন তাকে **ভূপাত** (*debrisfall*) বলে। উচ্চ পর্বতের ফাটল বা

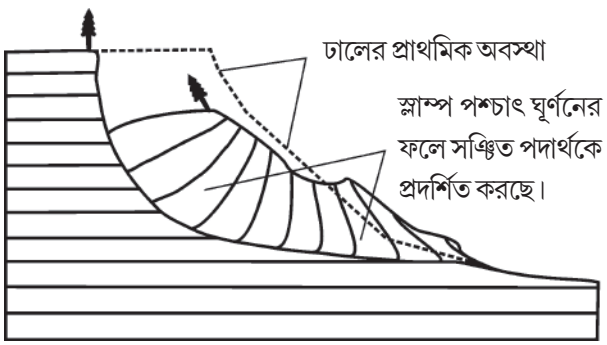

চিত্র 6.6 : পশ্চাৎ ঘূর্ণনের ফলে স্লাম্পযুক্ত ভগ্নস্তূপ

চ্যুতিযুক্ত স্থান থেকে এক বা একাধিক শিলাখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুতগতিতে গড়িয়ে পড়াকে **শিলাধস** (*rockslide*) বলে। খাড়া ঢালযুক্ত অঞ্চলে শিলাধ্বস অতি দ্রুত এবং ধংসাত্মক হয়। নীচের চিত্র 6.7 নং এ খাড়া ঢালে ভূমি ধসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। পর্বত গাত্র থেকে শিলাখণ্ডগুলো ভূমিঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অতিদ্রুত গতিতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যখন গড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে **শিলাপতন** (Rock fall) বলে। শিলাপতন ও শিলা ধসের মধ্যে পার্থক্য হল যে, শিলাপতন শিলার পৃষ্ঠস্থ স্তরের অপসরণের ফলে ঘটে এবং শিলা ধসে শিলাখণ্ড অপসারিত হয়।

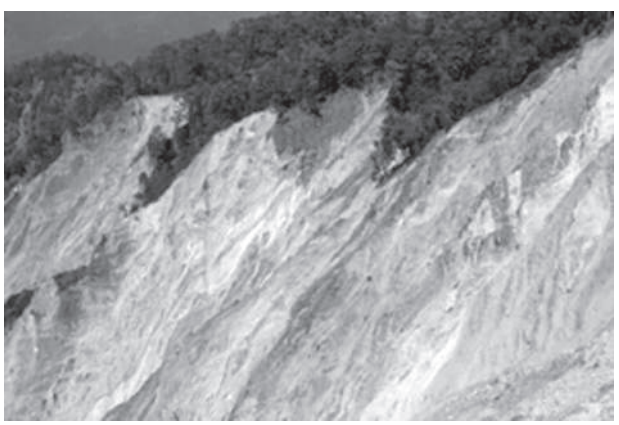

চিত্র 6.7 : শিবালিক হিমালয়ে সারদা নদীর তীরে ভারত-নেপাল সীমান্ত, উত্তরপ্রদেশে ভূমিধসের চিহ্ন

পুঞ্জিত ক্ষয় ও পুঞ্জিত স্থানান্তর দুটি শব্দের মধ্যে তোমার কোন্ শব্দটি অধিক অর্থবহ বলে মনে হয় এবং কেন? সলিফ্লাকসনকে (solifluction) কি দ্রুত প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?। কেন করা যায় বা যায় না?

আমাদের দেশে, হিমালয় পাদদেশীয় অঞ্চলে ভগ্নস্তূপ সম্প্রপাত এবং ধস প্রায়শই ঘটে থাকে। এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ভূ-গাঠনিকভাবে যথেষ্ট সক্রিয়। হিমালয়ের বেশিরভাগ অংশ পাললিক শিলার আংশিক সংহত ও অসংহত সঞ্চয় দ্বারা গঠিত। এছাড়া এই পর্বতের ঢালও যথেষ্ট খাড়া। হিমালয়ের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত নীলগিরি পর্বত অথবা পশ্চিমঘাট পর্বত ভূগাঠনিক দিক থেকে অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং এই পর্বতগুলো মূলত কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত। তা সত্ত্বেও এই পার্বত্য অঞ্চলে ধস ও ভগ্নস্তূল সম্প্রপাত লক্ষ করা যায়। কেন? কারণ, পশ্চিমঘাট এবং নীলগিরি পর্বতের অধিকাংশ ঢালই খাড়া এবং উল্লম্ব ভৃগুযুক্ত হওয়ায় ধস পড়তে দেখা যায়। এছাড়া তাপমাত্রা পরিবর্তন ও প্রসারের ফলে যান্ত্রিক আবহবিকার এবং স্বল্প সময়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত প্রভৃতি কারণে শিলা প্রপাত (Rock fall) ধস ও ভগ্নস্তূপ সম্প্রপাত ঘটে থাকে।

ক্ষয়ীভবন ও সঞ্চয় (Erosion and Deposition):

ক্ষয়ীভবনের শিলা ভগ্নস্তূপের স্তূপিকরণ ও পরিবহণ ঘটে। যখন বিশাল আকৃতির শিলা আবহবিকার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় ও ক্ষয়ীভবনের বিভিন্ন শক্তি যথা প্রবহমান নদী, ভৌমজল, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা অপসারিত হয়ে অন্যত্র পরিবাহিত হয়, যা আবার ওই সকল শক্তির গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ক্ষয়ীভবনের এই শক্তিগুলোর সাথে পরিবাহিত শিলা ভগ্নস্তূপের অবঘর্ষণ ও ক্ষয়ীভবনে সাহায্য করে। ক্ষয়ীভবনের দ্বারা ভূমিরূপের ক্ষয় হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের স্থলন ঘটে। যদিও আবহবিকার ক্ষয়ীভবনে সাহায্য করে কিন্তু আবহবিকারকে ক্ষয়ের প্রাক্-শর্ত বলা যায় না। আবহবিকার, পুঞ্জিত ক্ষয় এবং ক্ষয় হল নগ্নীভবনের প্রক্রিয়া। তবে ভূ-পৃষ্ঠের অবিরাম পরিবর্তনের জন্য ক্ষয়ীভবনই দায়ী। চিত্র নং 6.1-এ দেখানো হল যে, কীভাবে গতিশক্তি দ্বারা নগ্নীভবনের প্রক্রিয়াসমূহ যথা ক্ষয়ীভবন ও পরিবহণ নিয়ন্ত্রিত হয়, যা বায়ুপ্রবাহ, নদী, হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গ, ভৌমজল প্রভৃতি শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরা যথাক্রমে পদার্থের তিনটি অবস্থার নির্দেশ করে, যথা - গ্যাসীয় (বায়ু), তরল (নদী) এবং কঠিন (হিমবাহ)।

তোমরা কি এই তিনটি জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত শক্তিগুলোর মধ্যে তুলনা করতে পারবে?

ক্ষয়ীভবনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায়, "ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির সাথে গতিশক্তির মিলন, এবং ভূপৃষ্ঠে, যাহার উপর এই শক্তি পরিচালিত হয়, তার প্রয়োগ।" গতিশক্তি পরিমাপ করা হয়, (Kinetic energy) $KE = {}^{1}/_{2}\, mv^2$। যেখানে, 'm' হল ভর (mass)। 'v' হল গতিবেগ (velocity)।

তাই কোনো কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বস্তুর ভর এবং গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। তাই হিমবাহ তাদের প্রচণ্ড ভরের জন্য খুব ধীরগতিতে প্রবাহিত হয় কিন্তু তার ক্ষয়কারী শক্তি বেশি। বায়ু, যেহেতু গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে তাই কম প্রভাবশালী। অপর দুটো ক্ষয়কারী শক্তি যথা - সমুদ্র তরঙ্গ এবং ভৌমজল জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সমুদ্র তরঙ্গের কার্যাবলি মূলত জলমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের সংযোগস্থলে অবস্থিত উপকূল অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে ভৌমজলের কার্য শিলার গঠনের উপর নির্ভর করে। যদি শিলা প্রবেশ্য ও দ্রবণযোগ্য হয় এবং জল পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তখন **কার্স্ট ভূমিরূপ** (karst topography) গঠন হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি দ্বারা গঠিত ভূমিরূপগুলো আলোচনা করব।

সঞ্চয় হল ক্ষয়ের ফলাফল। ভূমিরূপ গঠনকারী এই শক্তিগুলো যখন মৃদু ঢালযুক্ত অঞ্চলে তাদের গতিবেগ হারিয়ে ফেলে তখন তাদের দ্বারা পরিবাহিত পদার্থসমূহ সঞ্চিত হতে শুরু করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সঞ্চয় মূলত কোনো ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির কাজ না। সঞ্চয়কার্যে সর্বপ্রথম বড়ো দানার সঞ্চয় ঘটে ও ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র দানার সঞ্চয় ঘটে থাকে। সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের নীচু অংশগুলো ভরাট হয়। ক্ষয়কারী শক্তিগুলোই সঞ্চয়কারী শক্তি হিসাবে কাজ করে।

ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ও সঞ্চয়কার্যের ফলে কীরূপ পরিবর্তন হয় তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

পুঞ্জিত ক্ষয় ও ক্ষয়ীভবন দুটো প্রক্রিয়াতেই পদার্থের স্থানান্তর ঘটে। তবে উভয়ই কেন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত হয় না? আবহবিকার ছাড়া কি শিলার ক্ষয়কার্য সম্ভব?

মৃত্তিকা গঠন (Soil Formation) :

মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার উপাদানসমূহ (Soil and Soil Contents) :

তোমরা মৃত্তিকায় গাছের বৃদ্ধি হতে দেখেছ। তোমরা মাঠে খেলাধুলা করার সময় মৃত্তিকার সংস্পর্শে আস। খেলাধুলা করার সময় তোমরা মৃত্তিকা হাতে ধর এবং জামাকাপড়ে মাটি লাগিয়ে ফেল। মৃত্তিকা কী তা কি ব্যাখ্যা করতে পারবে?

মৃত্তিকাবিদ, যিনি মৃত্তিকা নিয়ে গবেষণা করেন, মৃত্তিকাকে ভূ-পৃষ্ঠের একটি প্রাকৃতিক উপাদান বলেছেন যাতে অসংখ্য জীবিত ও মৃত উপাদান রয়েছে এবং যা গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করে।

মৃত্তিকা একটি সক্রিয় মাধ্যম যার মধ্যে অনেক রাসায়নিক, ভৌতিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মৃত্তিকা পদার্থের ক্ষয়ের ফলে গড়ে ওঠে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মাধ্যমরূপে কাজ করে। এটি পরিবর্তনশীল পদার্থ। এর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। এটি পর্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ আবার শুষ্ক ও আর্দ্র হতে পারে। মৃত্তিকার জৈবিক প্রক্রিয়া খুব শীতল ও অত্যধিক শুষ্কতায় কমে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যায়. মৃত্তিকার জৈব পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যখন মৃত্তিকায় মৃত উদ্ভিদ ও শুকনো পাতালতা যুক্ত হয়। মৃত্তিকার রাসায়নিক অবস্থা, জৈব পদার্থের পরিমাণ, মৃত্তিকার প্রাণী ও উদ্ভিদ, তাপমাত্রা এবং জলীয়বাষ্প সব কিছুই ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, মৃত্তিকা, জলবায়ু, ভূমিকম্প ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এই সকল নিয়ন্ত্রকের পরিবর্তনের সাথে সাথে মৃত্তিকার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও ঘটে।

মৃত্তিকা গঠনের প্রক্রিয়া (Process of Soil Formation):

মৃত্তিকার গঠন বা পেডোজেনেসিস্ প্রথমত আবহবিকারের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকা গঠনের প্রাথমিক শর্ত হল আবহবিকার প্রাপ্ত পদার্থের গঠন। প্রথমত আবহবিকার প্রাপ্ত পদার্থ বা পরিবাহিত ও সঞ্চিত পদার্থে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও কিছু নিকৃষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ যেমন - মস্ ও লাইকেনের উপস্থিতি দেখা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ হিউমাস গঠনে সাহায্য করে। এই স্তরে ধীরে ধীরে ছোটো খাটো ঘাস ও ফার্ন জন্মাতে শুরু করে এবং পাখি বা বাতাসের দ্বারা যখন বীজের বিস্তার ঘটে তখন বড়ো গাছও জন্মাতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে গাছের শিকড় প্রসারিত হয়, মৃত্তিকায় গর্তকারী প্রাণী নিম্নস্থ পদার্থ উপরে নিয়ে আসে। শিলা চূর্ণগুলো প্রবেশ্য এবং স্পঞ্জের ন্যায় রূপ নেয় যা জলধারণ করতে পারে এবং বাতাস চলাচল করতে পারে। অবশেষে পরিপূর্ণরূপে পরিণত মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় যা খনিজ পদার্থ ও জৈব পদার্থের একটি জটিল মিশ্রণ।

শুধুমাত্র আবহবিকারই কি মৃত্তিকা গঠনের জন্য দায়ী? যদি না হয় তবে কেন?

পেডোলজি হল মৃত্তিকা বিজ্ঞান। পেডোলজিস্ট হলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী।

মৃত্তিকা সৃষ্টির কারণসমূহ (Soil-forming Factors) :

মৃত্তিকা গঠনের পাঁচটি প্রাথমিক কারণ রয়েছে সেগুলো হল — (i) প্রাথমিক উপাদান (ii) ভূ-প্রকৃতি, (iii) জলবায়ু, (iv) জৈবিক সক্রিয়তা এবং (v) সময়। যদিও মৃত্তিকা গঠনকারী কারণসমূহ সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

প্রাথমিক উপাদান (*Parent Material*) :

প্রাথমিক উপাদান হল মৃত্তিকা গঠনের একটি নিষ্ক্রিয় নিয়ন্ত্রক। কোনো অন্তর্জাত বা বর্হিজাত আবহবিকার প্রাপ্ত শিলা ভগ্নস্তূপ বা পরিবাহিত শিলা। ভগ্নস্তূপকে প্রাথমিক উপাদান (*Parent Material*) নামে অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার গঠন মূলত শিলার (শিলা ভগ্নস্তূপের আকৃতি) এবং কাঠামোসহ (প্রতিটি কণার সঞ্চয়/ভগ্নস্তূপের কণা) খনিজ এবং রাসায়নিক উপাদানের উপর নির্ভর করে।

প্রাথমিক উপাদানের অন্তর্গত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিলার প্রকৃতি ও আবহবিকারের মাত্রা এবং আবহবিকার প্রাপ্ত গুরুমণ্ডলের গভীরতা। বিভিন্ন ধরনের শিলা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা গড়ে ওঠে যা সমপ্রকৃতির প্রাথমিক শিলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আবার কখনও মৃত্তিকায় বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যখন মৃত্তিকা একেবারে নবীন থাকে তখন আদি শিলার সঙ্গে অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে যেখানে আবহবিকার প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট সেখানে মৃত্তিকা প্রধানত আদি শিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়।

ভূ-প্রকৃতি (*Topography*) :

ভূ-প্রকৃতিও প্রাথমিক উপাদানের মতো মৃত্তিকা সৃষ্টির অন্যতম সক্রিয় নিয়ন্ত্রক। সূর্য থেকে আগত সৌরকিরণ ও তার পরিমাণ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ আদি শিলার ধারন ক্ষমতার ওপর ভূ-প্রকৃতির

প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক উপাদানের ওপর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জল নির্গমনের ওপরও ভূ-প্রকৃতির প্রভাব দেখা যায়। খাড়া ঢালযুক্ত ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের মৃত্তিকা স্তর পাতলা আবার সমতল অঞ্চলে মৃত্তিকার স্তর পুরু হয়। মৃদু ঢালযুক্ত অঞ্চল যেখানে ক্ষয়ের গতি মন্থর এবং জলের অনুপ্রবেশ ভালো, এরূপ ভূমি মৃত্তিকা গঠনের ক্ষেত্রে অনুকূল। সমতল অঞ্চলে যে মৃত্তিকা গঠিত হয় সেখানে কর্দমের একটি পুরু আস্তরণ দেখা যায় ও প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ জমা হয় এবং মৃত্তিকাটিকে একটি গাঢ় রং দেয়। মধ্য অক্ষাংশীয় অঞ্চলে পাহাড়ের দক্ষিণ ঢাল, যেখানে সূর্যালোক বেশি পাওয়া যায় সেখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকায় যে ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, উত্তর ঢালে, যেখানে সূর্যালোকের পরিমাণ কম ও শীতল আর্দ্র অবস্থা বিরাজমান সেখানকার মৃত্তিকায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

জলবায়ু (*Climate*):

মৃত্তিকা সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল জলবায়ু। মৃত্তিকা গঠনে জলবায়ুর প্রধন উপাদানগুলো হল — (i) জলীয়বাষ্পের তীব্রতা, পুনরাবৃত্তি এবং অধঃক্ষেপণ, বাষ্পীভবন ও আর্দ্রতার স্থায়িত্ব; (ii) ঋতুভেদে তাপমাত্রার দৈনিক ও বার্ষিক প্রসর।

অধঃক্ষেপণের ফলে মৃত্তিকা তার আর্দ্রতা পায়, যা মৃত্তিকার রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়াগুলোতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত পরিমাণ জল পাওয়া গেলে মৃত্তিকার উপাদানগুলোর মৃত্তিকার নিম্নস্তরে পরিবহণ সম্ভব হয় (এলুভিয়েশন) এবং এই সকল পদার্থের নিম্নস্তরে সঞ্চয়ে সাহায্য করে (এলুভিয়েশন)। আর্দ্র নিরক্ষীয় বৃষ্টি জলবায়ু অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি শুধুমাত্র ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতিই অপসারিত হয় না, মৃত্তিকা থেকে বিশাল পরিমাণ সিলিকাও অপসারিত হয়। মৃত্তিকা থেকে সিলিকার অপসরণকে **ডিসিলিকেসন** (*desilication*) বলে। শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে অধিক উষ্ণতার জন্য বাষ্পীভবনের পরিমাণ অধঃক্ষেপণ থেকে বেশি হওয়ায় ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠে কৈশিক প্রক্রিয়ায় উঠে আসে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল বাষ্পীভূত হবার ফলে মৃত্তিকার উপরের স্তরে লবণের আস্তরণ জমা হয়। ভূত্বকে এ ধরনের লবণের আস্তরণ জমা হলে মৃত্তিকাকে **হার্ডপ্যান** (hardpan) বলা হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ক্যালশিয়াম কার্বনেটের ক্ষুদ্র কণা (কংকর) তৈরি হয়।

তাপমাত্রা দু-ভাবে কাজ করে — রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটানো। রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ উচ্চ তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা কমলে হ্রাস পায় (কার্বনেশন ব্যতীত) এবং জমাটবদ্ধ অবস্থায় এটা বন্ধ হয়। এই কারণে ক্রান্তীয় মৃত্তিকায় যেখানে তাপমাত্রা বেশি সেখানে গভীর মৃত্তিকা পরিলেখ দেখা যায় এবং তুন্দ্রা অঞ্চলে মৃত্তিকায় যান্ত্রিক উপায়ে বিচূর্ণ হওয়া পদার্থ বেশি দেখা যায়।

জৈবিক সক্রিয়তা (*Biological Activity*) :

প্রাথমিক উপাদানকে যেভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং জৈব উপাদানসমূহ শুরু থেকে ঢেকে রাখে, সেসব জৈবিক পদার্থ পরবর্তি পর্যায়ে আর্দ্রতা ধারণ, জৈবিক পদার্থের সংযোজন, নাইট্রোজেনের সংযোজন প্রভৃতিতে সাহায্য করে। মৃত উদ্ভিদ মৃত্তিকায় হিউমাসের যোগান দেয় যা মৃত্তিকার জৈবিক পদার্থের মূল ভিত্তি। **হিউমিফিকেশন** প্রক্রিয়ায় যেসকল জৈবিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয় তা প্রাথমিক উপাদানে খনিজ সমূহের পচনে সাহায্য করে।

ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতার তীব্রতার উপর শীতল এবং উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকার গঠন নির্ভর করে। শীতল জলবায়ু অঞ্চলে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কম হয় বলে হিউমাস জমা হয়। তুন্দ্রা এবং উপ-মেরু প্রদেশীয় অঞ্চলে মৃত্তিকায় পিটের (*peat*) স্তর জমতে দেখা যায় কারণ সেখানে অপচিত জৈব পদার্থের সঞ্চয় গড়ে ওঠে। ঐ অঞ্চলে নাইট্রোজেনের স্থিতিকরণ (nitrogen fixation) ঘটে। শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে যা ওই গাছের শিকড়ে নাইট্রোজেন সঞ্চয় ঘটায়, এবং এগুলো ঐ সকল গাছের জন্যও উপকারী। বড়ো প্রাণী যথা পিঁপড়া, উঁইপোকা, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী যান্ত্রিক উপায়ে মৃত্তিকা গঠনে সাহায্য করে। কেঁচো যেহেতু মৃত্তিকাতেই থাকে ও মৃত্তিকা থেকেই পুষ্টি গ্রহণ করে, তাই এদের কারণে মৃত্তিকার গ্রথন বা বুনন এবং রাসায়নিক গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়।

সময় (*Time*) :

সময় মৃত্তিকা সৃষ্টির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। মৃত্তিকা গঠনে যে সময় নেয় তার উপর মৃত্তিকার পরিণত হওয়া ও পরিলেখ গঠন নির্ভর করে। একটি অঞ্চলের মৃত্তিকা তখনই পরিণত হয় যখন সকল প্রকার মৃত্তিকা গঠনকারী উপাদান একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে

মৃত্তিকা গঠন ও মৃত্তিকা গঠনকারী কারণসমূহকে আলাদা করার প্রয়োজন আছে কি?
সময়, ভূ-প্রকৃতি এবং প্রাথমিক উপাদানকে কেন মৃত্তিকা গঠনের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক বলা হয়?

পরিচালিত হয়। যেসকল মৃত্তিকা সাম্প্রতিককালে সঞ্চিত পলি বা হিমবাহ বাহিত কর্দম সঞ্চয়ের ফলে গঠিত হয় সেগুলো নবীন মৃত্তিকা এবং তাদের কোনো স্তরায়ণ দেখা যায় না। মৃত্তিকার সম্পূর্ণরূপে পরিণত হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) নীচের কোন্‌টি পর্যায়নের প্রক্রিয়া :
(a) সঞ্চয় (c) অগ্ন্যুদ্‌গম
(b) ভূ-বিপর্যয় (d) ক্ষয়।

(ii) কোন্ পদার্থটি জলযোজন দ্বারা প্রভাবিত হয় :
(a) গ্রানাইট (c) কোয়ার্টজ
(b) কর্দম (d) লবণ

(iii) ভগ্নস্তূপ সম্প্রপাত কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত :
(a) ভূমিধস (c) দ্রুত প্রবাহে পুঞ্জিত স্থানান্তর
(b) ধীর প্রবাহে পুঞ্জিত স্থানান্তর (d) অধোগমন

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 30টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) 'আবহবিকারের জন্য পৃথিবীতে জৈব বৈচিত্র্য দেখা যায়' — কেন?

(ii) পুঞ্জিত ক্ষয়ের সেই সকল প্রক্রিয়াগুলো তালিকাভুক্ত করো যেগুলো দ্রুত এবং অনুধাবনযোগ্য।

(iii) বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী ও চলমান ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তিসমূহের নাম লেখো। এদের প্রধান কাজ কী?

(iv) আবহবিকার কি মৃত্তিকা সৃষ্টির অন্যতম প্রাথমিক শর্ত? কেন?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) 'আমাদের পৃথিবী দুটি বিপরীত প্রকৃতির ভূমিরূপ প্রক্রিয়ার লীলাক্ষেত্র' — আলোচনা করো।

(ii) বহির্জাত ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলো তাদের মূল চালিকা শক্তি সৌর কিরণ থেকে অর্জন করে — ব্যাখ্যা করো।

(iii) যান্ত্রিক আবহবিকার এবং রাসায়নিক আবহবিকার কি একে অপরের উপর নির্ভরশীল? যদি না হয় তবে কেন? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

(iv) মৃত্তিকা গঠনকারী প্রক্রিয়া এবং মৃত্তিকা গঠনকারী কারণের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? মৃত্তিকা সৃষ্টিতে জলবায়ু এবং জৈবিক সক্রিয়তার ভূমিকা আলোচনা করো।

প্রকল্পমূলক কাজ

তোমার আশেপাশের ভূ-প্রকৃতি এবং প্রাপ্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে তোমার অঞ্চলের জলবায়ু, সম্ভাব্য আবহবিকার প্রক্রিয়া এবং মৃত্তিকার উপাদানের পর্যবেক্ষণ করে বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করো।

অধ্যায়

7

ভূমিরূপ এবং এদের বিবর্তন

LANDFORMS AND THEIR EVOLUTION

আবহবিকার প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ভূ-উপাদানগুলো ভূ-পৃষ্ঠ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে এবং ভূমিরূপ গঠনকারী উপাদান যেমন - প্রবাহিত জল, ভৌমজল, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ, তরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয় সাধিত হয়। তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, ক্ষয়ীভবন ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটায়। অবক্ষেপণ (Deposition) হল ক্ষয়ীভবন (erosion) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এবং অবক্ষেপণের কারণেও ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটে থাকে।

যেহেতু এই অধ্যায় ভূমিরূপ এবং এদের বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সর্বপ্রথম এটা জানা দরকার যে, ভূমিরূপ (land-form) কাকে বলে? সহজ ভাষায়, ছোটো থেকে মাঝারি আকারের ভূ-পৃষ্ঠকে ভূমিরূপ বলা হয়।

যদি ভূ-পৃষ্ঠের ছোটো থেকে মাঝারি আকারকে ভূমিরূপ বলা হয়, তবে ভূদৃশ্য (landscape) কী?

অনেকগুলো সম্পর্কযুক্ত ভূমিরূপ একত্রিত হয়ে ভূদৃশ্য গঠন করে, (যা ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তৃত ভাগ)। প্রতিটি ভূমিরূপের কিছু নিজস্ব ভৌগোলিক আকৃতি, আকার, উপাদান থাকে যা নির্দিষ্ট কিছু ভূপ্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক শক্তির (agents) সম্মিলিত কার্যের ফল। বেশিরভাগ ভূ-আকৃতির প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ধীরগতিতে কাজ করে চলছে, তাই এগুলো আকার নিতে দীর্ঘ সময় নেয়। প্রত্যেক ভূমিরূপের একটি প্রারম্ভ থাকে। ভূমিরূপ একবার গঠনের পর এদের আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে যা ভূমিরূপ গঠনের প্রক্রিয়া এবং শক্তিগুলোর ক্রমাগত ধীরে বা দ্রুতগতিতে কার্যকারিতার কারণে হয়ে থাকে।

জলবায়ু সম্পর্কিত অবস্থার পরিবর্তন এবং স্থলভাগের উল্লম্ব বা অনুভূমিক আন্দোলনের কারণে অথবা প্রক্রিয়াগুলোর তীব্রতা বা প্রক্রিয়াগুলো নিজেরাই পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে ভূমিরূপগুলো নতুন পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে **বিবর্তন** (Evolution) বলতে ভূ-পৃষ্ঠের একটি অংশের এক ভূমিরূপ থেকে অন্য ভূমিরূপের রূপান্তর বা একবার গঠিত হবার পরে পৃথক ভূমিরূপ গঠনের রূপান্তরকে বোঝায়। এর মানে হল, প্রতিটি ভূমিরূপ বিকাশের একটি ইতিহাস থাকে এবং সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। একটি ভূখণ্ড বিকাশের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় যা কিছুটা জীবন পর্যায়ের সাথে তুলনীয় যেমন-যৌবন (youth), প্রৌঢ় বা পরিণত (mature) এবং বার্ধক্য (old age)।

ভূমিরূপ বিবর্তনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কী?

ভবিষ্যতের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সম্ভাব্যতা হ্রাস না করে কার্যকরভাবে এটি ব্যবহার করার জন্য এর ক্রমাগত পরিবর্তিত বিবর্তনীয় ইতিহাসটি বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভূমিরূপবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল ভূ-পৃষ্ঠের পুনঃনির্মাণের ইতিহাস, গঠনগত অধ্যয়ন, নির্মাণকারী পদার্থসমূহ এবং আকার ধারণের প্রক্রিয়াসমূহ প্রভৃতি।

বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক উপাদানের (geomorphic agents) ক্ষয়ীভবনের দ্বারা বেশিরভাগ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয়। নিঃসন্দেহে, অবক্ষেপণ (deposition) প্রক্রিয়াও অববাহিকা (basin), উপত্যকা বা নীচু স্থলকে ভরাট করে ভূমিভাগে পরিবর্তন আনে। ক্ষয়ীভবনের পরে অবক্ষেপণ হয়ে থাকে এবং অপক্ষেপিত পৃষ্ঠও (depositional surfaces) পুনরায় ক্ষয়ীভূত হয়। প্রবাহমান জল (Running water), ভৌমজল (ground-water), হিমবাহ (glaciers), বায়ুপ্রবাহ (wind) এবং তরঙ্গ (waves) প্রভৃতি শক্তিশালী ক্ষয়ীভবনকারী ও অবক্ষেপণকারী শক্তিগুলো, আবহবিকার এবং পুঞ্জিত ক্ষয় (mass wasting) প্রক্রিয়ার সহায়তায় ভূ-পৃষ্ঠকে আকার দান করে এবং পরিবর্তন আনে। এই ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তিসমূহ দীর্ঘকালীন সময় যাবৎ কার্য করে ক্রমবদ্ধ (systematic) পরিবর্তন আনে। যার ফলস্বরূপ ভূমিরূপের অণুক্রমিক (sequential) বিকাশ হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি এক বিশেষ প্রকার ভূমিরূপের একত্রীভবন (assemblage) ঘটায়। শুধু তাই নয়,

প্রতিটি ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং শক্তি এদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপগুলোর উপর স্বতন্ত্র একটি ছাপ (imprint) ছাড়ে। তোমরা জান যে, অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো খুব ধীরে ধীরে (যা প্রত্যক্ষ করা যায় না) কার্য করে এবং এগুলোকে এদের পরিণাম দ্বারাই দেখা এবং মাপা যেতে পারে। এর পরিণাম বা ফলাফল (results) কী? এই ফলাফলগুলো ভূমিরূপ ও এদের বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই না। অতএব, এই ভূমিরূপগুলোর অধ্যয়নই, আমাদেরকে সেই প্রক্রিয়া এবং শক্তিগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবে যা এই ভূমিরূপগুলোকে তৈরি করেছে বা করছে।

বেশিরভাগ ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কিছু প্রক্রিয়ার নাম বলো যাদের দেখা যেতে পারে এবং এমন কিছু যাদের দেখা যায় না।

যেহেতু, ভূ-প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ক্ষয়ীভবন এবং অবক্ষেপণে সক্ষম, তাই ক্ষয়ীভূত বা ধ্বংসাত্মক ও অবক্ষেপিত বা গঠনশীল — এই দুই প্রকার ভূমিরূপের নির্মাণ হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভূ-প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ বিকশিত হয়, যা প্রধানত ধরন (type) ও কাঠামো (structure) যথা - খাঁজ (folds), চ্যুতি (faults), দারণ (joints), ফাটল (fractures), কঠোরতা (hardness) ও কোমলতা (softness), প্রবেশ্যতা (permeability) ও অপ্রবেশ্যতা (impermeability) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অন্যান্য কিছু স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রকও আছে যেমন - (i) সমুদ্রতলের স্থায়িত্ব (ii) ভূখণ্ডের ভূ-গঠনকারী স্থায়িত্ব (iii) জলবায়ু - যা ভূমিরূপের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই তিনটি নিয়ন্ত্রকের মধ্যে যে-কোনো একটি বিঘ্নিত হলে ভূমিরূপের ক্রমবদ্ধ এবং অণুক্রমিক বিকাশ ও বিবর্তন বিপর্যস্ত হতে পারে।

এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় প্রত্যেক ভূ-প্রাকৃতিক শক্তি যেমন - প্রবহমান জল, ভৌমজল, হিমবাহ, তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। এই শক্তিগুলোর দ্বারা ভূখণ্ড ক্ষয়ীভবন এর মাধ্যমে কীভাবে প্রভাবিত হয়, সেটিও আলোচনা করা হল। এর সাথে কিছু ক্ষয়ীভূত এবং অবক্ষেপিত ভূমিরূপের বিকাশও আলোচিত হল।

প্রবহমান জল (Running Water) :

আর্দ্র অঞ্চলগুলোতে, যেখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে প্রবহমান জল ভূ-পৃষ্ঠের অবনতির (degradation) জন্য, ভূ-প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। প্রবহমান জলের দুইটি উপাদান আছে। এক, সাধারণ ভূ-পৃষ্ঠের উপর চাদরের রূপে ধৌত প্রবাহ (overland flow)। অন্যটি হল, রৈখিক প্রবাহ (linear flow) যা উপত্যকার মধ্যে নদীতে জলস্রোত রূপে প্রবাহিত হয়। প্রবহমান জল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমিরূপগুলো বেশ সবল এবং যৌবন পর্যায়ের নদীগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা খাড়া ঢালগুলোতে প্রবাহিত হয়। সময়ের সাথে সাথে খাড়া ঢালের ওপর ক্রমাগত ক্ষয়ীভবনের ফলে নদীপ্রণালীগুলো মৃদু ঢালে পরিবর্তিত হয়। ফলস্বরূপ, নদীর গতিবেগ হ্রাস পায় এবং অবক্ষেপণ শুরু হয়। এর ফলে খাড়া ঢালে প্রবাহিত নদীগুলোও কিছু ভূমিরূপ গঠন করে। কিন্তু এই ভূমিরূপসমুহ মাঝারি থেকে মৃদু ঢালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোতে তুলনামূলকভাবে ছোটো আকারে থাকে। প্রবহমান নদীর ঢাল যত মৃদু হবে, অবক্ষেপণ ততটাই অধিক হবে। যখন ক্রমাগত ক্ষয়ীভবনের ফলে নদীর তলদেশ সমতল হয়ে যায়, তখন নিম্নমুখী কর্তন (downward cutting) কমে যায় এবং নদী তীরের পার্শ্বক্ষয় বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ, পাহাড় ও উপত্যকা সমতলভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

একটি উচ্চভূমির ভূ-প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরকরণ কি সম্ভব?

পৃষ্ঠদেশীয় প্রবাহ (Overland flow) স্তরায়ণ ক্ষয় (sheet erosion) ঘটায়। ভূ-পৃষ্ঠের অনিয়মিততার ওপর নির্ভর করে, পৃষ্ঠদেশীয় প্রবাহ সংকীর্ণ থেকে প্রশস্ত হতে পারে। কৃন্তন (sheer) ঘর্ষণের মাধ্যমে নদী ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহ পথে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পদার্থসমূহ বহন করে নিয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে ছোটো ও সংকীর্ণ নালা বা স্রোতস্বিনী (rills) গঠন করে। এই স্রোতস্বিনীগুলো ধীরে ধীরে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত খাতে (gullies) পরিণত হয়। এই খাতগুলো সময়ের সাথে সাথে গভীর, বিস্তৃত ও দীর্ঘায়িত হয়ে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে উপত্যকার একটি জাল (network) সৃষ্টি করে।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিম্নমুখীকর্তন অধিক থাকে, যার ফলে অনিয়মিততা যেমন - জলপ্রপাত (waterfalls) এবং সোপানী জলপ্রপাত বা কাসকেড (cascades) ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে যায়। মধ্যাবস্থায়, নদীগুলো তলদেশ বরাবর ধীরে কর্তন করে এবং উপত্যকার পাশে পার্শ্বক্ষয় অধিক হয়। ক্রমান্বয়ে উপত্যকা পার্শ্বের ঢাল নিম্ন থেকে নিম্নতর হতে থাকে। এই প্রকার নদী অববাহিকার (river basin) মধ্যে বিভাগগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত নিম্ন হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলো প্রায় সমতল হয়ে যায় এবং ক্ষয়কার্যের অবশিষ্টাংশরূপে ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে, এই ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্ট পাহাড়গুলোকে **মোনাড্‌নক** (monadnocks) বলা হয়। নদীক্ষয় দ্বারা সৃষ্ট এই প্রকার প্রায় সমতল বা সমপ্রায় ভূমিকে **'পেনিপ্লেন'** (peneplain) বলে। প্রবহমান জল দ্বারা গঠিত প্রতিটি পর্যায়ের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

যৌবন পর্যায় (Youth) :

এই পর্যায়ে নদীগুলো স্বল্প উপাদানযুক্ত ও সংখ্যায় খুব কম হয় এবং মূল ঢাল বরাবর প্রবাহিত হয়ে নদীগুলো অগভীর 'V-আকৃতির' উপত্যকা গঠন করে। এখানে প্লাবনভূমি দেখা যায় না বা মুখ্য নদীর সাথে খুব সংকীর্ণ প্লাবনভূমি দেখা যায়। এখানে বিল (marshes), জলাভূমি (swamp) এবং হ্রদ (lakes) থাকায় জলবিভাজিকা অত্যধিক বিস্তৃত ও সমতল হয়। এর উচ্চ সমতল ভূ-পৃষ্ঠের ওপর নদী এঁকে-বেঁকে (meanders) প্রবাহিত হয়। এই মিয়েন্ডারগুলো অবশেষে উচ্চভূমিতে নিজেদের প্রোথিত (entrench) করতে পারে। যেখানে স্থানীয় কঠিন শিলা পাওয়া যায়, সেখানে জলপ্রপাত (Waterfalls) এবং নদীপ্রপাত বা র‍্যাপিডস্ (rapids) দেখা যায়।

পরিণত পর্যায় (Mature) :

এই অবস্থায় নদীগুলোর জলের মাত্রা অধিক হয় এবং বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ। উপত্যকাগুলো এখনও 'V-আকৃতির' কিন্তু গভীর। মুখ্য নদী ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ায় প্লাবনভূমিও যথেষ্ট বিস্তৃত, যার ফলে নদীগুলো উপত্যকার ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়। যৌবন অবস্থায় গঠিত সমতল ও বিস্তৃত আন্তঃপ্রবাহযুক্ত অঞ্চলসমূহ এবং বিল ও জলাভূমিগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং নদী বিভাজিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জলপ্রপাত এবং র‍্যাপিডস্ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বার্ধক্য পর্যায় (Old) :

বার্ধক্য অবস্থায় ছোটো উপনদীর সংখ্যা কম থাকে এবং মৃদু ঢালযুক্ত হয়। নদীগুলো স্বতন্ত্ররূপে বিস্তৃত প্লাবনভূমির উপর প্রবাহিত হয়ে নদী বাঁক, প্রাকৃতিক তট বাঁধ (natural levees,) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (oxbow lakes) প্রভৃতি গঠন করে। হ্রদ, বিল ও জলাভূমিযুক্ত অঞ্চলে জলবিভাজিকা বিস্তৃত এবং সমতল। অধিকাংশ ভূদৃশ্য সমুদ্রতল বরাবর বা একটু উঁচুতে অবস্থান করে।

নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Erosional Landforms):

উপত্যকা (Valleys) :

উপত্যকাগুলো ছোটো এবং সংকীর্ণ ক্ষুদ্র নদী (rills) হিসেবে শুরু হয়। এই ক্ষুদ্র নদীগুলো ধীরে ধীরে লম্বা ও প্রশস্ত খাতে (gullies) পরিণত হয়। এই খাতগুলো ক্রমান্বয়ে গভীর, বিস্তৃত এবং লম্বা হয়ে উপত্যকার রূপ ধারণ করে। গঠন এবং আয়তনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকার উপত্যকা যেমন - V-আকৃতির উপত্যকা (V-shaped valley), গিরিখাত (gorge), ক্যানিয়ন (canyon) প্রভৃতি চিহ্নিত করা যেতে পারে। নদী উপত্যকা খুব গভীর ও খাড়া ঢালযুক্ত হলে তাকে **গিরিখাত** (gorge) বলে (চিত্র 7.1)। একটি ক্যানিয়নের পার্শ্বদেশও খাড়া ঢালযুক্ত হয় এবং গিরিখাতের মতো এটিও গভীর

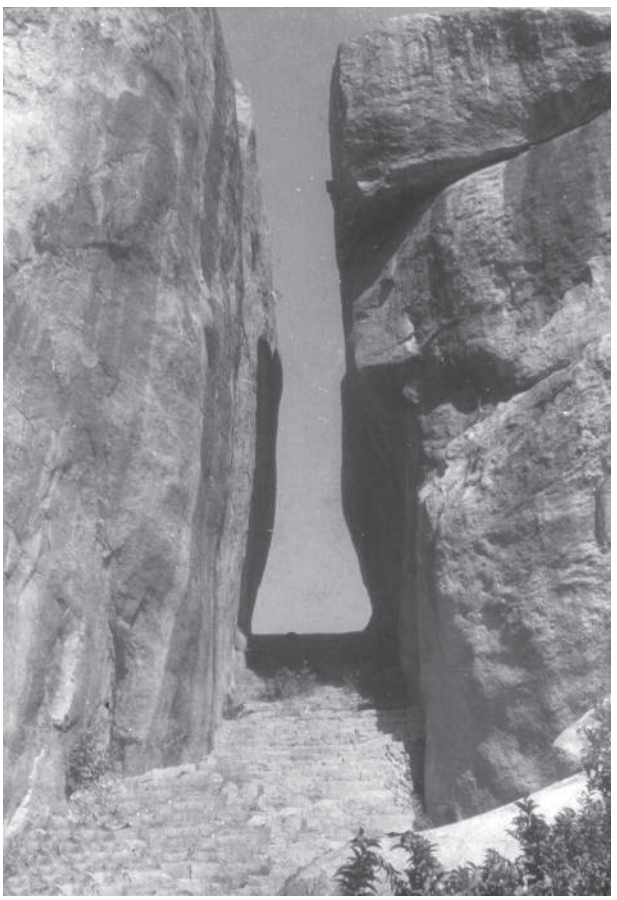

চিত্র 7.1 : তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত ধর্মপুরী জেলার হোগেনেকল-এর নিকটে কাবেরী নদীর উপত্যকায় সৃষ্ট গিরিখাত।

চিত্র 7.2 : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর একটি প্রোথিত মিয়েন্ডার বা বাঁকা লুপ, যা এর উপত্যকায় প্রদর্শিত ক্যানিয়নরূপী ধাপ সদৃশ পার্শ্বিয় ঢাল।

হয় (চিত্র 7.2)। একটি গিরিখাতের প্রস্থ এর তলদেশের মতো উপরিভাগেও প্রায় সমান হয়। অপরদিকে, একটি ক্যানিয়নের তলদেশ অপেক্ষা উপরিভাগ অধিক প্রশস্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ক্যানিয়ন, গিরিখাতেরই আরেকটি রূপ। যে সমস্ত শিলা দ্বারা উপত্যকা গঠিত হয় তার ধরন এবং গঠনের ওপর

উপত্যকার প্রকারভেদ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যানিয়নগুলো সম্ভবত অনুভূমিক পাললিক শিলা এবং গিরিখাত কঠিন শিলায় গঠিত হয়।

মন্থকূপ ও প্লাঞ্জপুল (Potholes and Plunge Pools) :

নদীর পার্বত্য প্রবাহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নদীগর্ভে সৃষ্ট প্রায় গোলাকার গর্তগুলোকে **মন্থকূপ** (potholes) বলে। একবার একটি ছোটো এবং অগভীর গর্ত তৈরি হবার পরে, কাঁকর ও পাথরগুলো এই গর্তগুলোতে একত্রিত হয়ে প্রবাহিত জল দ্বারা ঘূর্ণায়মান হয়। এর ফলে এই গর্তগুলোর আকার বৃদ্ধি পায়। অবশেষে এই ধরনের গর্তগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে নদী উপত্যকা গভীর হয়ে যায়। জলের কৃন্তন ও শিলাখণ্ডের ঘূর্ণনের দ্বারা জলপ্রপাতের পাদদেশেও একটি বেশ গভীর ও প্রশস্ত মন্থকূপ গঠিত হয়। জলপ্রপাতের পাদদেশে এরকম বড়ো এবং গভীর গর্তগুলোকে **প্লাঞ্জপুল** (Plunge Pool) বলা হয়। এই পুলগুলোও উপত্যকাকে গভীর করতে সাহায্য করে। জলপ্রপাতগুলোও অন্যান্য ভূমিরূপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয় যা ধীরে ধীরে পেছনে সরতে থাকে এবং জলপ্রপাতের উপরিতল ধীরে ধীরে অববাহিকার নিম্নতল বরাবর পর্যায়িত হতে থাকে।

কর্তিত নদীবাঁক (Incised or Entrenched Meanders):

খাড়া ঢালে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত নদীগুলোতে স্বভাবত নদীর তলদেশে ক্ষয়কার্যের প্রাধান্য দেখা যায়। খাড়া নদীঢালযুক্ত নদীগুলোতে পার্শ্বক্ষয় অধিক হয় না। কিন্তু নিম্ন ও মৃদু ঢালে প্রবাহিত নদীগুলোতে পার্শ্বক্ষয় অধিক হয়। সক্রিয় পার্শ্বক্ষয় বেশি হওয়ার কারণে, মৃদু ঢালে প্রবাহিত নদীগুলো সর্পিল বা আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যায়। প্লাবনভূমি ও ব-দ্বীপ সমভূমির উপর যেখানে নদীঢালগুলো খুব মৃদু হয়, সেখানে নদীর আঁকাবাকা গতিপথে প্রবাহিত হওয়া খুব সাধারণ বিষয়। কিন্তু কঠিন শিলাতেও গভীর কর্তিত ও প্রশস্ত নদীবাঁক দেখা যায়। এইরূপ নদী বাঁককে **কর্তিত নদীবাঁক** (incised or entrenched meanders) বলে (চিত্র 7.2)। নদী গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থায় প্রাথমিক মৃদু ঢালের উপর নদীবাঁকের লুপ (Loop) বিকশিত হয় এবং এই লুপগুলো শিলার গভীরতা পর্যন্ত প্রোথিত হয় যা প্রধানত নদীক্ষয় বা ভূমির ধীর এবং ক্রমাগত উত্থানের কারণে গঠিত হয়। সময়ের সাথে সাথে এগুলো আরও গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং কঠিন শিলাযুক্ত এলাকায় গভীর গিরিখাত ও ক্যানিয়নরূপে পাওয়া যায়। যে মূল ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদীগুলো গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে এগুলো ইঙ্গিত বহন করে।

কর্তিত নদীবাঁক, প্লাবনভূমিতে সৃষ্ট নদীবাঁক ও ব-দ্বীপ সমভূমিতে সৃষ্ট নদীবাঁকের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো কী কী?

নদীমঞ্চ (River Terraces) :

নদীমঞ্চ হল পুরাতন উপত্যকার তলদেশ বা প্লাবনভূমির স্তর চিহ্নিতকারী পৃষ্ঠভূমি। এগুলো পললস্তর বা পলল মঞ্চবিহীন আদি শিলাস্তর (bedrock) যেখানে নদী সঞ্চয় দেখা যায়। নদীমঞ্চগুলো মূলত ক্ষয়ীভূত ভূমিরূপ কারণ এই নদীগুলো নিজস্ব সঞ্চয়জাত প্লাবনভূমির উল্লম্ব ক্ষয়কার্য দ্বারা গঠিত হয়। বিভিন্ন উচ্চতার অধিক সংখ্যক নদীমঞ্চ থাকতে পারে, যা প্রারম্ভিক নদীবক্ষ স্তরকে নির্দেশ করে। নদীগুলোর উভয় পাশে সম উচ্চতাবিশিষ্ট নদীমঞ্চকে **যুগ্ম নদীমঞ্চ** (paired terraces) বলা হয় (চিত্র 7.3)।

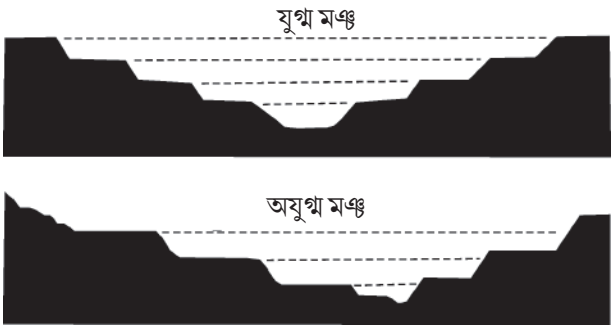

চিত্র 7.3 : যুগ্ম ও অযুগ্ম নদীমঞ্চ

যখন একটি মঞ্চ কেবল নদীর একপাশে উপস্থিত থাকে এবং অপরদিকে এটি অনুপস্থিত বা বিপরীত দিক এর উচ্চতা পূর্বপার্শ্ব অপেক্ষা একদম ভিন্ন হয়, তবে এইপ্রকার মঞ্চগুলোকে অযুগ্ম নদীমঞ্চ (unpaired terraces) বলা হয়। ভূমির ধীরগতি সম্পন্ন উত্তোলন এলাকায় বা যেখানে উভয় তটে জলস্তরের পরিবর্তনে অসংগতি থাকে, সেখানে অযুগ্ম নদীমঞ্চগুলো দেখা যায়। নদীমঞ্চগুলোর উৎপত্তির কারণগুলো হল — (i) শীর্ষপ্রবাহের পর জলপ্রবাহ হ্রাস পাওয়া; (ii) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জলচক্রের পরিবর্তন; (iii) ভূমির গাঠনিক উত্থান; (iv) যদি নদীসমূহ সমুদ্রের নিকট আসে, তবে সমুদ্রতলের পরিবর্তন ইত্যাদি।

নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Depositional Landforms) :

পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড বা পলল শঙ্কু (Alluvial Fans) :

নদী উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে যখন হঠাৎ সমভূমিতে নেমে আসে তখন পলল শঙ্কু গঠিত হয় (চিত্র 7.4)। সাধারণত পার্বত্য ঢালে প্রবাহিত নদীসমূহ ভারী এবং স্থূল আকারের বোঝা (load) বহন

করে। মৃদু ঢালের উপর নদীগুলো এই বোঝা বহন করতে অসমর্থ হওয়ায় এগুলো বিস্তৃত অঞ্চলে নিম্ন থেকে উচ্চ আকারের শঙ্কু রূপে সঞ্চিত হয়, এদের **পললশঙ্কু** (alluvial fan) বলে। পলল শঙ্কুর উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য এদের মূল প্রবাহে সীমাবদ্ধ না থেকে শঙ্কু বরাবর এদের প্রবাহপথের পরিবর্তন করে অনেকগুলো শাখা গঠন করে। এদের শাখানদী

চিত্র 7.4 : অমরনাথ, জম্মু ও কাশ্মীরের পথে একটি পাহাড়ি নদীপ্রবাহ দ্বারা সঞ্চিত পলল শঙ্কু।

(distributaries) বলা হয়। আর্দ্র অঞ্চলে পললশঙ্কু প্রধানত নিম্ন উচ্চতাবিশিষ্ট শঙ্কু তথা শীর্ষ থেকে পাদদেশ পর্যন্ত মৃদু ঢালযুক্ত হয়। শুষ্ক ও আর্দ্র-শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে এগুলো খাড়া ঢাল বিশিষ্ট উচ্চ শঙ্কু রূপে দেখা যায়।

ব-দ্বীপ (Deltas) :

ব-দ্বীপ পলল শঙ্কুর মতো হয় কিন্তু এগুলো বিকশিত হবার স্থান ভিন্ন প্রকৃতির হয়। নদী দ্বারা বাহিত পদার্থসমূহ মোহনায় অবক্ষেপিত

চিত্র 7.5 : কৃষ্ণা নদী (অন্ধ্রপ্রদেশ) ব-দ্বীপ অংশের উপগ্রহ থেকে নেওয়া একটি ছবি।

হয় এবং সেখানে বিস্তার লাভ করে। যদি এই পদার্থগুলো সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে বা সমুদ্র উপকূল বরাবর বণ্টিত না হয় তাহলে শঙ্কুগুলো বিস্তৃত ও নিম্ন উচ্চতা বিশিষ্ট হয়।

পলল শঙ্কু থেকে ভিন্ন, ব-দ্বীপ তৈরির জন্য সঞ্চিত পদার্থসমূহ সুস্পষ্ট স্তরবিশিষ্ট ও খুব ভালোভাবে সজ্জিত থাকে। স্থূল বা বড়ো পদার্থসমূহ প্রথমে থিতিয়ে পড়ে এবং সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ যথা-পলিমাটি, কাদামাটি প্রভৃতি সমুদ্র অব্দি বাহিত হয়। যেহেতু ব-দ্বীপের আকার বৃদ্ধি পায়, শাখানদীগুলোও দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে (চিত্র 7.5) এবং ব-দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে গড়ে ওঠতে থাকে।

প্লাবনভূমি, স্বাভাবিক বাঁধ এবং পয়েন্ট বার (Floodplains, Natural Levees and Point Bars) :

যে প্রকার ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকা সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার সঞ্চয়কার্যের ফলে প্লাবনভূমি গঠিত হয়। প্লাবনভূমি হল নদী সঞ্চয়ের একটি প্রধান ভূমিরূপ। যখন নদী খাড়া ঢাল থেকে মৃদু ঢালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন বড়ো আকারের পদার্থগুলো প্রথমে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে সাধারণত বালি, পলিমাটি, কাদামাটি ইত্যাদি সূক্ষ্ম আকারের উপকরণগুলো সমভূমিতে, অপেক্ষাকৃত মৃদু ঢালের উপর প্রবাহিত ধীরগতিসম্পন্ন জলধারার সাথে বাহিত হয় এবং নদীখাতে বন্যার সময় জলে বাহিত হয়ে নদীতটে এগুলো সঞ্চিত হয়। নদী সঞ্চয়ের দ্বারা গঠিত নদীবক্ষ হল একটি সক্রিয় প্লাবনভূমি। মূলত দুই প্রকার সঞ্চয়কার্যের দ্বারা নদীতটের উপর নিষ্ক্রিয় প্লাবনভূমি গঠিত হয় — (i) বন্যার দ্বারা সঞ্চয় এবং (ii) নদীপথে সঞ্চয়। সমভূমিতে, নদীপ্রণালী আড়াআড়িভাবে স্থানান্তরিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া নদীপথগুলো ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে এদের গতিপথ পরিবর্তন করে। পরিত্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন নদীপ্রণালী দ্বারা নির্মিত এই প্রকার প্লাবনভূমিতে স্থূল পদার্থের সঞ্চয় পরিলক্ষিত হয়। বন্যার দ্বারা বাহিত জল তুলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম উপকরণ যেমন - কাদামাটি ও পলিমাটি প্রভৃতি বহন করে। ব-দ্বীপে গঠিত প্লাবনভূমিকে **'ব-দ্বীপ সমভূমি'** (delta plains) বলে।

স্বাভাবিক বাঁধ (Natural levees) এবং **পয়েন্ট বার** (point bars) [চিত্র 7.6] হল প্লাবনভূমিতে গঠিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ। বড়ো নদীগুলোর তীরে প্রাকৃতিক বাঁধ দেখা যায়। এগুলো নদীতটে স্থূল পদার্থের রৈখিক, অনুচ্চ ও সমান্তরাল শৈলশিরা রূপে দেখা যায়, যা প্রায়শই পৃথক খণ্ডিত স্তূপ বিশেষ। বন্যার সময় যখন জল নদীতটের উপর ছড়িয়ে পড়ে, তখন জলের গতিবেগ কমে গিয়ে বড়ো আকারের পদার্থসমূহ নদীর পার্শ্ববর্তী তটে লম্বা শৈলশিরা রূপে সঞ্চিত হয়। প্রাকৃতিক বাঁধ নদীর কাছে উঁচু এবং নদী থেকে দূরে মৃদু ঢালযুক্ত হয়। নদীতটের নিকট প্রাকৃতিক বাঁধের উপর অবক্ষেপণ, নদী থেকে দূরবর্তী স্থানের অবক্ষেপণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থূল পদার্থের হয়ে থাকে। যখন নদীগুলো

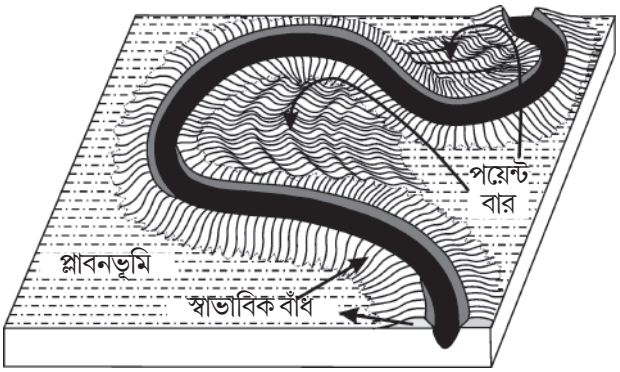

চিত্র 7.6 : স্বাভাবিক বাঁধ এবং পয়েন্ট বার

আড়াআড়িভাবে স্থানান্তরিত হয়, তখন ক্রমবদ্ধ প্রাকৃতিক বাঁধ গঠন করতে পারে।

পয়েন্ট বার, মিয়েন্ডার বার (meander bars) নামেও পরিচিত। এগুলো বড়ো নদী বাঁকের অবতল ঢালে দেখা যায় এবং প্রবাহিত জল দ্বারা বাহিত পলিসমূহ নদীতট বরাবর রৈখিকভাবে সঞ্চিত হয়। এগুলোর পরিলেখ (Profile) ও প্রস্থ প্রায় একসমান হয় এবং এর অবক্ষেপণ মিশ্র আকারবিশিষ্ট পলিসমূহ দ্বারা হয়ে থাকে। যদি এখানে একাধিক শৈলশিরা থাকে, তবে পয়েন্ট বারের মধ্যে সংকীর্ণ ও লম্বা গর্ত দেখা যায়। জলপ্রবাহ এবং পলল সরবরাহের ওপর নির্ভর করে নদীগুলো এদের একটি ক্রম তৈরি করে। যেহেতু নদীর অবতল ঢালে পয়েন্ট বার গঠিত হয়, তাই নদীর উত্তল ঢালে (convex side) অধিক ক্ষয়কার্য সাধিত হবে।

প্রাকৃতিক বাঁধ, পয়েন্ট বার থেকে কীভাবে ভিন্ন হয়?

নদীবাঁক (Meanders) :

বিস্তৃত প্লাবনভূমি ও ব-দ্বীপ সমভূমির উপর দিয়ে নদী খুব কমই সোজা পথে প্রবাহিত হয়। প্লাবনভূমি ও ব-দ্বীপ ভূমির উপর বিকশিত চুলের কাঁটার ন্যায় নদীপ্রণালীকে মিয়েন্ডার বলা হয় (চিত্র 7.7)।

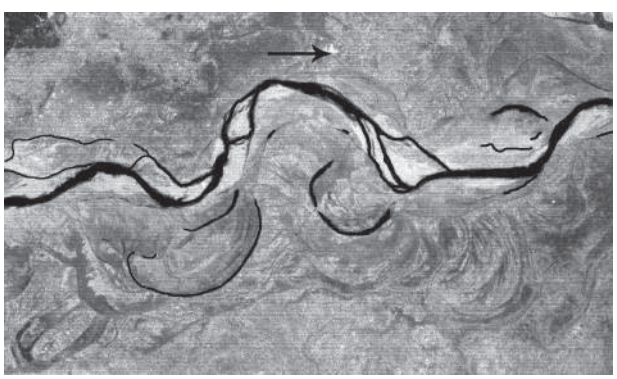

চিত্র 7.7 : মুজফফরপুর, বিহারের নিকটে বুরহি গণ্ডক নদীর নদীবাঁক প্রদর্শিত একটি উপগ্রহ চিত্র, যেখানে কয়েকটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও কাট-অফ (Cut-Off) দেখানো হয়েছে।

নদীবাঁক একটি ভূমিরূপ নয় কিন্তু এটি একপ্রকার নদীপ্রণালী মাত্র। এর কারণগুলো হল — (i) মৃদু ঢালে প্রবাহিত নদীর জলে পার্শ্বক্ষয় এবং নিম্নক্ষয়ের প্রবণতা; (ii) নদীতটের উপর পলিসমূহের অনিয়মিত ও অসংগঠিত সঞ্চয়, যার দ্বারা জলের চাপ বৃদ্ধির ফলে নদীর প্রশস্তিকরণ; (iii) কোরিওলিস বল দ্বারা প্রবাহিত জলের পরিবর্তন, ঠিক যেমন কোরিওলিস বল দ্বারা বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন হয়। যখন নদীঢাল অত্যন্ত মৃদু হয়ে যায়, তখন নদীর জল ধীরগতিতে প্রবাহিত হয় এবং আড়াআড়িভাবে কাজ শুরু করে। নদীতটে সামান্য অনিয়মিততাও ধীরে ধীরে একটি ছোটো বক্ররেখায় রূপান্তরিত হয়। এগুলো অভ্যন্তরভাগে সঞ্চয়কার্যের ফলে গভীর হতে থাকে এবং বহির্ভাগে নদীতট বরাবর ক্ষয়কার্যের ফলে গভীর হতে থাকে এবং বহির্ভাগে নদীতট বরাবর ক্ষয়কার্য করে। যদি কোনো অবক্ষেপণ এবং ক্ষয়ীভবন বা নিম্নক্ষয় (undercutting) না হয়, তবে নদীবাঁকের প্রবণতাও হ্রাস পায়। সাধারণত, বড়ো নদীবাঁকে অবতল তীর বরাবর সক্রিয় অবক্ষেপণ হয় এবং উত্তল তীর বরাবর নিম্নক্ষয় হয়। অবতল তীরটি কর্তিত তীর (cut-off bank) নামে পরিচিত, যা খাড়া ঢালযুক্ত এবং উত্তল ঢালটি একটি দীর্ঘ, মৃদু পার্শ্বচিত্র উপস্থাপন করছে (চিত্র 7.8)। নদীবাঁক গভীর লুপে বিকশিত হবার কারণে অভ্যন্তরীণ ভাগ

চিত্র 7.8 : নদীবাঁকের বৃদ্ধি, কর্তিত লুপ, স্কন্ধঢাল এবং নিম্নকর্তিত তীর

ক্ষয়ীভবনের ফলে কর্তিত হয় এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (ox-bow lakes) সৃষ্টি করে।

বিনুনীরূপী নদীপ্রণালী (Braided Channels) :

যখন নদীগুলো স্থূলপদার্থ বহন করে, তখন স্থূল উপকরণসমূহ সঞ্চিত হয়ে মধ্য দ্বীপ গঠন করে এবং এর ফলে নদীপ্রবাহ নদীতট বরাবর বিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রবাহ নদীতটে পার্শ্বক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। উপত্যকাগুলোর গভীরতা বৃদ্ধি পাবার ফলে জলপ্রবাহ কমে যায় এবং প্রবাহিত পদার্থসমূহ অধিকমাত্রায় ব-দ্বীপ ও পার্শ্বীয় দ্বীপ রূপে সঞ্চিত হয় তথা মূল জলধারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বিনুনীরূপী নদীপ্রণালী গঠনে অবক্ষেপণ ও পার্শ্বক্ষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথবা বিকল্পভাবে, যখন উপত্যকায় জলের মাত্রা কমে যায় এবং প্রবাহিত বোঝা অধিক হয়, তখন নদীতলে নদীদ্বীপ ও বালি, নুড়ি, কাঁকর ইত্যাদি মিশ্রিত ব-দ্বীপ গঠিত হয় এবং জলপ্রবাহ বিভিন্ন সুতার ন্যায় অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এইসব সুতার ন্যায় ক্ষুদ্র নদীগুলো একে অপরের সাথে মিলিত হয় এবং পুনরায় ছোটো ছোটো উপধারায় বিভক্ত হয়। এইভাবে একটি বিনুনীরূপী নদীপ্রণালীর বিকাশ ঘটে (চিত্র 7.9)।

ভৌমজল (Groundwater) :

এখানে সম্পদের অংশরূপে ভৌমজলের কথা বলা হয়নি। ভূপ্রকৃতির ক্ষয়ীভবনে ভৌমজলের প্রভাব এবং ভূমিরূপের বিবর্তনে এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল মুখ্য উদ্দেশ্য। শিলাগুলো প্রবেশ্য, পাতলা

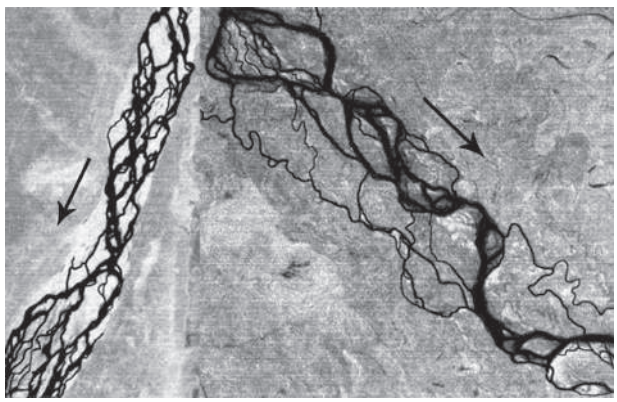

চিত্র 7.9 : গণ্ডক নদী (ডানে) এবং শোণ নদীর (বামে) বিনুনীরূপী নদীপ্রণালীর অংশবিশেষ দর্শিত উপগ্রহ চিত্র, তীর চিহ্নটি নদীপ্রবাহের দিকটি চিহ্নিত করছে।

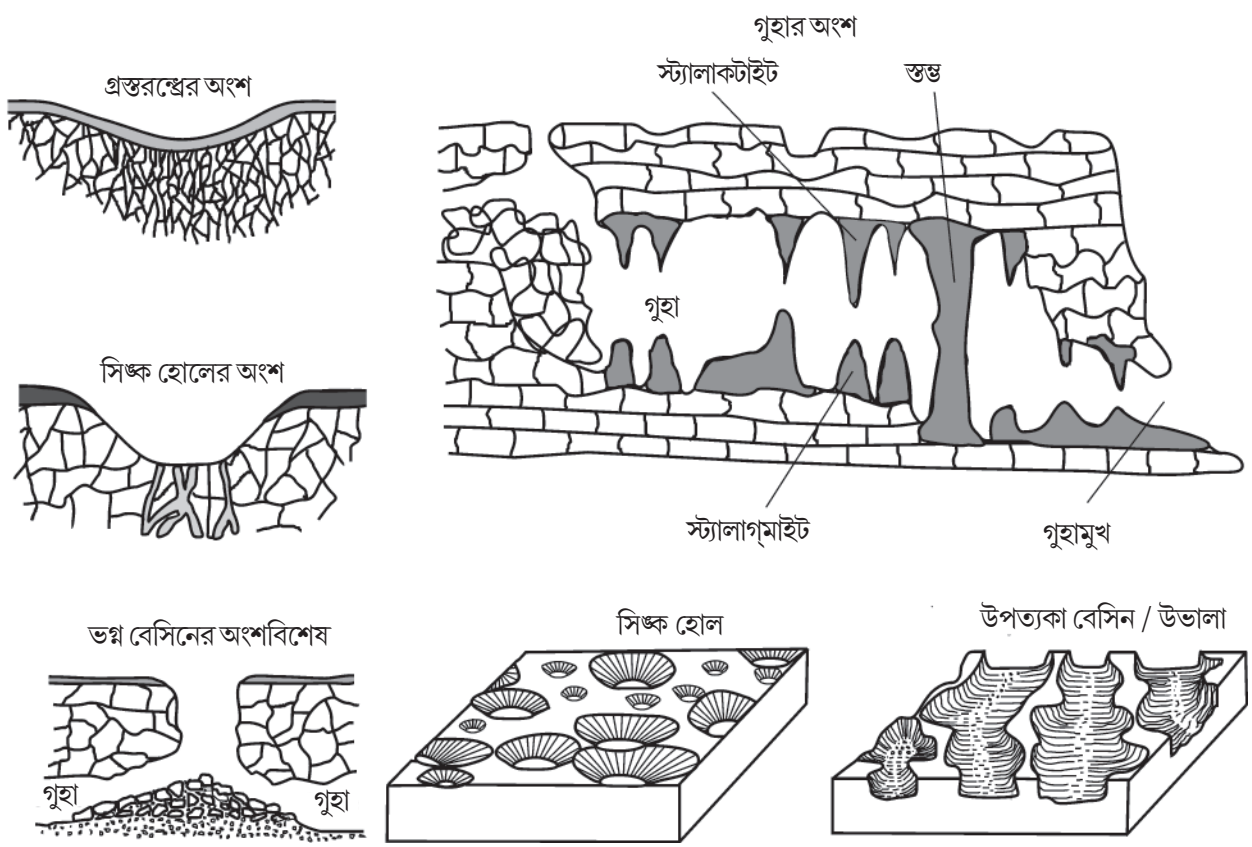

চিত্র 7.10 : বিভিন্ন কার্স্ট ভূমিরূপসমূহ

স্তরবিশিষ্ট, অত্যধিক দারণ ও ফাটলযুক্ত হলে ভৌমজল ভালোভাবে পরিস্রুত হয়। উল্লম্বভাবে কিছু গভীরে যাওয়ার পর, ভূগর্ভে জলরাশি অনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয় এবং এটি নিম্নে স্তরায়ণতল, সংযোগস্থল বা পদার্থসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। জলের এই নিম্নমুখী এবং অনুভূমিক প্রবাহই হল শিলার ক্ষয়ীভবনের কারণ। ভৌমজল দ্বারা বাহিত প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পদার্থসমূহের অপসরণ, ভূমিরূপ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই কারণে, ভৌমজলের ক্ষয়কার্যের ফলাফল সকল প্রকার শিলার মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু কিছু শিলা যেমন - চুনাপাথর (limestones) বা ডোলোমাইট (dolomites), যা ক্যালশিয়াম কার্বনেটে সমৃদ্ধ প্রভৃতি ভৌমজলের রাসায়নিক প্রক্রিয়া (দ্রবণ এবং বৃষ্টিপাত) দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে ভূমিরূপকে বিকশিত করে। এই দুইটি প্রক্রিয়া যেমন - দ্রবণ এবং বৃষ্টিপাত - হয়তো চুনাপাথর বা ডোলোমাইট পাথরের সাথে আলাদাভাবে বা অন্য পাথরের সাথে যুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে কার্য করে। কোনো চুনাপাথর বা ডোলোমাইট যুক্ত অঞ্চলে ভৌমজল দ্বারা দ্রবণ প্রক্রিয়া ও এর অবক্ষেপণ প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত ভূমিরূপকে **কার্স্ট ভূমিরূপ** (Karst topography) বলা হয়। এড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic Sea) এর কাছে বালকন (Balkan) কার্স্ট অঞ্চলের চুনাপাথর শিলায় এই ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়।

কার্স্ট ভূমিরূপটিও ক্ষয়জাত এবং সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Erosional Landforms) :

পুল (Pools), সিঙ্ক হোল (Sinkholes), লেপিস (Lapies) এবং চুনাপাথরের মেঝে (Limestone Pavements) :

চুনাপাথর অঞ্চলে দ্রবণ কার্যের ফলে অসংখ্য ছোটো থেকে মাঝারি আকারের বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার অগভীর গর্ত বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্ষুদ্র গর্ত বা ছিদ্রগুলোকে সোয়ালো হোল (swallow holes) বলা হয়। সিঙ্ক হোল কার্স্ট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিঙ্ক হোল হল এক প্রকারের ছিদ্র বা গর্ত যা উপরে বৃত্তাকার ও নীচে ফানেল আকৃতির হয় এবং এর আয়তন কয়েক বর্গমিটার থেকে হেক্টর পর্যন্ত ও গভীরতা অর্ধেক মিটার থেকে 30 মিটার বা এর অধিক হয়। এর মধ্যে কিছু ধীর দ্রবণ প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় এবং কিছু অন্য দ্রুত দ্রবণ প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত হতে পারে। যদি এই সিঙ্ক হোলের নীচে গঠিত গুহার আচ্ছাদন ধসে পড়ে, তবে এগুলো **ধস সিঙ্ক** (collapse sinks) নামে পরিচিত হয়। বেশির ভাগ সিঙ্ক হোল উপরিভাগে ক্ষয়জাত পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে এবং অগভীর জলাশয়রূপে দেখা যায়। কেউ এইরূপ জলাশয়গুলোর উপর পা দিলে, মরুভূমিতে অবস্থিত চোরাবালির ন্যায় ডুবে যেতে পারে। কখনও ধস সিঙ্ক বোঝাতে 'ডোলাইন' (dolines) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। ধস সিঙ্ক অপেক্ষা দ্রবণ সিঙ্ক অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। প্রায়শই ভূ-পৃষ্ঠের প্রবাহিত জল সিঙ্ক হোল দিয়ে বাহিত হয়ে ভূগর্ভস্থ নদীরূপে বিলীন হয়ে যায় এবং কিছু দূরবর্তী প্রান্তে কোনো গুহায় ভূমিগত নদীরূপে পুনরায় আবির্ভূত হয়। যখন সিঙ্ক হোল এবং ডোলাইনগুলো, তীর বরাবর পদার্থসমূহের স্খলন দ্বারা বা গুহার আচ্ছাদন ধসে যাবার কারণে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তখন লম্বা, সংকীর্ণ তথা বিস্তৃত ঘাতের (trenches) সৃষ্টি হয়, এদের **উপত্যকা সিঙ্ক** (valley sinks) **বা উভালা** (Uvalas) বলা হয়। ধীরে ধীরে, চুনাপাথর পৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশই এই গর্ত বা খাতের দখলে চলে যায়, এবং পুরো স্থানে অত্যধিক অনিয়মিত, সরু শৈলশিরা দেখা যায়, এদের **লেপিস** (lapies) বলা হয়। এইসব শৈলশিরা বা লেপিসগুলো, সমান্তরাল বা উপ-সমান্তরাল সংযোগস্থল বরাবর বিভিন্ন দ্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা গড়ে উঠে। কখনো-কখনো লেপিস-এর এই বিস্তৃত ক্ষেত্র সমতল চুনাপাথরের মেঝেতে (limestone pavements) পরিবর্তিত হয়ে যায়।

গহ্বর (Caves) :

যে সকল অঞ্চলে শিলা পর্যায়ক্রমিক স্তরবিশিষ্ট (শেল, বালুপাথর, কোয়ার্টজাইট) বা মধ্যভাগ চুনাপাথর ও ডোলোমাইট দ্বারা গঠিত হয় বা যেখানে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে চুনাপাথরের স্তর দেখা যায়, সেখানে চুনাপাথর গহ্বর সৃষ্টির প্রবণতা বেশি। ফাটল ও দারণের মধ্য দিয়ে জল পরিস্রুত হয়ে অনুভূমিকভাবে স্তরায়ণ তলে পৌঁছায়। এই স্তরায়ণ তলে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে লম্বা, সংকীর্ণ ও বিস্তৃত ফাঁকা অংশের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় ভূমিরূপকে **গহ্বর** (Caves) বলা হয়। কখনো-কখনো বিভিন্ন স্তরে গহ্বর একটি জালিকা সৃষ্টি করে, যা চুনাপাথরের স্তর এবং এর মধ্যস্থিত শিলার ওপর নির্ভর করে। গহ্বর সাধারণত ছিদ্রযুক্ত থাকে যার মাধ্যমে গহ্বর প্রবাহ বাইরে নির্গত হয়। উভয়প্রান্ত উন্মুক্ত গহ্বরকে **টানেল** (tunnels) বলা হয়।

সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Depositional Landforms) :

অধিকতর অবক্ষেপিত ভূমিরূপ চুনাপাথরের গহ্বরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। চুনাপাথরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হল ক্যালশিয়াম কার্বনেট, যা কার্বনযুক্ত জলে (বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড) সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়। যখন দ্রবণে বাহিত জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় এর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নির্গত করে যা অমসৃণ শিলা পৃষ্ঠতলের ওপর দিয়ে সংকীর্ণ পথে নির্গমন ঘটে তখন এই ক্যালশিয়াম কার্বনেট অবক্ষেপিত হয়।

স্ট্যালাক্টাইট (Stalactites), স্ট্যালাগ্মাইট (Stalagmites) এবং স্তম্ভ (Pillars) :

স্ট্যালাক্টাইট হল বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত হিমস্তম্ভ (icicles) যা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এগুলো সাধারণত ভিত্তিস্থলে প্রশস্ত থাকে এবং অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হতে থাকে ও বিভিন্ন আকৃতির হয়। **স্ট্যালাগ্মাইট** গহ্বরের মেঝে থেকে উপরের দিকে বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, স্ট্যালাগ্মাইট গহ্বরের ছাদ থেকে পৃষ্ঠের উপর চুঁইয়ে পড়া চুনামিশ্রিত জল থেকে গঠিত হয় বা সরু নলের মধ্যে দিয়ে চুনমিশ্রিত জল পতিত হয়ে স্ট্যালাক্টাইট গঠন করে (চিত্র 7.11)।

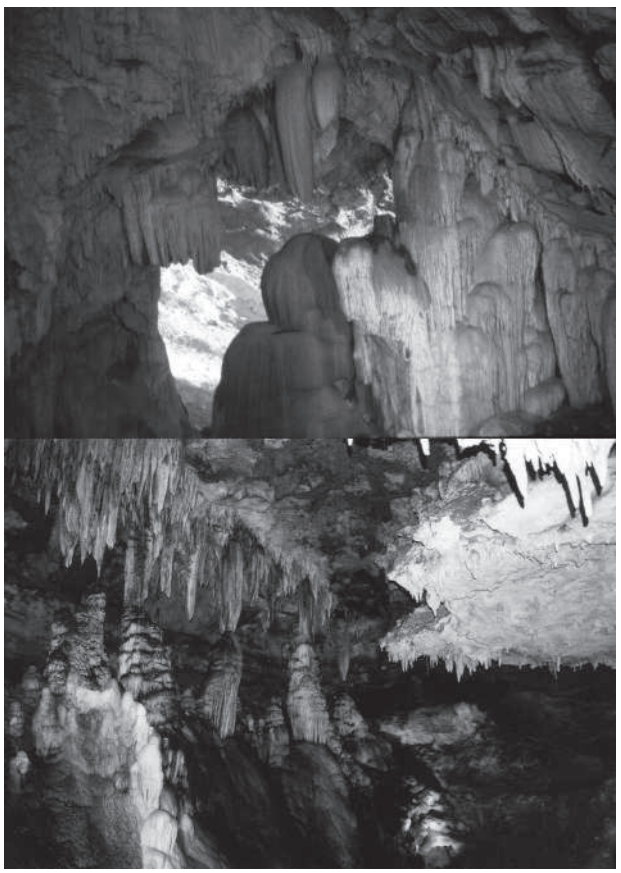

চিত্র 7.11 : চুনাপাথর গহ্বরস্থ স্ট্যালাক্টাইট এবং স্ট্যালাগ্মাইট

স্ট্যালাগ্মাইট হল একটি স্তম্ভ যা একটি চ্যাপ্টা চাকতির আকারে বা সমতল অথবা ক্রেটর (crater)-এর ন্যায় গর্তের আকারে বিকশিত হতে পারে। স্ট্যালাগ্মাইট এবং স্ট্যালাক্টাইটগুলো অবশেষে একত্রে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত থাম (columns) ও স্তম্ভ (pillars) গঠন করে।

হিমবাহ (Glaciers) :

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে চাদরের ন্যায় হিমপ্রবাহ (মহাদেশীয় হিমবাহ বা পর্বতের পাদদেশীয় হিমবাহ বিশাল বরফের স্তূপরূপে যখন পর্বতের পাদদেশের সমভূমির উপর ছড়িয়ে পড়ে) অথবা বিস্তৃত খাতের ন্যায় উপত্যকায় পর্বতের পাদদেশে রৈখিক হিমপ্রবাহকে (পার্বত্য এবং উপত্যকা হিমবাহ) **হিমবাহ** বলা হয় (চিত্র 7.12)। হিমবাহের প্রবাহ, জলপ্রবাহের বিপরীতে ধীরগতিসম্পন্ন হয়।

চিত্র 7.12 : উপত্যকা মধ্যস্থিত একটি হিমবাহ

হিমপ্রবাহ প্রতিদিন কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার বা এর কম বা বেশি প্রবাহিত হতে পারে। প্রধানত হিমপ্রবাহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে হয়ে থাকে।

> আমাদের দেশে অনেক হিমবাহ আছে, যা হিমালয় পর্বতের ঢাল বরাবর ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। উত্তরাঞ্চল, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু কিছু উচ্চ স্থানে এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি জান যে, ভাগীরথী নদীর উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহের অগ্রভাগ (গোমুখ) থেকে, বস্তুত, অলকানন্দা নদীর উৎপত্তি অলকাপুরী হিমবাহ থেকে। দেবপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দা এবং ভাগীরথী নদীর মিলিত প্রবাহ গঙ্গা নদী নামে পরিচিত।

বরফস্তূপের ভারে উৎপন্ন ঘর্ষণের ফলে হিমবাহের দ্বারা প্রবল ক্ষয়ীভবন হয়। উপত্যকার তলদেশের পদার্থসমূহ (সাধারণত বড়ো আকৃতির কৌণিক ব্লক ও শৈলখণ্ড) হিমবাহ দ্বারা উৎপাটিত হয়ে নিম্নে অপসারিত হয়। ফলে উপত্যকার পার্শ্বে অবঘর্ষ এবং উৎপাটন দ্বারা অত্যধিক ক্ষয়কার্য সাধিত হয়। হিমবাহ আবহবিকারবিহীন শিলার ওপরও ব্যাপক ক্ষয়কার্য করতে পারে এবং উচ্চ পর্বতগুলোকে ছোটো পর্বত ও সমভূমিতে পরিবর্তিত করতে পারে।

হিমবাহের ক্রমাগত সঞ্চালনের ফলে ডেব্রিস বা অবশিষ্টাংশ অপসারিত হয়, বিভাজিকার উচ্চতা হ্রাস পায় এবং সময়ের সাথে সাথে ঢাল এতটাই কমে যায় যে, হিমবাহের সঞ্চালন শক্তিও হ্রাস পায় এবং নিম্ন পর্বত ও অন্যান্য সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সহ বিস্তীর্ণ বিধৌত সমভূমি (outwash plains) গঠিত হয়। 7.13 নং এবং 7.14 নং চিত্রে হিমবাহের ক্ষয়জাত এবং সঞ্চয়জাত বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখানো হয়েছে। এর বর্ণনা পাঠ্যের পরবর্তী অংশে করা হয়েছে।

ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Erosional Landforms) :

সার্ক (Cirque) :

বরফাবৃত পার্বত্যাঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্য দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপের মধ্যে সার্ক বা করি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ সার্ক হিমবাহিত উপত্যকার চূড়ায় দেখা যায়। পুঞ্জীভূত বরফ পার্বত্য চূড়া থেকে নিম্নে প্রবাহিত হবার সময় এই সার্কগুলোকে কর্তিত করে গভীর, দীর্ঘ এবং প্রশস্ত খাত বা বেসিন গঠন করে যেগুলোর একদিক খুব খাড়া ঢালযুক্ত প্রস্তর প্রাচীরবিশিষ্ট হয় এবং অন্যদিক উন্মুক্ত থাকে। হিমবাহ অন্তর্হিত হবার পর প্রায়শই সার্কগুলোর অভ্যন্তর ভাগে জলপূর্ণ হ্রদ দেখা যেতে পারে। এইরূপ হ্রদগুলোকে **সার্ক** (Cirque) **বা টার্ন হ্রদ** (tarn lakes) বলা হয়। পরস্পরের সাথে মিলিত দুই বা ততোধিক সার্ক ক্রমান্বয়ে সোপানযুক্ত হতে পারে।

হর্ণ (Horns) এবং সেরেটেড শৈলশিরা (Serrated Ridges) :

সার্ক প্রাচীরের শীর্ষে ক্ষয়কার্যের ফলে হর্ণ (Horns) গঠিত হয়। যখন তিন বা ততোধিক সার্ক মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিকীর্ণিত হিমবাহ (radiating glaciers) শীর্ষদেশে ক্ষয়কার্য চালিয়ে যায়, তখন একটি উচ্চ, তীক্ষ্ণ এবং খাড়া পার্শ্বযুক্ত শিখরের সৃষ্টি হয়, একে **হর্ণ** (Horns) বলা হয়। সার্কের পার্শ্ব প্রাচীর বা শীর্ষ প্রাচীরের মধ্যে বিভাজিকা ক্রমাগত ক্ষয়কার্যের ফলে সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এর মধ্যবর্তী উচ্চ খাড়া অংশ করাতের দাঁতের মতো দেখতে হয়, একে **এরিটি** (arêtes) বলে। এর শীর্ষভাগ খুব তীক্ষ্ণ এবং বহিঃ প্রান্ত আঁকাবাঁকা হয়।

> প্রকৃতপক্ষে আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মেটর হর্ণ এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট হল হর্ণ, যেগুলো বিকীর্ণিত সার্কের শীর্ষ ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত।

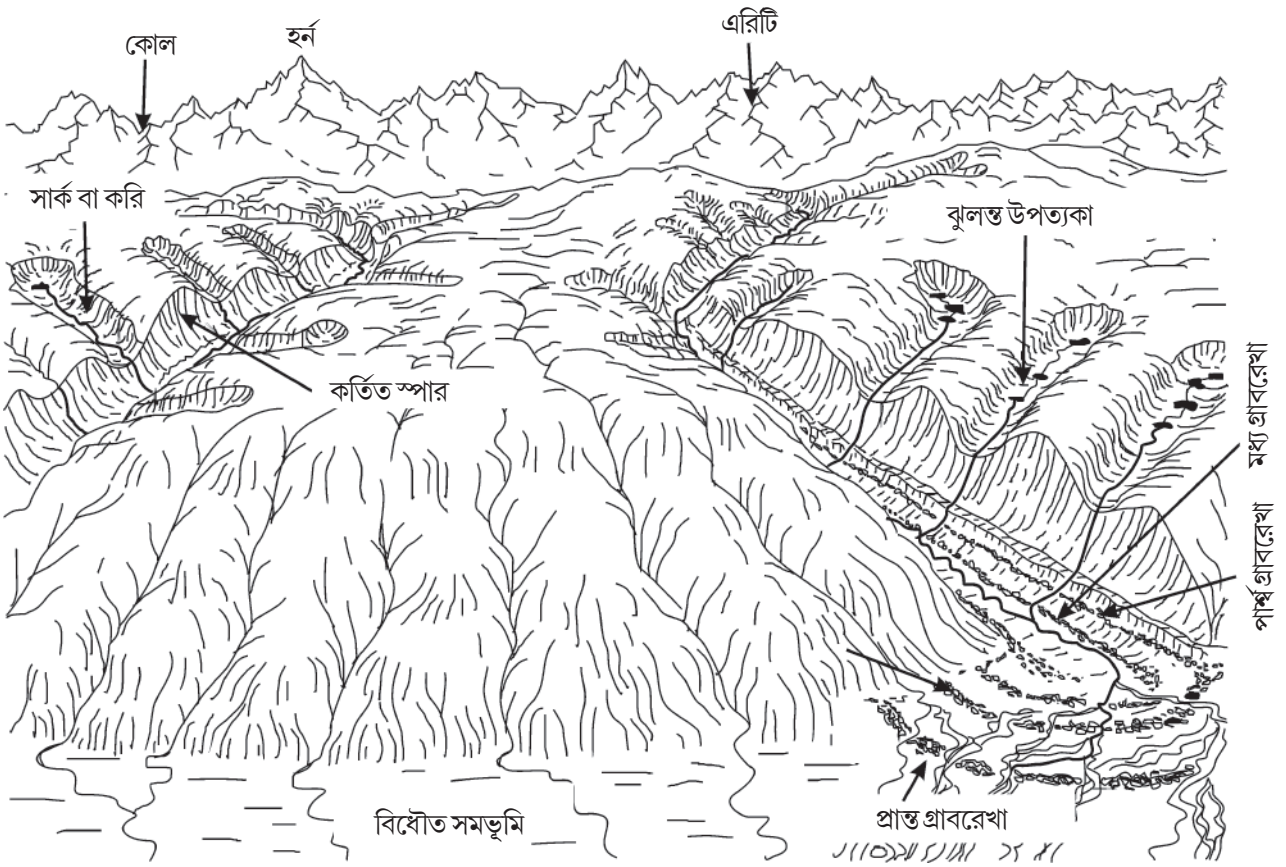

চিত্র **7.13 : হিমবাহ সৃষ্ট ক্ষয়জাত এবং সঞ্চয়জাত বিভিন্ন ভূমিরূপ (স্পেন্সর, 1962 সালে গৃহীত ও সংশোধিত)**

হিমবাহ উপত্যকা / খাত (Glacial Valleys/Troughs) :

হিমবাহজনিত উপত্যকাগুলো হল খাতের ন্যায় এবং বিস্তৃত তলবিশিষ্ট। এটি অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও খাড়া পার্শ্বযুক্ত ইংরেজি অক্ষর 'U-আকৃতির' ন্যায় দেখতে হয়। উপত্যকায় ডেব্রিস বা ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে বা ডেব্রিস আকৃতির গ্রাবরেখায় কখনো-কখনো জলাভূমি দেখা যায়। এই হ্রদসমূহ পার্বত্যাঞ্চলে পাথুরে তলদেশের উৎপাটন দ্বারা বা উপত্যকায় ডেব্রিস দ্বারা গঠিত হয়। ঝুলন্ত উপত্যকা প্রধান হিমবাহ উপত্যকার এক বা উভয় পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় থাকতে পারে। এই ঝুলন্ত উপত্যকাসমূহের তল প্রধান হিমবাহ উপত্যকায় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এর বিভাজিকা বা অভিক্ষিপ্তাংশ (Spur) কর্তিত হবার ফলে এগুলো ত্রিকোণবিশিষ্ট হয়। খুব গভীর হিমবাহ খাত (glacial troughs) সমুদ্রের জলে ভরাট হয়ে যায় এবং এগুলো সামুদ্রিক তটরেখা (উচ্চ অক্ষাংশে) তৈরি করে, এদেরকে **ফিয়োর্ড** (fiords) বলা হয়।

হিমবাহজনিত উপত্যকা এবং নদী উপত্যকাগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কী কী?

সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ (Depositional Landforms) :

গলিত হিমবাহ দ্বারা মিশ্রিত ভারি ও সূক্ষ্ম ভগ্নাংশসমূহের অবক্ষেপণকে **হিমবাহ টিল** (glacial till) বলা হয়। এইরূপ সঞ্চয়ে বেশিরভাগ পাথরের টুকরো কৌণিক বা উপ-কৌণিক আকারের হয়। হিমবাহের নীচে, পার্শ্বে বা নীচের প্রান্তে বরফ গলনের ফলে ক্ষুদ্র নদী গঠিত হয়। গলিত জলপ্রবাহ দ্বারা বহনযোগ্য ছোটো পাথরের ভগ্নাবশেষ বা ডেব্রিস নদীতে প্রবাহিত হয় এবং সঞ্চিত হয়। এইরূপ হিমবাহ নদী সঞ্চয়কে **আউটওয়াশ সঞ্চয়** বলা হয়। টিল অবক্ষেপণ ভিন্ন, আউটওয়াশ সঞ্চয় প্রায় স্তরীভূত এবং বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। আউটওয়াশ সঞ্চয়ের মধ্যে শিলাখণ্ডের প্রান্তভাগ কিছুটা গোলাকার প্রকৃতির হয়। চিত্র 7.14, সাধারণত হিমবাহ অঞ্চলের কিছু সঞ্চয়জাত ভূমিরূপকে প্রদর্শিত করছে।

গ্রাবরেখা (Moraines) :

গ্রাবরেখা হল হিমবাহ টিলের সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত দীর্ঘ শৈলশিরা। হিমবাহের শেষপ্রান্তে সঞ্চিত ডেব্রিসের দীর্ঘ শৈলশিরাকে **প্রান্ত গ্রাবরেখা** (Terminal moraine) বলে। পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral moraine) হিমবাহ উপত্যকার পার্শ্বে সমান্তরালভাবে গঠিত হয়। পার্শ্ব গ্রাবরেখা প্রান্ত গ্রাবরেখার সাথে মিলিত হয়ে ঘোড়ার খুরের ন্যায় বা অর্ধচন্দ্রাকৃতির শৈলশিরা গঠন করে (চিত্র 7.13)। একটি হিমবাহ উপত্যকার উভয় পার্শ্বে অধিক মাত্রায় পার্শ্ব গ্রাবরেখা পাওয়া যায়। এই গ্রাবরেখাগুলোর উৎপত্তি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে হিমবাহ নদীবাহিত জল দ্বারা হয়ে থাকে, যা এই পদার্থসমূহকে হিমবাহের পাশে ঠেলে দেয়। অনেক উপত্যকা হিমবাহের দ্রুত পশ্চাদপসরণের সময় অসমতল টিলের পাত উপত্যকার তলদেশে ফেলে যায়। ভূমিভাগে এইরূপ ভিন্ন ঘনত্বযুক্ত সঞ্চয়কে **ভূমি গ্রাবরেখা** (ground moraine) বলা হয়।

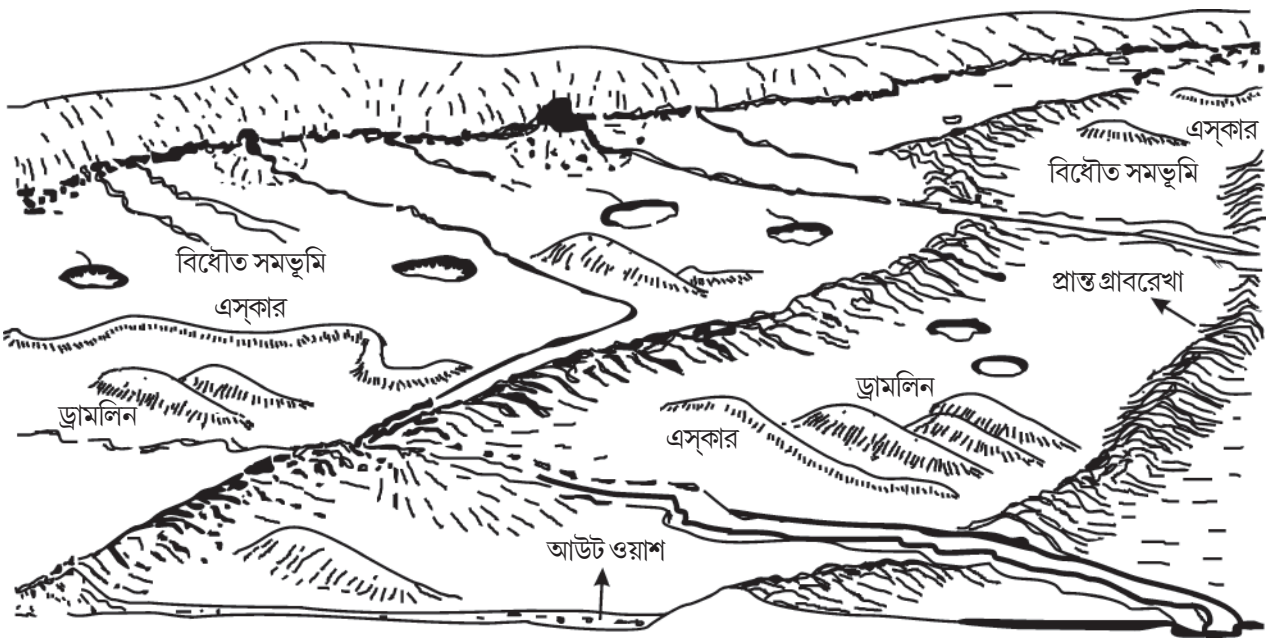

চিত্র 7.14 : হিমবাহ ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের একটি দৃশ্য (স্পেন্সর, 1962 সালে গৃহীত ও সংশোধিত)

দুইদিক থেকে দুইটি হিমবাহ এসে পরস্পর সন্নিহিত পার্শ্ব গ্রাবরেখায় মিলিত হলে, একে **মধ্য গ্রাবরেখা** (medial moraine) বলা হয়। এগুলো পার্শ্ব গ্রাবরেখা অপেক্ষা অসম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। কখনো-কখনো ভূমি গ্রাবরেখা থেকে মধ্য গ্রাবরেখা অবিভেদ্য (indistinguishable) হয়।

এস্‌কার (Eskers) :

গ্রীষ্মকালে বরফ গলে যাবার পর জল বরফের পৃষ্ঠ বরাবর প্রবাহিত হয় অথবা পার্শ্ব বরাবর চুঁইয়ে পড়ে বা বরফের গর্ত দিয়ে নীচে প্রবাহিত হয়। এই জল হিমবাহের নীচে একত্রিত হয়ে বরফের নীচে নদী প্রবাহের ন্যায় বাহিত হয়। এরূপ নদীগুলো প্রধানত ভূমিভাগের (উপত্যকা নয়, ভূমিভাগের ওপর কর্তন করে) ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং নদী তীরে বরফ সঞ্চিত হতে দেখা যায়। হিমবাহ বাহিত প্রস্তর, কংকর, বালুকা প্রভৃতি বরফ গলিত জলধারার মাধ্যমে যে সকল অঞ্চলে সঞ্চিত হয়, তথা প্রস্তরখণ্ড ও বালুকার দ্বারা গঠিত আঁকাবাঁকা শৈলশিরা (sinuous ridges) গঠিত হতে দেখা যায়, তাকে **এস্‌কার** (esker) বলা হয়।

বিধৌত বা আউটওয়াশ সমভূমি (Outwash Plains) :

হিমবাহের প্রান্তদেশে বরফ গলে যে নদীর সৃষ্টি হয় তা সাধারণত প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ থাকে। বরফের প্রান্তদেশের নিকটে বৃহদাকৃতির প্রস্তর খণ্ড বা প্রান্তদেশ থেকে দূরে সূক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে থাকে, এদের **আউটওয়াশ বা বিধৌত সমভূমি** (Outwash Plain) বলে।

> নদী পলল সমভূমি এবং হিমবাহ বিধৌত সমভূমির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

ড্রামলিন (Drumlins) :

ড্রামলিন হল মসৃণ ডিম্বাকৃতির শৈলশিরার মতো, যা প্রধানত নুড়ি, কাঁকর, বালিকণা মিশ্রিত হিমবাহ টিল দ্বারা গঠিত। ড্রামলিনের লম্বা অক্ষগুলো বরফের গতিপ্রবাহের দিকের সমান্তরাল। এগুলো দৈর্ঘ্যে 1 কিলোমিটার এবং উচ্চতায় 30 মিটার বা তারও বেশি হতে পারে। হিমবাহের মুখোমুখি ড্রামলিনের একটি প্রান্তকে স্টোস (stoss) বলা হয়, যা টেল (tail) নামক অন্য প্রান্তের তুলনায় তীব্র ঢালযুক্ত হয়। হিমবাহের ফাটলের মধ্য দিয়ে ভারী বরফের বোঝার নীচে শিলার ডেব্রিস জমা হবার ফলে ড্রামলিন গঠিত হয়। এর অগ্রভাগের প্রবাহিত বরফের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায়। ড্রামলিন হিমবাহ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে।

> টিল এবং পললের মধ্যে পার্থক্য কী?

সমুদ্র তরঙ্গ এবং স্রোত (Waves and Currents)

উপকূলীয় প্রক্রিয়াগুলো সর্বাধিক ক্রিয়াশীল এবং এই কারণে এগুলো অত্যধিক বিধ্বংসীও হয়। তাই, তোমরা কি মনে কর না যে, উপকূলীয় প্রক্রিয়াসমূহ এবং এর দ্বারা নির্মিত ভূমিরূপগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

উপকূল বরাবর কিছু পরিবর্তন খুব দ্রুত সংঘটিত হয়। একই জায়গায় একটি ঋতুতে ক্ষয় এবং অপর আরেকটি ঋতুতে সঞ্চয় হতে পারে। উপকূল বরাবর অধিকাংশ পরিবর্তন তরঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যখন তরঙ্গ ভেঙে যায়, তখন জল সমুদ্র তটভূমির উপর সজোরে আছড়ে পড়ে এবং পাশাপাশি সমুদ্রের তলদেশে পললসমূহের একটি বিশাল মন্থন (churning) শুরু হয়। অবিরাম তরঙ্গ ভাঙনের প্রভাব ব্যাপকভাবে সমুদ্রকে প্রভাবিত করে। সাধারণ তরঙ্গের আঘাত অপেক্ষা তরঙ্গ ঝড় ও সুনামি অল্প সময়ের ব্যবধানে অধিক পরিবর্তন ঘটায়। তরঙ্গের পরিবেশগত পরিবর্তনে তরঙ্গ ভাঙনের ফলে সৃষ্ট শক্তির তীব্রতাও পরিবর্তিত হয়।

> তোমরা কি তরঙ্গ এবং স্রোত সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো সম্পর্কে জান? যদি না জেনে থাক, তবে মহাসাগরীয় জলের সঞ্চালন বিষয়ক অধ্যায়টি পড়ো।

তরঙ্গের কার্য ছাড়া, উপকূলীয় ভূমিরূপগুলো অন্য কিছু কারণের উপরও নির্ভরশীল। এগুলো হল : (i) স্থল এবং সমুদ্রতলের রূপরেখা (ii) উপকূলের সমুদ্রোন্মুখী অগ্রসর বা স্থলাভিমুখী পশ্চাদপসারণ। সমুদ্রতলকে ধ্রুবক হিসাবে ধরে, উপকূলীয় ভূমিরূপ বিবর্তনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপকূলকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়: (ক) উচ্চ, পাথুরে উপকূল (নিমজ্জিত তট) (খ) নিম্ন, সমতল এবং মৃদু ঢালযুক্ত পলল উপকূল (উত্থিত উপকূল)

উচ্চ পাথুরে উপকূল (High Rocky Coasts) :

উচ্চ পাথুরে উপকূল বরাবর, আবির্ভূত নদীগুলো অনিয়মিত উপকূলরেখা নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে বলে মনে করা হয়। তটরেখার অত্যধিক অবনমণের ফলে পার্শ্ব স্থলভাগ জলমগ্ন হয়ে সেখানে হিমবাহ উপত্যকা বা ফিয়র্ড (fiords) গঠিত হয়। পার্বত্যপার্শ্ব শানিতভাবে জলে নিমজ্জিত থাকে। সমুদ্র উপকূলে প্রারম্ভিক স্তরে কোনো সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায় না। এখানে ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলো সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়।

উচ্চ পাথুরে উপকূল বরাবর, তরঙ্গ অবনমিত হয়ে ভূমির উপর সজোরে আছড়ে পড়ে, যার ফলে পর্বতের পার্শ্বদেশ উচ্চ খাড়া পাড় বা ভৃগু (cliff) আকারের হয়ে যায়। তরঙ্গের ক্রমাগত আঘাতে ভৃগু অতিশীঘ্র পিছনে সরতে থাকে এবং সামুদ্রিক ভৃগুর সম্মুখে

তরঙ্গ কর্তিত মঞ্চ (wave-cut platform) গড়ে উঠে। তরঙ্গ ধীরে ধীরে সমুদ্র তটের অসঙ্গতি হ্রাস করে।

সামুদ্রিক ভৃগু থেকে অপসারিত পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে ছোটো টুকরোয় ভেঙে যায় এবং স্রোতের সাথে গোলাকৃতিতে ঘূর্ণায়মান হয়ে সমুদ্রতীর থেকে দূরে সঞ্চিত হয়। ভৃগুর বিকাশ বা এর বিবর্তনের যথেষ্ট সময় পরে তটরেখা কিছুটা মসৃণ হয়ে যায় এবং সমুদ্র তীর থেকে দূরে এই পদার্থসমূহের অতিরিক্ত কিছু উপাদান সঞ্চিত হবার ফলে তরঙ্গ কর্তিত ধাপের সম্মুখভাগে তরঙ্গ নির্মিত ধাপ দেখা যেতে পারে। উপকূল বরাবর ক্ষয়কার্য সংঘটিত হলে, উপকূলীয় বা সৈকত স্রোত (longshore currents) বা তরঙ্গ (wave) এই ক্ষয়জাত পদার্থসমূহকে নদীতট বরাবর সৈকত (beaches) এবং তটের নিকটবর্তী অঞ্চলে সঞ্চিত করে বাঁধ (Bars) (বালির দীর্ঘ শৈলশিরা এবং / অথবা উপকূলের সমান্তরালে অমসৃণ নুড়ি) সৃষ্টি করে। বাঁধ (Bars) হল নিমজ্জিত ভূমিরূপ কিন্তু যখন এগুলো জলরাশির উপরে অবস্থান করে, তখন এদের **ব্যারিয়ার বাঁধ** (barrier bars) বলা হয়। ব্যারিয়ার বাঁধ যদি খাড়ির শীর্ষস্থলের সাথে যুক্ত থাকে, তবে এদের **স্পিট** বলা হয়। যখন ব্যারিয়ার বাঁধ এবং স্পিটগুলো কোনো খাড়ির সম্মুখে নির্মিত হয়ে এর পথ অবরোধ করে দেয়, তখন উপহ্রদ (lagoon) গঠিত হয়। ধীরে ধীরে উপহ্রদগুলো ভূমি থেকে বাহিত পলি দ্বারা ভরাট হয়ে উপকূলীয় সমভূমির উত্থান ঘটায়।

নিম্ন পাললিক উপকূল (Low Sedimentary Coasts) :

নিম্ন পাললিক উপকূল বরাবর নদীগুলো, উপকূলীয় সমভূমি ও ব-দ্বীপ গঠন করে এদের দৈর্ঘ্য সম্প্রসারিত করে। কখনো-কখনো জলের অনিয়মিত আঘাতে উপকূলরেখা লেগুন বা উপহ্রদ (lagoons) ও জোয়ারি খাড়ির (tidal creeks) আকারে সমতল দেখায়। জলের মধ্যস্থিত ভূমিঢাল মৃদু হয়। উপকূল বরাবর জলাভূমি এবং বিল দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ উপকূলে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলো বেশি প্রভাবশালী হয়।

যখন ঢেউগুলো মৃদু ঢালযুক্ত পাললিক উপত্যকার উপর আছড়ে পড়ে, তখন তলদেশের পলিসমূহ মন্থর হয়ে যায় এবং এদের পরিবাহিত পদার্থসমূহের দ্বারা বাঁধ, স্পিট, ব্যারিয়ার বাঁধ এবং উপহ্রদ গঠিত হয়। উপহ্রদগুলো অবশেষে একটি জলাভূমিতে পরিণত হয় যা পরবর্তীকালে উপকূলীয় সমভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এই সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলোর অস্তিত্ব ক্ষয়জাত পদার্থ অবিরত সরবরাহের উপর নির্ভর করে। পলিসমূহের সরবরাহে তরঙ্গ ঝড় ও সুনামি তরঙ্গ অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটায়। বড়ো নদীগুলো অধিক পলি বহন করে এবং নিম্ন পাললিক উপকূল বরাবর ব-দ্বীপ গঠন করে।

আমাদের দেশের পশ্চিম উপকূলটি হল একটি উচ্চ পাথুরে পশ্চাদ্‌পসারি (retreating) উপকূল। ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলো পশ্চিম উপকূলে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের পূর্ব উপকূল হল একটি নিম্ন পাললিক উপকূল। পূর্ব উপকূলে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয়।

প্রক্রিয়াসমূহ ও ভূমিরূপগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একটি উচ্চ পাথুরে উপকূল এবং একটি নিম্ন পাললিক উপকূলের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্যগুলো কী কী?

ক্ষয়কার্যের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহ (Erosional Landforms) :

ভৃগু, মঞ্চ, গুহা এবং স্ট্যাকসমূহ (Cliffs, Terraces, Caves and Stacks) :

উপকূলীয় তট যেখানে ক্ষয়কার্য হল প্রধান প্রক্রিয়া, সেখানে প্রধানত দুইটি মুখ্য আকৃতি — তরঙ্গ কর্তিত ভৃগু এবং ধাপ বা মঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় সব সামুদ্রিক ভৃগুগুলো খাড়া ঢালুযুক্ত হয় এবং এগুলো কয়েক মিটার থেকে 30 মিটার পর্যন্ত বা তারও অধিক হতে পারে। এইরূপ ভৃগুর পাদদেশে, সামুদ্রিক ভৃগু থেকে প্রাপ্ত শিলা ডেব্রিস দ্বারা আবৃত একটি সমপ্রায় বা মৃদু ঢালের মঞ্চ থাকতে পারে। তরঙ্গের গড় উচ্চতা থেকে অধিক উচ্চতায় এইরূপ মঞ্চগুলোকে দেখা গেলে, এদের **তরঙ্গ কর্তিত ধাপ বা মঞ্চ** বলা হয়। ভৃগুর তলদেশ তরঙ্গের আঘাতে শিলা ভগ্নাংশগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কিছু গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলো ধীরে ধীরে গভীর ও বিস্তৃত হয়ে সামুদ্রিক গহ্বর (sea caves) গঠন করে। গহ্বরের ছাদগুলো ধসে যাওয়ায় সামুদ্রিক ভৃগুগুলো সমুদ্র থেকে আরও দূরে সরে যায়। ভৃগুর পশ্চাদপসরণের ফলে শিলার কিছু অবশিষ্টাংশ তটের উপর বিচ্ছিন্ন ছোটো দ্বীপের ন্যায় পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ প্রতিরোধী শিলাপুঞ্জ, যা মূলত একটি ভৃগু বা পাহাড়ের অংশবিশেষ, এদের **সামুদ্রিক স্ট্যাক** (sea stacks) বলা হয়। অন্যান্য ভূমিরূপগুলোর ন্যায় সামুদ্রিক স্ট্যাকও অস্থায়ী রূপ, যা তরঙ্গের ক্ষয়কার্যের ফলে উপকূলীয় পাহাড় এবং ভৃগুর ন্যায় ধীরে ধীরে সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত পললসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত বা অমসৃণ নুড়ি বা বালি দ্বারা আবৃত একটি প্রশস্ত সৈকত (beach) গঠন করে।

সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহ (DEPOSITIONAL LANDFORMS) :

সৈকতভূমি এবং বালিয়াড়ি (Beaches and Dunes) :

সৈকতভূমি হল তটভূমির দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা সঞ্চয়কার্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু এবড়ো-থেবড়ো উপকূলে সৈকতভূমি ছোটো ছোটো ফালির আকারে সীমিত অংশে গঠিত হতে পারে। সৈকতভূমি গঠনকারী বেশির ভাগ পলিসমূহ, ভূমি থেকে নদী এবং ক্ষুদ্র নদী দ্বারা বা তরঙ্গের ক্ষয়কার্য দ্বারা পরিবাহিত পদার্থসমূহ থেকে আসে। সৈকত ভূমিগুলো হল অস্থায়ী ভূমিরূপ। কিছু বালুকাময় সৈকত ভূমি (sandy beach), যা স্থায়ী বলে মনে হয়, এগুলো অন্য কোনো ঋতুতে স্থূল নুড়ি, কাঁকরের একটি সংকীর্ণ রাস্তায় পরিবর্তিত হতে পারে। বেশির ভাগ সৈকতভূমি বালির আকারের ক্ষুদ্রকণা দ্বারা গঠিত হয়। অমসৃণ নুড়ি সৈকত (shingle beaches) নামে পরিচিত সৈকতগুলো অত্যধিক ছোটো নুড়ি বা কাঁকর (cobbles) দিয়ে গঠিত।

সৈকতভূমির পশ্চাৎভাগে, সৈকতপৃষ্ঠ থেকে বায়ুতারিত হয়ে উত্তোলিত বালুকণা, বালুকা বালিয়াড়ি (Sand dunes) রূপে সঞ্চিত হয়। তটরেখার সমান্তরালে দীর্ঘ শৈলশিরারূপে গঠিত বালিয়াড়ি নিম্ন পাললিক উপকূল বরাবর সাধারণত গড়ে উঠতে দেখা যায়।

বাঁধ, ব্যারিয়ার এবং স্পিট (Bars, Barriers and Spits) :

সমুদ্রের পুরোদেশীয় তটভূমিতে গঠিত বালি এবং অমসৃণ নুড়ি শৈলশিরা (নিম্ন জোয়ারি জলতল থেকে সমুদ্রাভিমুখী) তটভূমির সমান্তরালে গড়ে উঠলে, তাকে **পুরোদেশীয় বাঁধ** (off-shore bar) বলা হয়। এরকম পুরোদেশীয় বাঁধে বালির অধিক সংযোজনের ফলে উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে, তাকে **ব্যারিয়ার বাঁধ** (barrier bar) বলা হয়। পুরোদেশীয় বাঁধ এবং ব্যারিয়ারগুলো সাধারণত নদী মোহনায় বা উপসাগরের প্রবেশদ্বারে গড়ে উঠে। কখনো-কখনো এই ধরনের ব্যারিয়ার বাঁধের এক প্রান্ত উপসাগরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন তাকে **স্পিট** (spits) বলা হয় (চিত্র 7.15)।

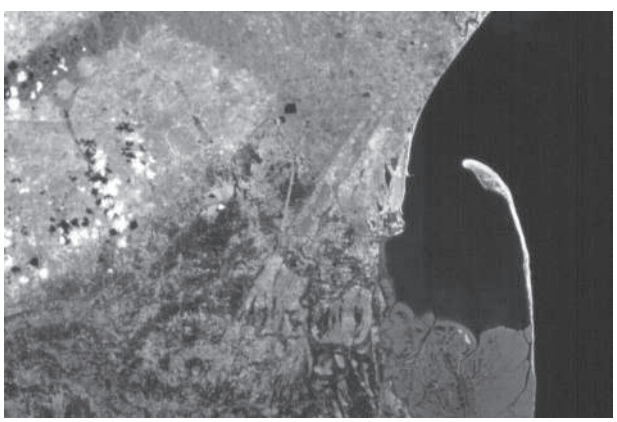

চিত্র 7.15 : উপগ্রহ চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত গোদাবরী নদী ব-দ্বীপের একটি স্পিট।

পাহাড়ের মস্তক দেশের সাথে যুক্ত হয়েও স্পিট গঠিত হয়। সমুদ্রে উপসাগরের মধ্যস্থিত একটি ছোটো ফাঁকা স্থান ব্যতীত ব্যারিয়ার, বাঁধ এবং স্পিট ধীরে ধীরে উপসাগরের মুখে বিস্তার লাভ করে এবং অবশেষে উপসাগরটি একটি উপহ্রদে (lagoon) রূপান্তরিত হয়ে যায়। উপহ্রদগুলো ধীরে ধীরে স্থল থেকে বা সৈকতভূমি থেকে বায়ু দ্বারা বাহিত পলিসমূহের দ্বারা ভরাট হয়ে লেগুনের পরিবর্তে একটি বিস্তৃত ও প্রশস্ত উপকূলীয় সমভূমি রূপে বিস্তার লাভ করে।

> তোমরা কি জান যে, উপকূলের পুরোদেশীয় বাঁধ ঝড় বা সুনামির ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ করে কারণ এই বাঁধগুলো এদের ধ্বংসাত্মক শক্তির তীব্রতা হ্রাস করে দেয়? এছাড়াও ব্যারিয়ার, সৈকতভূমি, সৈকত বালিয়াড়ি এবং ম্যানগ্রোভ, যা ঝড় এবং সুনামি তরঙ্গের ধ্বংসাত্মক শক্তিকে হ্রাস করে। সুতরাং, যদি আমরা উপকূল বরাবর প্রাপ্ত 'পলল বাজেট' (sediment budget) এবং ম্যানগ্রোভগুলোকে নষ্ট করার জন্য কিছু করি, তবে উপকূলীয় ভূমিরূপগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং মানব বসতিকে ঝড় ও সুনামি তরঙ্গের প্রথম প্রহার সহ্য করতে হবে।

বায়ু (WINDS) :

উষ্ণ মরুভূমিতে দুইটি প্রভাবশালী শক্তির মধ্যে বায়ু হল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। মরুস্থলীয় ভূমিগুলো শুষ্ক ও অনুর্বর হওয়ার ফলে খুব বেশি এবং দ্রুত উষ্ণ হয়ে যায়। উষ্ণ তলদেশের ঠিক উপরের বায়ু উষ্ণ হয়ে যায়, যার দ্বারা হালকা উষ্ণ বায়ু আলোড়নের ফলে উর্ধ্বমুখী হয়। এই উর্ধ্বমুখী বায়ু পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হলে ঘূর্ণাবর্ত, ঘূর্ণিবায়ু, অনুবাত এবং নিম্নমুখী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। বায়ু দ্রুতগতিতে মরুভূমির পৃষ্ঠদেশ বরাবর প্রবাহিত হয় এবং এদের পথে বাধা ও ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে, ঝটিকা বায়ু খুব ধ্বংসাত্মক হয়। বায়ু অবঘর্ষ, অপসরণ এবং ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়কার্য করে। অপসরণ প্রক্রিয়ায় বায়ু শিলাপৃষ্ঠ থেকে শিলার ছোটো কণা এবং ধুলিকণাকে উত্তোলিত করেও অপসারণ করে। পরিবহণ প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের ঘর্ষণের জন্য বালু এবং পলি কার্যকরী হাতিয়ার রূপে কাজ করে। যখন বায়ুতে উপস্থিত বালুর কণা শিলাপৃষ্ঠে ধাক্কা খায়, তখন এর প্রভাব বায়ুর কৃন্তন বলের উপর নির্ভর করে। এটি ক্ষুদ্র বালিকণা বিশরণ (sand-blasting) প্রক্রিয়ার অনুরূপ। বায়ুকার্য মরুভূমির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষয়জাত এবং সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠন করে।

প্রকৃতপক্ষে, মরুভূমির অধিকতর ভূমিরূপের নির্মাণ পুঞ্জিতক্ষয় এবং প্রবাহমান জল বা শিট্ ফ্লাড (Sheet flood) দ্বারা হয়। যদিও মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত দুর্লভ, কিন্তু এটি অল্প সময়ে মুষলাধারে বৃষ্টি (torrential) রূপে হয়ে থাকে। মরুভূমির শিলাগুলো গাছপালাবিহীন হওয়ার কারণে তথা দৈনিক তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। তাই এগুলোর শীঘ্র ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টি এই আবহবিকারজনিত পদার্থসমূহকে অতি সহজে অপসারণে সাহায্য করে। এর মানে হল, মরুভূমিতে আবহবিকারজনিত ভগ্নাবশেষ কেবল বায়ু দ্বারা নয় বরং বৃষ্টি / ধৌতকরণ প্রক্রিয়ার (sheet wash) দ্বারাও পরিবাহিত হয়। বায়ু কেবল সূক্ষ্ম পদার্থসমূহকে পরিবাহিত করে এবং সাধারণ পুঞ্জিত ক্ষয় প্রধানত শিট্ ফ্লাড (sheet floods) বা ধৌতকরণ প্রক্রিয়ার (sheet wash) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মরু অঞ্চলে নদীপ্রবাহ বিস্তৃত, মসৃণ এবং অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয় এবং বৃষ্টির পরে অল্প সময়ের জন্য প্রবাহিত হয়।

ক্ষয়কার্যের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহ (Erosional Landforms): পেডিমেন্ট এবং সমপ্রায় ভূমি (Pediments and Pediplains) :

মরুভূমিতে ভূমিরূপের বিবর্তন প্রাথমিকভাবে পেডিমেন্টের গঠন এবং এর সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত। পর্বতের পাদদেশে ডেব্রিস বা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া বা ধ্বংসস্তূপ সহিত মৃদু ঢালযুক্ত পাথুরে তলদেশকে পেডিমেন্ট (pediments) বলা হয়। পেডিমেন্টের গঠন, পর্বতের অগ্রভাগের ক্ষয়কার্য মূলত ক্ষুদ্র নদীর পার্শ্বক্ষয় বা শিট্ ফ্লাড - এই দুইটির মিলিত ক্ষয়কার্যের দ্বারা হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের তীব্র ঢাল বরাবর বা ভূগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত খাড়া কর্তিত রূপগুলোর তীব্র ঢালের পার্শ্বে ক্ষয়কার্য প্রারম্ভ হয়। খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং পশ্চাদ্‌দেশে ভৃগুযুক্ত পেডিমেন্ট গঠিত হলে, পরবর্তী সময়ে ক্ষয়কার্যের ফলে ভৃগুর পশ্চাদপসরণ ঘটে। ক্ষয়কার্যের এই প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠক্ষরণের (backwasting) মাধ্যমে ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ প্রক্রিয়া বলে। সুতরাং, ঢালের সমান্তরাল পশ্চাদপসরণ দ্বারা পর্বতের অগ্রভাগকে ক্ষয় করে পেডিমেন্ট পশ্চাতে অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে পর্বত ক্ষয়ীভূত হয়ে পর্বতের অবশিষ্টাংশ রূপে ইনসেলবার্গ (Inselberg) রয়ে যায়। এই প্রকার মরু অঞ্চলে একটি উচ্চভূমি, আকৃতিবিহীন নিম্নভূমিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যাকে **সমপ্রায়ভূমি** (pediplains) বলা হয়।

প্লায়া (Playas) :

মরুভূমিতে সমতলভূমি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ। পর্বত এবং পাহাড় দ্বারা আবৃত অববাহিকায় জলনিকাশিব্যবস্থা মূলত অববাহিকার মাঝখানে অবস্থিত এবং অববাহিকার পার্শ্বক্ষয় দ্বারা ক্রমাগত বাহিত পলিসমূহ সঞ্চয়ের কারণে অববাহিকার মধ্যে একটি প্রায় সমতলভূমির সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেলে এই সমতলভূমি একটি অগভীর জলক্ষেত্রের দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। এইরূপ অগভীর হ্রদকে **প্লায়া** (Playas) বলা হয়। এগুলোতে বাষ্পীভবনের কারণে জল অল্প সময়ের জন্য থাকে এবং প্রায়শই প্লায়াগুলোতে প্রচুর পরিমাণ লবণের সঞ্চয় দেখা যায়, লবণ দ্বারা আবৃত এইরূপ প্লায়া সমভূমিকে **ক্ষারীয় ভূমি** (alkali flats) বলা হয়।

অপসরণ গর্ত এবং গহ্বর (Deflation Hollows and Caves) :

বায়ুর একইদিকে স্থায়ী প্রবাহের ফলে শিলার আবহবিকারজনিত পদার্থ বা অসংগঠিত মৃত্তিকা অপসারিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অগভীর গর্ত তৈরি হতে পারে, এদের **অপসরণ গর্ত** (deflation hollows) বলে। অপসরণ শিলা পৃষ্ঠতলের উপর অনেক ছোটো গর্ত (pits) বা গহ্বরও (cavities) তৈরি করে। তীব্র বেগযুক্ত বায়ুবাহিত ধুলিকণার অবঘর্ষের প্রভাবে শিলার পৃষ্ঠতলে প্রথমে অগভীর গর্তের সৃষ্টি হয়, যাকে **ব্লো আউট** (blow outs) বলা হয় এবং এর মধ্যে কয়েকটি ব্লো আউট গভীর ও বিস্তৃত হলে এগুলো গহ্বর (caves) নামে পরিচিত হয়।

মাশরুম, টেবিল এবং পেডেস্টাল শিলা (Mushroom, Table and Pedestal Rocks) :

মরুভূমিতে বেশিরভাগ শিলা বায়ুর অপসরণ বা অবঘর্ষ দ্বারা অতি শীঘ্রই কর্তিত হয়ে যায় এবং কিছু প্রতিরোধী শিলার দ্বারা ঘর্ষিত অবশিষ্টাংশ যেগুলোর সরুবৃন্ত বা উপরিভাগ বিস্তৃত ও গোলাকার টুপি আকৃতি বা মাশরুম আকার রূপে পাওয়া যায়। কখনো-কখনো প্রতিরোধী শিলার উপরের পৃষ্ঠটি একটি টেবিলের শীর্ষের ন্যায় বিস্তৃত হয় এবং বেশিরভাগ সময়ই অবশিষ্টাংশ স্তম্ভমূলের (pedestals) মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বায়ুকার্য এবং শিট্ ফ্লাড দ্বারা নির্মিত ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলোকে তালিকাভুক্ত করো।

সঞ্চয়কার্যের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহ (Depositional Landforms) :

বায়ু হল একটি শ্রেণিবিভাজনকারী মাধ্যম (sorting agent)। বায়ুর গতিবেগের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন আকারের দানাগুলো তল বরাবর ঘূর্ণায়মান বা লম্ফদান প্রক্রিয়ায় চালিত হয় এবং ভাসমান অবস্থায় বয়ে যায় এবং পরিবহণ প্রক্রিয়ায় পদার্থসমূহের শ্রেণিবিভাজন হয়। যখন বায়ুর গতি হ্রাস পায় বা একদম শেষের দিকে থাকে, তখন দানাগুলোর আকার এবং এদের বেগের উপর নির্ভর করে সঞ্চয় প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং, বায়ু দ্বারা গঠিত সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলোতে একই প্রকার কণাবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। বায়ু

সর্বত্র বিদ্যমান এবং বালির উৎসস্থলে বায়ুর অবিরাম প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ গঠিত হয়।

বালিয়াড়ি (Sand Dunes) :

উষ্ণ শুষ্ক মরুভূমি হল বালিয়াড়ি গঠনের উপযুক্ত স্থান। এগুলো গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার বালিয়াড়ি গঠনের ক্ষেত্রে বৃহৎ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র 7.16)।

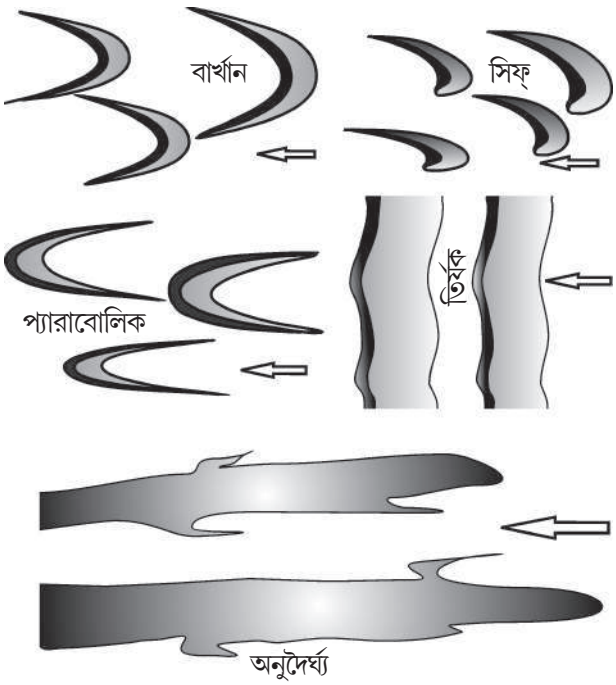

চিত্র 7.16 : বালিয়াড়ির বিভিন্ন রূপ। তীরগুলো বায়ুর দিক নির্দেশ করছে।

বায়ুর গতির আড়াআড়িভাবে গঠিত অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি-গুলোকে (Crescent Dunes) **বার্খান** (barkhans) বলে। অর্থাৎ যেখানে বায়ু প্রবাহ নিম্নমুখী হয়, বায়ুর দিক অপরিবর্তনীয় ও মাঝারি প্রকৃতির থাকে, মূল ভূ-পৃষ্ঠের উপরের বালি সমভাবে গতিশীল থাকে সেখানে বার্খান গড়ে ওঠে। যখন বালুকাময় পৃষ্ঠ আংশিকভাবে উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত থাকে, তখন সেখানে প্যারাবোলিক বালিয়াড়ি (Parabolic dunes) গঠিত হয়। অর্থাৎ যদি বায়ুপ্রবাহের দিক একই প্রকৃতির হয়, তবে প্যারাবোলিক বালিয়াড়ি বার্খান থেকে ভিন্ন আকৃতির হয়। সিফ্ (Seif) স্বল্প পার্থক্যযুক্ত ও বার্খানের অনুরূপ হয়। সিফ্ বালিয়াড়িতে শুধুমাত্র একটি ভূজ (wing) বা বিন্দু থাকে। বায়ুপ্রবাহের অবস্থা পরিবর্তিত হলে এরূপ ঘটে। সিফ্‌ের এই ভূজসমূহ উচ্চ এবং অধিক দীর্ঘ হতে পারে। যখন বালির সরবরাহ কম হয় এবং বায়ুগতির দিক স্থির থাকে, তখন অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি (Longitudinal dunes) গড়ে ওঠে। এগুলো দীর্ঘ এবং কম উচ্চতাযুক্ত শৈলশিরারূপে দেখা যায়। তির্যক বালিয়াড়ি (Transverse dunes) বায়ুপ্রবাহের দিকের সমকোণে গড়ে ওঠে। যেখানে বায়ুপ্রবাহের দিক স্থির এবং বালিস্রোত বায়ুপ্রবাহের দিকে দীর্ঘায়িত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমকোণে অবস্থান করে, সেখানে এইরূপ বালিয়াড়ি গঠিত হয়। এগুলো অধিক দীর্ঘ এবং কম উচ্চতাযুক্ত হতে পারে। যখন বালি প্রচুর হয়, তখন অধিকতর নিয়মিত আকৃতির বালিয়াড়ি সংযুক্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং এদের পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। মরুভূমিতে অধিকতর বালিয়াড়ি স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং এর মধ্যে কয়েকটি, বিশেষত মানব বসতির কাছাকাছি স্থিতিশীল হয়ে যায়।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

(i) ভূমিরূপ বিকাশে নীচের কোন্ অবস্থায় নিম্নাভিমুখী কর্তন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে?

(a) যৌবন অবস্থা (c) অন্তিম প্রৌঢ়াবস্থা

(b) প্রথম প্রৌঢ়াবস্থা (d) বার্ধক্য অবস্থা

(ii) খাড়া ধাপের ন্যায় পার্শ্ব ঢাল দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গভীর উপত্যকাকে বলা হয় :

(a) U-আকৃতির উপত্যকা (c) অন্ধ উপত্যকা

(b) গিরিখাত (d) ক্যানিয়ন

(iii) নিম্নলিখিত কোন্ অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার অপেক্ষা রাসায়নিক আবহবিকার প্রক্রিয়া অধিক প্রভাবশালী হয়?

(a) আর্দ্র অঞ্চল (c) শুষ্ক অঞ্চল

(b) চুনাপাথর অঞ্চল (d) হিমবাহ অঞ্চল

(iv) নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি 'ল্যাপিস্' (Lapies) শব্দটিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে?

(a) একটি ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারের অগভীর গর্ত।

(b) একটি ভূমিরূপ যার উর্ধ্বমুখী অংশ কম বেশি বৃত্তাকার এবং নীচের দিক ফানেল আকারের হয়।

(c) একটি ভূমিরূপ যেটি পৃষ্ঠদেশ থেকে জলক্ষরণের ফলে গড়ে উঠে।

(d) একটি অনিয়মিত পৃষ্ঠ যার তীক্ষ্ণ চূড়া, খাঁজ এবং শৈলশিরা আছে।

(v) একটি গভীর, লম্বা এবং বিস্তৃত খাত বা অববাহিকা যার মস্তকদেশ খাড়া অবতল ঢালযুক্ত এবং পার্শ্বদেশও অনুরূপ হয়, এদের বলা হয় :

(a) সার্ক (c) পার্শ্ব গ্রাবরেখা

(b) হিমবাহ উপত্যকা (d) এস্‌কার

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) শিলার মধ্যে অধঃকর্তিত নদীবাঁক এবং পলি গঠিত সমভূমির মধ্যে নদী বাঁকসমূহ কী নির্দেশ করে?

(ii) উপত্যকীয় রন্ধ্র বা উভালার বিবর্তন ব্যাখ্যা করো।

(iii) চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে পৃষ্ঠ জলপ্রবাহ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ খুবই সাধারণ বিষয় কেন?

(iv) হিমবাহ উপত্যকায় বিভিন্ন রৈখিক অবক্ষেপিত ভূমিরূপ দেখা যায়। এদের অবস্থান এবং নামগুলো বলো।

(v) মরুভূমি এলাকায় বায়ু কীভাবে কার্য সম্পাদন করে? মরুভূমিতে বায়ুই কি একমাত্র উপাদান যা ক্ষয়ীভূত ভূমিরূপ নির্মাণের জন্য দায়ী?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) আর্দ্র এবং শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ রূপায়ণে প্রবাহিত জলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপগত উপাদান — ব্যাখ্যা করো।

(ii) চুনাপাথর আর্দ্র এবং শুষ্ক জলবায়ুতে ভিন্ন কাজ করে। কেন? চুনাপাথর অঞ্চলে প্রধান এবং প্রায় স্বতন্ত্র ভূমিরূপগত প্রক্রিয়া কী এবং এর ফলাফল কী?

(iii) কীভাবে হিমবাহ কার্য সম্পাদন করে উঁচু পর্বতকে নীচু পাহাড় বা সমভূমিতে পরিণত করে?

প্রকল্পমূলক কাজ :

তোমাদের এলাকার চারপাশের ভূমিরূপ, এদের উপাদানসমূহ এবং এগুলো যে প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত — সেগুলো শনাক্ত করো।

একক : IV

জলবায়ু

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- *বায়ুমণ্ডল — উপাদান ও গঠন : আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান।*
- *সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল — পতনকোণ এবং বণ্টন, পৃথিবীর তাপীয় বাজেট বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ এবং শীতল হওয়া (পরিবহণ, পরিচলন, পার্থিব বিকিরণ, অনুভূমিক পরিচলন) তাপমাত্রা — তাপমাত্রা বণ্টনের কারণ, তাপমাত্রার বণ্টন — তাপের উল্লম্ব এবং অনুভূমিক বণ্টন, বৈপরীত্য উত্তাপ।*
- *চাপ — চাপবলয়, বায়ুপ্রবাহ — নিয়ত, সাময়িক এবং স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ, বায়ুপুঞ্জ এবং সীমান্ত, ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণাবাত।*
- *অধঃক্ষেপণ — বাষ্পীভবন, ঘনীভবন — শিশির, তুষার, কুয়াশা, হালকা কুয়াশা এবং মেঘ; বৃষ্টিপাত — শ্রেণিবিভাগ ও বিশ্ববণ্টন।*
- *বিশ্ব জলবায়ুসমূহ — বিশ্ব জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ (কোপেন), গ্রিনহাউস প্রভাব এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন।*

অধ্যায়

8

বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও গঠন

COMPOSITION AND STRUCTURE OF ATMOSPHERE

মানুষ কি বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে? আমরা দিনে দুই থেকে তিনবার খাদ্য খাই, মাঝে মাঝে জল পান করি কিন্তু শ্বাস আমরা কয়েক সেকেন্ড অন্তর অন্তর নিতে থাকি। সকল প্রকার জৈব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু অপরিহার্য। কোনো কোনো জীব যেমন- মানুষ খাদ্য বা জল ছাড়া কিছু সময় বেঁচে থাকলেও বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তাই আমাদের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা উচিত। বায়ুমণ্ডল হল বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের মিশ্রণ যা ভূ-পৃষ্ঠকে একটি চাদরের মতো বেষ্টন করে রয়েছে। এই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে কিছু জীবনদায়ী গ্যাস যেমন- অক্সিজেন, যা মনুষ্যকূল ও প্রাণীকূল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যা উদ্ভিদকূলের জন্য প্রয়োজনীয়। ভূ-পৃষ্ঠের একটি অখণ্ড অংশ হল বায়ুমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের প্রায় 99 শতাংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 32 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বায়ু মূলত বর্ণহীন ও গন্ধহীন হয় এবং তা শুধুমাত্র বাতাস রূপে প্রবাহিত হলেই অনুভব করা যায়।

> তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস না থাকলে কী হবে?

বায়ুমণ্ডলের উপাদান (COMPOSITION OF THE ATMOSPHERE) :

বায়ুমণ্ডল গ্যাস, জলীবাষ্প এবং ধূলিকণা নিয়ে গঠিত। সারণি 8.1 এ বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের বিভিন্ন গ্যাসের বর্ণনা দেওয়া হল। উচ্চস্তরে এই সকল গ্যাসের অনুপাত পরিবর্তিত হয় এবং ঊর্ধ্বাকাশে প্রায় 120 কিমি উচ্চতায় অক্সিজেন প্রায় নগণ্য হয়ে পড়ে। একইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 90 কিমি ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত দেখা যায়।

সারণি **8.1** বায়ুমণ্ডলের স্থায়ী গ্যাসসমূহ

উপাদান	*সংকেত*	*শতকরা আয়তন*
নাইট্রোজেন	N_2	78.08
অক্সিজেন	O_2	20.95
আর্গন	Ar	0.93
কার্বন ডাইঅক্সাইড	CO_2	0.036
নিয়ন	Ne	0.002
হিলিয়াম	He	0.0005
ক্রিপ্টন	Kr	0.001
জেনন	Xe	0.00009
হাইড্রোজেন	H_2	0.00005

গ্যাসসমূহ (Gases) :

কার্বন ডাইঅক্সাইড, আবহবিদ্যাগতভাবে বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস কারণ, এতে আগত সৌররশ্মির কাছে স্বচ্ছ কিন্তু পার্থিব বিকিরণের কাছে অস্বচ্ছ মাধ্যম রূপে কাজ করে। এটি পার্থিব বিকিরণের একটি অংশ প্রতিফলিত করে এবং কিছু অংশ ভূ-পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়। এটি **গ্রিন হাউস প্রভাবের** (Green house effect) জন্য দায়ী। বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য সব গ্যাসের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় হলেও গত কয়েক দশকে জীবাশ্ম জ্বালানি বৃদ্ধির কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে। বায়ুমণ্ডলের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল **ওজোন** যা 10 থেকে 50 কিমি পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে দেখা যায়, এটি ফিল্টারের মতো কাজ করে এবং সূর্যের **অতিবেগুনি রশ্মিকে** (Ultra-Violet rays) শোষণ করে, তাকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত আসতে বাধা দেয়।

জলীয়বাষ্প (Water Vapour) :

জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলের অপর একটি পরিবর্তনশীল উপাদান, যা উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়। উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে এটি বায়ুর মোট আয়তনের 4 শতাংশ হতে পারে। অপরদিকে শুষ্ক এবং শীতল মরু ও মেরু অঞ্চলে এটি 1 শতাংশেরও কম হতে পারে। এটি সূর্যরশ্মির অংশ শোষণ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপকে সংরক্ষণ করে। এটি একটি চাদরের ন্যায় অবস্থান করে যাতে পৃথিবী খুব বেশি উষ্ণ বা শীতল না হয়ে পড়ে। জলীয়বাষ্পের উপর বায়ুমণ্ডলের স্থিতাবস্থা ও অস্থিরতা নির্ভর করে।

ধূলিকণা (Dust Particles) :

বায়ুমণ্ডলের ছোটো ছোটো ধূলিকণা ধরে রাখার যথেষ্ট ধারণক্ষমতা রয়েছে। এইসব ধূলিকণাগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হতে পারে। যথা-সামুদ্রিক লবণ, পলিমাটি, ধূলিকণা, ধোঁয়া, ফুলের রেণু, উল্কাপিণ্ডের খণ্ড বিখণ্ড অংশ। ধূলিকণা সাধারণত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ বেশি কারণ সেখানে বায়ু নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলের তুলনায় শুষ্ক। ধূলিকণা এবং নুনের কণা জলগ্রাহী কণারূপে কাজ করে যাকে কেন্দ্র করে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে।

বায়ুমণ্ডলের গঠন (Structure of the Atmosphere) :

বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন ঘনত্ব যুক্ত ও তাপমাত্রা যুক্ত স্তর দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর ঘনত্ব ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানে বেশি এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘনত্ব হ্রাস পায়। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোকে তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। এই স্তরগুলো হল : ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরটি হল **ট্রপোস্ফিয়ার** (Troposphere)। এর গড় উচ্চতা 13 কিমি, যা নিরক্ষরেখার নিকটে 8 কিমি এবং মেরু অঞ্চলে 18 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রপোস্ফিয়ারের ঘনত্ব নিরক্ষরেখার নিকটে সর্বাধিক কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রবল পরিচলন স্রোতের প্রভাবে তাপের পরিবহণ অনেক উচ্চতা পর্যন্ত হয়। এই স্তরটিতে ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প রয়েছে। এই স্তরে তাপমাত্রা হ্রাসের পরিমাণ প্রতি 165 মিটার উচ্চতায় 1^0 সেলসিয়াস (c)। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটি জৈবিক কার্যাবলির জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যে অঞ্চলটি ট্রপোস্ফিয়ারকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থেকে পৃথক করে তা **ট্রোপোপজ** (Tropopause) নামে পরিচিত। ট্রোপোপজের তাপমাত্রা নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় – 80° সেলসিয়াস এবং মেরু অঞ্চলে – 45° সেলসিয়াস। এই অংশে তাপমাত্রার বেশি পরিবর্তন হয় না, তাই এই অঞ্চলের নাম ট্রোপোপজ। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ট্রোপোপজের উপর 50 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল — এখানে ওজোন স্তরটি অবস্থান করছে। ওজোন স্তরটি সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে এবং পৃথিবীর রক্ষাকবচ রূপে কাজ করে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপর অবস্থান করছে **মেসোস্ফিয়ার** (Mesosphere) যা 80 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরটিতে আবার তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় এবং তা 80 কিমি উচ্চতায় – 100° সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মেসোস্ফিয়ারের সর্বশেষ অংশটি **মেসোপজ** (Mesopause) নামে পরিচিত। মেসোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বে 80 থেকে 400 কিমি. এর উপর **আয়োনোস্ফিয়ার** (Ionosphere) স্তরটি অবস্থিত। এই স্তরটিতে বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত আয়ন কণা রয়েছে, তাই এই স্তরটি আয়োনোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। রেডিয়ো তরঙ্গ যা পৃথিবী থেকে প্রেরিত হয় তা এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই স্তরে তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

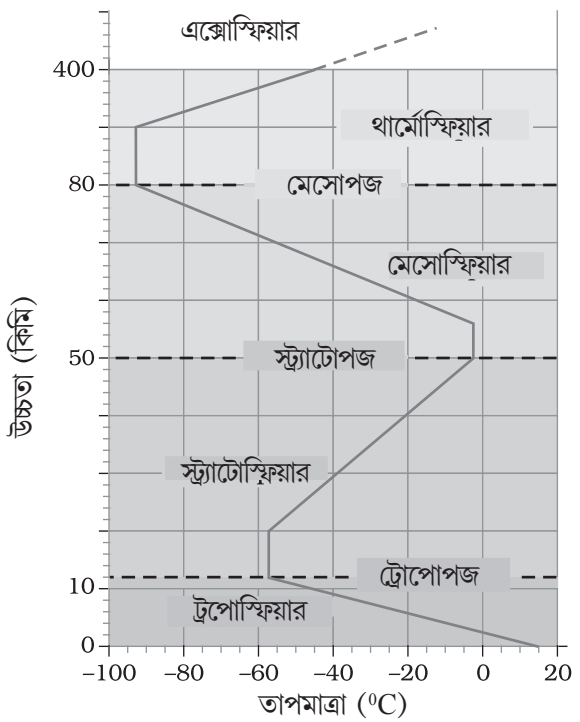

চিত্র **8.1 : বায়ুমণ্ডলের গঠন**

বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর যা থার্মোস্ফিয়ারের উপর অবস্থান করে তাকে **এক্সোস্ফিয়ার** (Exosphere) বলে। এটি সর্বোচ্চ স্তর এবং খুব কমই এই স্তর সম্পর্কে জানা গেছে। এই স্তরে যে সকল উপাদান রয়েছে তা অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা মহাকাশে মিলিত হয়। যদিও বায়ুমণ্ডলের সবকটি স্তর মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে তা সত্ত্বেও ভূগোলবিদরা প্রথম দুটি স্তর নিয়েই বিশেষভাবে চিন্তা করে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান (Elements of Weather and Climate) :

বায়ুমণ্ডলের যেসকল উপাদান পরিবর্তিত হয় এবং মানবজীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো হল তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘ এবং অধঃক্ষেপণ। এই সকল উপাদান সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায় 9, 10 এবং 11 তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

(i) বায়ুমণ্ডলে কোন্ গ্যাসের পরিমাণ সর্বাধিক ?

(a) অক্সিজেন (c) আর্গন

(b) নাইট্রোজেন (d) কার্বন ডাইঅক্সাইড

(ii) বায়ুমণ্ডলের যে স্তরটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল :

(a) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (c) মেসোস্ফিয়ার

(b) ট্রোপোস্ফিয়ার (d) আয়নোস্ফিয়ার

(iii) সামুদ্রিক লবণ, পরাগরেণু, ছাই, ধোঁয়া, পলিমাটি — কীসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

(a) গ্যাস (c) জলীয় বাষ্প

(b) ধূলিকণা (d) উল্কাপিণ্ড

(iv) বায়ুমণ্ডলের কোন্ উচ্চতায় অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ নগণ্য হয়ে পড়ে ?

(a) 90 কিমি (c) 100 কিমি

(b) 120 কিমি (d) 150 কিমি

(v) নিম্নে বর্ণিত গ্যাসগুলোর মধ্যে কোন্ গ্যাসটি আগত সৌর বিকিরণের জন্য স্বচ্ছ মাধ্যম ও পার্থিব বিকিরণের জন্য অস্বচ্ছ মাধ্যম রূপে কাজ করে ?

(a) অক্সিজেন (c) হিলিয়াম

(b) কার্বন ডাইঅক্সাইড (d) নাইট্রোজেন

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) বায়ুমণ্ডল বলতে কী বোঝ?

(ii) আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বলতে কী বোঝ?

(iii) বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো আলোচনা করো।

(iv) ট্রোপোস্ফিয়ার কেন বায়ুমণ্ডলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর 120 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) বায়ুমণ্ডলের উপাদানগত গঠন আলোচনা করো।

(ii) বায়ুমণ্ডলের স্তরগত গঠনের একটি চিত্র অঙ্কন করো ও আলোচনা করো।

সৌর বিকিরণ, তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রা

(Solar Radiation, Heat Balance and Temperature)

অধ্যায় 9

তোমরা কি তোমাদের চারপাশে বায়ুকে অনুভব কর? তোমার কি জান আমরা বায়ুর এক বৃহৎ স্তূপের নীচে বাস করি? আমরা বায়ুতে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করি কিন্তু আমরা বায়ুকে তখনই অনুভব করি যখন তা গতিশীল থাকে। এর অর্থ হল গতিশীল বায়ুই হচ্ছে বায়ুপ্রবাহ। তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে পৃথিবী চারদিকে বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বায়ুর এই আবরণই হল বায়ুমণ্ডল যা বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্যাসগুলোর জন্যই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বর্তমান।

পৃথিবী তার শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ সূর্য থেকে গ্রহণ করে। পৃথিবী সূর্য থেকে গৃহীত এই শক্তিকে মহাকাশে আবার ফিরিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর অধিক উষ্ণ হয় না আবার শীতল হয়েও পড়ে না। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাগ বা অংশ দ্বারা গৃহীত তাপের পরিমাণ সমান থাকে না। এই ভিন্নতা বায়ুমণ্ডলে চাপের তারতম্য বা পার্থক্য সৃষ্টি করে। ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বায়ু দ্বারা তাপের স্থানান্তর হয়। এই অধ্যায়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণ ও শীতল হওয়ার প্রক্রিয়াসমূহ এবং ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রার বণ্টন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সৌর বিকিরণ (Solar Radiation) :

ভূ-পৃষ্ঠ তার শক্তির বেশির ভাগ অংশই ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (short wave lengths) গ্রহণ করে। পৃথিবীতে গৃহীত শক্তিকে **'আগত সৌর বিকিরণ** (Incoming Solar Radiation)' বা সংক্ষেপে '**সৌর বিকিরণ**' (Solar insolation) বলা হয়।

যেহেতু পৃথিবীর আকৃতি 'জিয়ড' (geoid) যা দেখতে গোলকের মতো। এর ফলে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে পড়ে, তাই সৌরশক্তির খুব কম অংশই পৃথিবী শোষণ করতে পারে। পৃথিবী গড়ে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গ সেমিতে 1.94 ক্যালোরি শক্তি গ্রহণ করে। প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগে গৃহীত শক্তির পরিমাণে সামান্য পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যেকার দূরত্বের কারণে হয়। 4 জুলাই তারিখে সূর্যের কক্ষপথে পরিক্রমণের সময় পৃথিবী সূর্য থেকে সর্বাধিক দূরত্বে (152 মিলিয়ন কিমি.) (1 মিলিয়ন =10,000,00) অবস্থান করে। পৃথিবীর এই অবস্থানকে '**অপসূর** (*aphelion*)' বলে। জানুয়ারি তারিখে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে (147 মিলিয়ন কিমি.)। এই অবস্থানকে **অনুসূর** (*perihelion*) বলে। সেজন্য পৃথিবী দ্বারা গৃহীত বার্ষিক সৌর বিকিরণের পরিমাণ 3 জানুয়ারি তারিখে 4 জুলাই তারিখের তুলনায় অধিক হয়। তা সত্ত্বেও সূর্যতাপের এই ভিন্নতার প্রভাব অন্যান্য কারণ যথা-স্থলভাগ ও জলভাগের বণ্টন এবং বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চলনের দ্বারা হ্রাস পায়। এ কারণেই সূর্যতাপের এই ভিন্নতা ভূ-পৃষ্ঠের দৈনন্দিন আবহাওয়ার পরিবর্তনে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না।

ভূপৃষ্ঠে সৌর বিকিরণের পরিবর্তনশীলতা (Variability of Insolation at the Surface of the Earth) :

সৌর বিকিরণের মাত্রা ও তীব্রতা প্রতিদিন, প্রত্যেক ঋতু এবং প্রতি বছরে পরিবর্তন হয়। সৌর বিকিরণের বিভিন্নতা বা তারতম্যের কারণসমূহ হল — (i) নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তন (ii) সূর্যরশ্মির পতনকোণ (iii) দিনের দৈর্ঘ্য (iv) বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা (v) স্থল বিন্যাস। কিন্তু শেষের দুটি কারণের প্রভাব কম পড়ে।

মূল বিষয়টা হচ্ছে পৃথিবীর অক্ষ সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণের কক্ষপথে 66½ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে যা বিভিন্ন অক্ষাংশে গৃহীত সৌর বিকিরণের মাত্রা বা পরিমাণকে প্রভাবিত করে। সারণি 9.1-এ অয়নকাল অনুসারে (নিরক্ষরেখা থেকে সূর্যের দূরত্বের অবস্থান) বিভিন্ন অক্ষরেখায় দিনের স্থায়িত্বের পরিবর্তনগুলো লক্ষ করো।

সৌর বিকিরণের পরিমাণকে নির্ধারণ করার দ্বিতীয় কারণটি হল সূর্যরশ্মির পতনকোণ। এটি নির্ভর করে কোনো স্থানের অক্ষাংশের উপর।

আকাশে রং বা বর্ণ যোগ করে। বায়ুমণ্ডলে আলো বিচ্ছুরিত হওয়ার ফলেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যের রং লাল এবং আকাশের রং নীলাভ দেখায়।

সারণি 9.1 : উত্তর গোলার্ধের উত্তর অয়নান্ত এবং দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দুতে ঘণ্টায় এবং মিনিটে দিনের দৈর্ঘ্য

অক্ষাংশ	0°	20°	40°	60°	90°
ডিসেম্বর 22	12 ঘণ্টা 00 মি.	10 ঘণ্টা 48 মি.	9 ঘণ্টা 8 মি.	5 ঘণ্টা 33 মি.	0
জুন 21	12 ঘণ্টা	13 ঘণ্টা 12 মি.	14 ঘণ্টা 52 মি.	18 ঘণ্টা 27 মি.	6 মাস

অক্ষাংশ যত উচ্চ হবে ভূ-পৃষ্ঠে সূর্যরশ্মির পতনকোণ ততই কম হবে। অতএব সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়বে। তির্যক রশ্মির তুলনায় উল্লম্ব রশ্মি অপেক্ষাকৃত কম স্থানে পড়ে। সূর্যরশ্মি যদি আরও বেশি স্থান জুড়ে পড়ে তাহলে শক্তিও বেশি স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে প্রতি এককে গৃহীত শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়। সর্বোপরি তীর্যক রশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের অধিক গভীরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। ফলস্বরূপ অধিক শোষণ (absorption), বিক্ষেপণ (scattering) এবং বিচ্ছুরণ (diffusion) হয়।

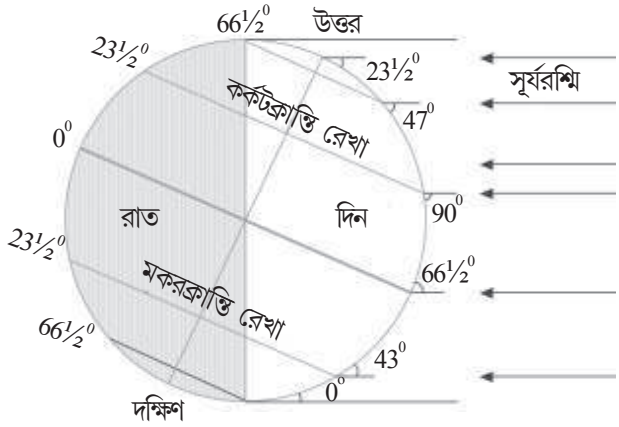

চিত্র 9.1 : উত্তরায়ণ

বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে সৌর বিকিরণের পথ (*The Passage of Solar Radiation through the Atmosphere*) :

বায়ুমণ্ডল সৌর বিকিরণের অধিকাংশ ক্ষুদ্র তরঙ্গের জন্য স্বচ্ছ হয়। ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছানোর আগে সূর্য থেকে আগত সৌর বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। ট্রপোস্ফিয়ারের (troposphere) মধ্যে জলীয়বাষ্প, ওজোন (Ozone) এবং অন্যান্য গ্যাসসমূহ ইনফ্রারেড (infrared) বিকিরণের কাছাকাছি বিকিরণকে শোষণ করে। ট্রপোস্ফিয়ারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিলম্বিত কণা (Suspended particles) মহাকাশ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে দৃশ্যমান বর্ণচ্ছটা বা বর্ণালীকে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে

ভূ-পৃষ্ঠে সৌর বিকিরণের স্থানিক বণ্টন (*Spatial Distribution of Insolation at the Earth's Surface*) :

ভূ-পৃষ্ঠে গৃহীত সৌর বিকিরণের পরিমাণে ক্রান্তীয় অঞ্চলে 320 ওয়াট (Watt) / বর্গমিটার থেকে মেরু অঞ্চলে 70 ওয়াট (Watt) / বর্গমি. পর্যন্ত ভিন্নতা দেখা যায়। সর্বাধিক সৌর বিকিরণ গৃহীত হয় আন্তঃক্রান্তীয় মরুভূমি অঞ্চলে কারণ সেখানে মেঘাচ্ছন্নতা কম থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম সৌর বিকিরণ গৃহীত হয়। সাধারণত একই অক্ষাংশে অবস্থিত মহাসাগরের তুলনায় মহাদেশে অধিক সৌর বিকিরণ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য এবং উচ্চ অক্ষাংশে গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে কম সৌর বিকিরণ গৃহীত হয়।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণায়ন এবং শীতলীকরণ (Heating and Cooling of Atmosphere) :

বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে উষ্ণ ও শীতল হয়।

ভূ-পৃষ্ঠ সৌর বিকিরণের দ্বারা উত্তপ্ত হবার পর এই উত্তাপ পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘ তরঙ্গরূপে সঞ্চারিত করে। বায়ু ভূমির সংযোগে এলে ধীরভাবে উত্তপ্ত হয় এবং নিম্নস্তরের সংস্পর্শে উপরের স্তরের বায়ুও উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াকে পরিবহণ (*conduction*) বলে। দুটি অসমান উষ্ণতা বা তাপমাত্রাবিশিষ্ট বস্তু যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন পরিবহণ শুরু হয়। উষ্ণ থেকে শীতল বস্তুর দিকে শক্তির প্রবাহ ঘটে। শক্তির রূপান্তর ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুটি বস্তু সমান তাপমাত্রা বিশিষ্ট হয় অথবা দুটির মধ্যে সংযোগ ছিন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরকে উত্তপ্ত করার জন্য পরিবহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর সংস্পর্শে আসা বায়ু উষ্ণ হয়ে উল্লম্ব প্রবাহে উপরে উঠে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে তাপ সঞ্চালন করে। বায়ুমণ্ডলের এই উল্লম্ব উষ্ণায়নের প্রক্রিয়াকে পরিচলন (*convection*) বলে। শক্তির এইরূপ রূপান্তর বা স্থানান্তর শুধুমাত্র ট্রপোস্ফিয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে। বায়ুর অনুভূমিক চলন দ্বারা তাপের রূপান্তর বা

স্থানান্তরকে বায়ু সঞ্চালন (*advection*) বলে। বায়ুর উল্লম্ব সঞ্চালন অপেক্ষা অনুভূমিক সঞ্চালন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য অক্ষাংশে দৈনন্দিন আবহাওয়ায় আসা দৈনিক (দিন ও রাত্রি) পরিবর্তন শুধুমাত্র সঞ্চালন প্রক্রিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষত উত্তর ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত স্থানীয় বায়ু 'লু' এই সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ফলেই হয়।

পার্থিব বিকিরণ (Terrestrial Radiation) :

পৃথিবীতে আগত সৌর বিকিরণ ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে আসে এবং ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। পৃথিবী উত্তপ্ত হবার পর নিজেই বিকিরিত পিণ্ড হয়ে বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘ তরঙ্গরূপে শক্তি বিকিরণ করে। এই শক্তি বায়ুমণ্ডলকে নীচ থেকে উত্তপ্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে পার্থিব বিকিরণ বলে।

দীর্ঘ তরঙ্গ বিকিরণ বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন গ্যাস বিশেষত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস (green house gas) দ্বারা শোষিত হয়। এভাবে বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠীয় বিকিরণ দ্বারা পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়। তদুপরি বায়ুমণ্ডলও মহাকাশে তাপ বিকিরণ ও সঞ্চালন করে। পরিশেষে, সূর্য থেকে গৃহীত মোট তাপ মহাকাশে ফিরে যায়। এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা স্থির থাকে।

পৃথিবীর তাপীয় বাজেট (Heat Budget of the Planet Earth) :

চিত্র 9.2 এ পৃথিবীর তাপীয় বাজেট দেখানো হয়েছে। পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে তাপ সঞ্চয় করে না আবার পরিত্যাগও করে না। পৃথিবী তার তাপমাত্রা বজায় রাখে। এটি তখনই সম্ভব হয় যখন সৌর বিকিরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাপের পরিমাণ এবং পার্থিব বিকিরণের দ্বারা পরিত্যক্ত তাপের পরিমাণ সমান হয়।

ধরা যাক, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে গৃহীত সৌর বিকিরণের পরিমাণ 100 শতাংশ। বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হবার সময় কিছু পরিমাণ শক্তি প্রতিফলিত, বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছুরিত হয়। শুধুমাত্র অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। মোটামুটিভাবে 35 ভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বেই পুনরায় মহাকাশে প্রতিফলিত হয়ে যায়। এর মধ্যে 27 ভাগ মেঘের ঊর্ধ্বাংশ থেকে এবং 2 ভাগ পৃথিবীর তুষার ও বরফাবৃত অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় মহাকাশে ফিরে যায়। এই প্রতিফলিত বিকিরণের পরিমাণকে পৃথিবীর অ্যালবেডো (*albedo*) বলে।

অবশিষ্ট 65 ভাগে 14 ভাগ বায়ুমণ্ডলে এবং 51 ভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত হয়। পৃথিবী দ্বারা শোষিত এই 51 ভাগ পার্থিব বিকিরণ রূপে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে 17 ভাগ প্রত্যক্ষভাবে মহাকাশে বিকিরিত হয় এবং অবিশিষ্ট 34 ভাগ বায়ুমণ্ডল শোষণ করে (6 ভাগ বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শোষিত হয়, 9 ভাগ পরিচলন ও ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা এবং 19 ভাগ ঘনীভবনের লীনতাপ দ্বারা)। বায়ুমণ্ডলে শোষিত 48 ভাগ ও (14 ভাগ সৌর বিকিরণ থেকে + 34 ভাগ পার্থিব বিকিরণ থেকে) পুনরায় মহাকাশে ফিরে যায়। অতএব, পৃথিবী এবং বায়ুমণ্ডল থেকে মহাকাশে প্রত্যাবর্তিত মোট বিকিরণ হচ্ছে যথাক্রমে 17 ও 48। যার যোগফল হচ্ছে 65। প্রত্যাবর্তিত এই

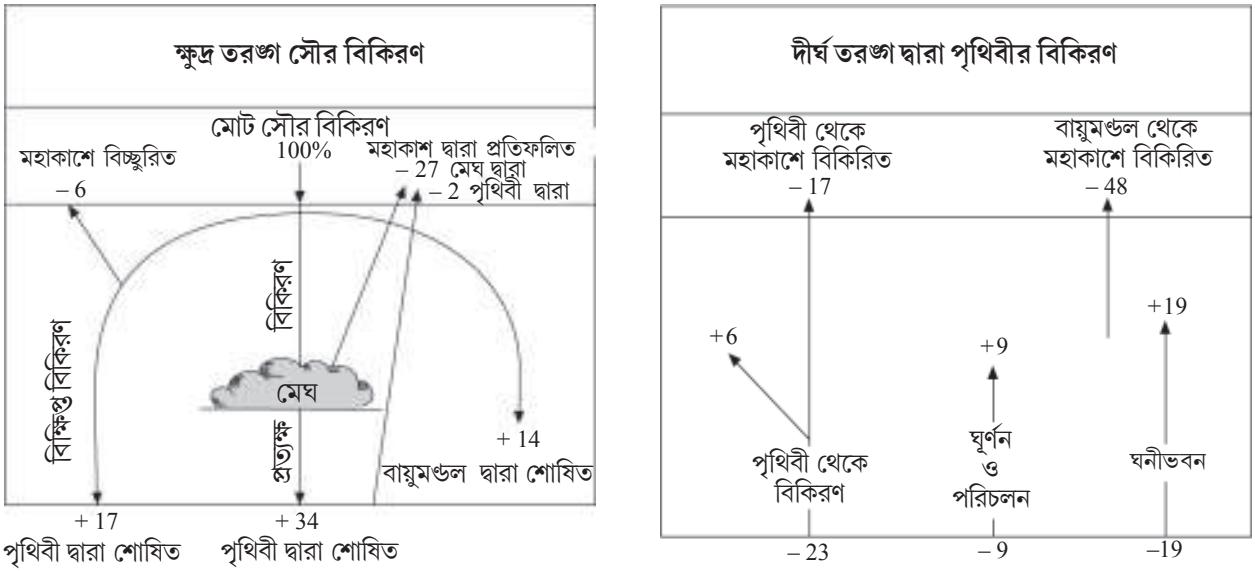

চিত্র **9.2 : পৃথিবীর তাপীয় বাজেট**

65 ভাগ তাপ ঐ 65 ভাগ তাপের সমান যা সূর্য থেকে গ্রহণ করা হয়। একেই পৃথিবীর তাপীয় বাজেট অথবা তাপীয় সমতা বলা হয়।

এই কারণেই শক্তির এত বিশাল স্থানান্তরণ সত্ত্বেও পৃথিবী বেশি উষ্ণও হয় না আবার শীতলও হয়ে পড়ে না।

পৃথিবীপৃষ্ঠের মোট তাপীয় বাজেটে ভিন্নতা (*Variation in the Net Heat Budget at the Earth's Surface*) :

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে গৃহীত বিকিরণের পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে। পৃথিবীর কিছু অংশে বিকিরণ অত্যধিক হয় এবং কিছু অংশে বিকিরণে ঘাটতি রয়েছে।

চিত্র 9.3 এ বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়ার অক্ষাংশগত ভিন্নতায় পৃথিবীর মোট বিকিরণের সমতাকে দেখানো হয়েছে। চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে 40 ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে মোট বিকিরণ অত্যধিক এবং মেরু অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত অঞ্চলসমূহ বিকিরণের পরিমাণ কম। উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে অত্যধিক তাপ মেরুর দিকে পুনঃবন্টিত হয় ফলস্বরূপ উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে তাপ সঞ্চালনের কারণে অধিক উষ্ণ হয়ে যায় না আবারও উচ্চ অক্ষাংশে তাপের অত্যধিক ঘাটতির কারণে স্থায়ীভাবে হিমায়িতও (Frozen) হয় না।

তাপমাত্রা (Temperature) :

ভূ-পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের মিথস্ক্রিয়ার ফলে উত্তাপ সৃষ্টি হয় যা তাপমাত্রারূপে মাপা হয়। যেখানে তাপ বলতে কোনো পদার্থের

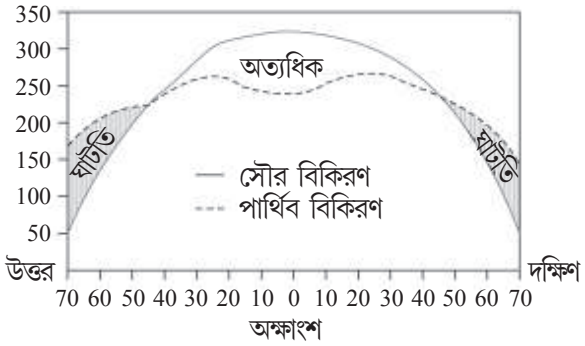

চিত্র 9.3 : মোট বিকিরণের সমতার অক্ষাংশগত পরিবর্তন

আণবিক গতিকে বোঝায় সেখানে তাপমাত্রা বলতে কোনো বস্তু বা স্থান কতটুকু উষ্ণ বা শীতল তা মাপা হয় ডিগ্রিতে।

তাপমাত্রা বণ্টনের নিয়ন্ত্রকসমূহ (*Factors Controlling Temperature Distribution*) :

কোনো স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা নিম্নলিখিত কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যথা - (i) স্থানটির অক্ষাংশ (ii) স্থানটির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা (iii) সমুদ্র থেকে দূরত্ব - বায়ুপুঞ্জের সঞ্চালন (iv) উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের উপস্থিতি (v) স্থানীয় বিষয়।

অক্ষাংশ (*The latitude*) : কোনো স্থানের তাপমাত্রা ঐ স্থানের গৃহীত সৌর বিকিরণের উপর নির্ভর করে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অক্ষাংশ অনুসারে সৌর বিকিরণের তারতম্য লক্ষ করা যায়। এ কারণেই তাপমাত্রার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

উচ্চতা (*The altitude*) : বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর পার্থিব বিকিরণ দ্বারা পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়। সেজন্যই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ স্থানে অবস্থিত স্থানসমূহের তুলনায় সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটে অবস্থিত স্থানসমূহে তাপমাত্রা অধিক হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণত উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে উষ্ণতা হ্রাস পায়। উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার হারকে **সাধারণ তাপ হ্রাস** (normal lapse rate) বলে। সাধারণত প্রতি 1,000 মিটার উচ্চতায় 6.5°C তাপের হ্রাস হয়।

সমুদ্র থেকে দূরত্ব (*Distance from the sea*) : আরেকটি কারণ যা কোনো স্থানের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে তা হল সমুদ্র থেকে ওই স্থানটির দূরত্ব। স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্র ধীরে ধীরে গরম হয় এবং ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়। স্থলভাগ দ্রুত গরম হয় এবং ঠান্ডাও হয় দ্রুত। সে কারণেই, স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্রে তাপমাত্রার ভিন্নতা বা পার্থক্য কম থাকে। সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানসমূহে সমুদ্র এবং স্থলবায়ুর মিলিত প্রভাব পড়ে যা তাপমাত্রাকে সমভাবাপন্ন রাখে।

বায়ুপুঞ্জ এবং সমুদ্রস্রোত (*Air-mass and Ocean currents*) : স্থল এবং সমুদ্রবায়ুর মতো বায়ুপুঞ্জের চলাচলও তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের অন্তর্গত স্থানসমূহে উচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতল বায়ুপুঞ্জের অন্তর্গত স্থানসমূহে তাপমাত্রা কম পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে শীতল সমুদ্রস্রোতের অন্তর্গত উপকূলবর্তী স্থানসমূহের তুলনায় উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের অন্তর্গত উপকূলবর্তী স্থানসমূহে তাপমাত্রা অধিক থাকে।

তাপমাত্রার বণ্টন (*Distribution of Temperature*) :

জানুয়ারি এবং জুলাই-এর তাপমাত্রা বণ্টন অধ্যয়ন করে, আমরা বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বণ্টন সম্বন্ধে বুঝতে পারি। মানচিত্রে

তাপমাত্রার বণ্টন সাধারণত সমোষ্ণরেখার মাধ্যমে দেখানো হয়। সমোষ্ণরেখা হচ্ছে ওই রেখা যা সমান তাপমাত্রাবিশিষ্ট স্থানসমূহকে একসাথে সংযুক্ত করে পাওয়া যায়। চিত্র 9.4 (a) এবং (b)-এ জানুয়ারি এবং জুলাই মাসের ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রাকে দেখানো হয়েছে।

সাধারণত তাপমাত্রার উপর অক্ষাংশের প্রভাব মানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কারণ সমোষ্ণরেখাগুলো প্রধানত অক্ষাংশের সমান্তরালে হয়। এই সাধারণ প্রবণতা থেকে বিসরণ বা বিচ্যুতি বিশেষত উত্তর গোলার্ধে জুলাই মাসের তুলনায় জানুয়ারি মাসে অধিক সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ অধিক। তাই এখানে ভূমিভাগ এবং সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সুস্পষ্ট। জানুয়ারিতে সমোষ্ণরেখাসমূহ মহাসাগরে উত্তর দিকে এবং মহাদেশে দক্ষিণ দিকে বিসরিত বা বিচ্যুত হয়ে যায়। এটি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে দেখা যেতে পারে। উষ্ণ সমুদ্রস্রোত, উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream) এবং উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর অধিক উষ্ণ থাকে তথা সমোষ্ণরেখাসমূহ উত্তর দিকে বেঁকে যায়। স্থলভাগে তাপমাত্রা দ্রুতহারে হ্রাস পায় এবং ইউরোপে সমোষ্ণরেখাগুলো দক্ষিণ দিকে বেঁকে যায়।

সাইবেরিয়া সমভূমিতে এটি আরও সুস্পষ্ট। 60° পূ দ্রাঘিমার সাথে সাথে 40° উত্তর ও 50° উত্তর অক্ষাংশে জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা 20° C (সেলসিয়াস) পাওয়া যায়। জানুয়ারিতে গড় মাসিক তাপমাত্রা নিরক্ষীয় সমুদ্রে 27° C-এর অধিক, ক্রান্তীয় অঞ্চলে 24° C-এর অধিক; মধ্য অক্ষাংশে 2°C থেকে 0° C তথা ইউরেশিয়ার মহাদেশীয় অর্ন্তভাগে তাপমাত্রা –18°C থেকে –48°C দেখা যায়।

দক্ষিণ গোলার্ধে সমুদ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে সমোষ্ণ রেখাগুলি কমবেশি অক্ষাংশের সমান্তরালে অবস্থান করে এবং উত্তর গোলার্ধের তুলনায় তাপমাত্রাগত পার্থক্য কম পরিলক্ষিত হয়। 20° C, 10° C এবং 0° C সমোষ্ণরেখাসমূহ যথাক্রমে 35° দক্ষিণ, 45° দক্ষিণ এবং 60° দক্ষিণ অক্ষাংশের সমান্তরালে অবস্থান করে।

জুলাই মাসে সমোষ্ণরেখাসমূহ সাধারণত অক্ষাংশের সমান্তরালে দেখতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় বা বিষুবীয় সমুদ্রে তাপমাত্রা 27°C-এর অধিক পরিলক্ষিত হয়। এশিয়ার উপক্রান্তীয়

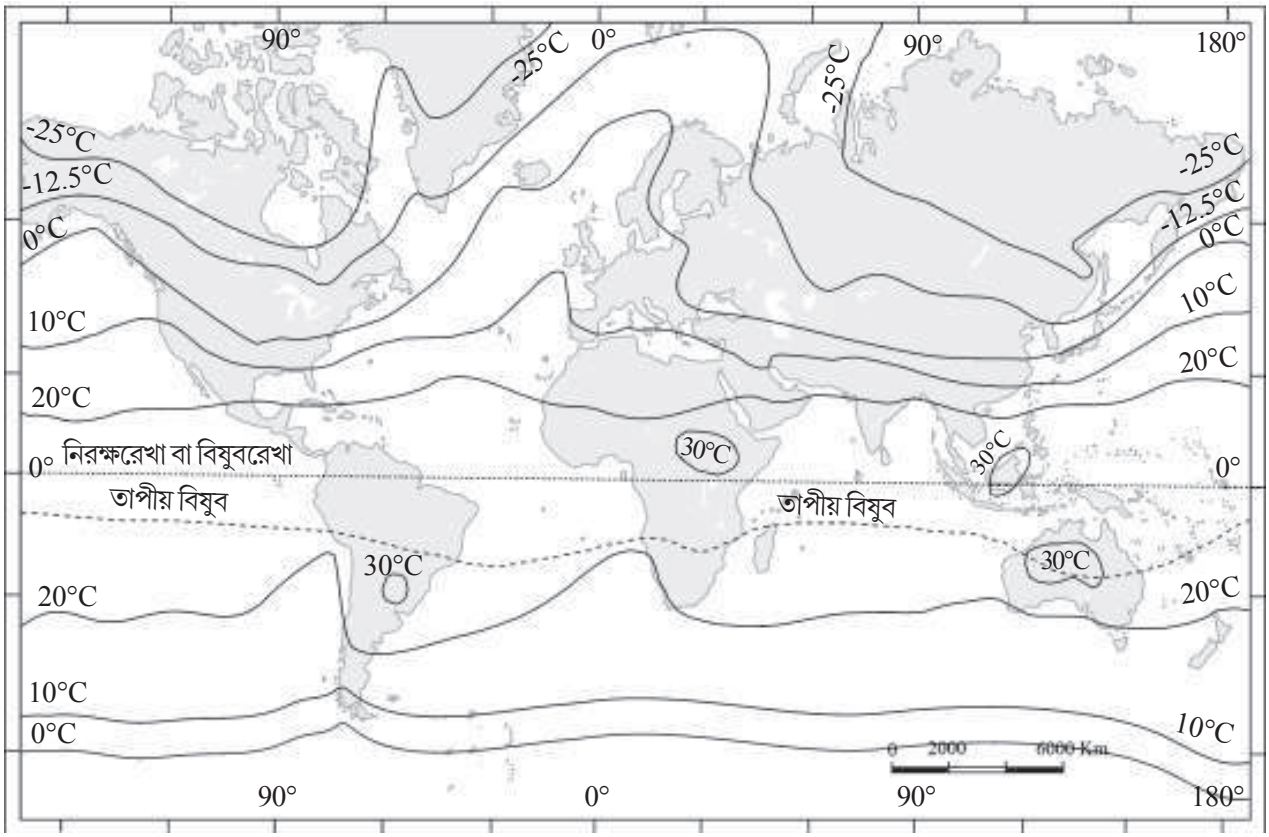

চিত্র 9.4 (a) : জানুয়ারি মাসে পৃষ্ঠদেশীয় বায়ুর তাপমাত্রার বণ্টন

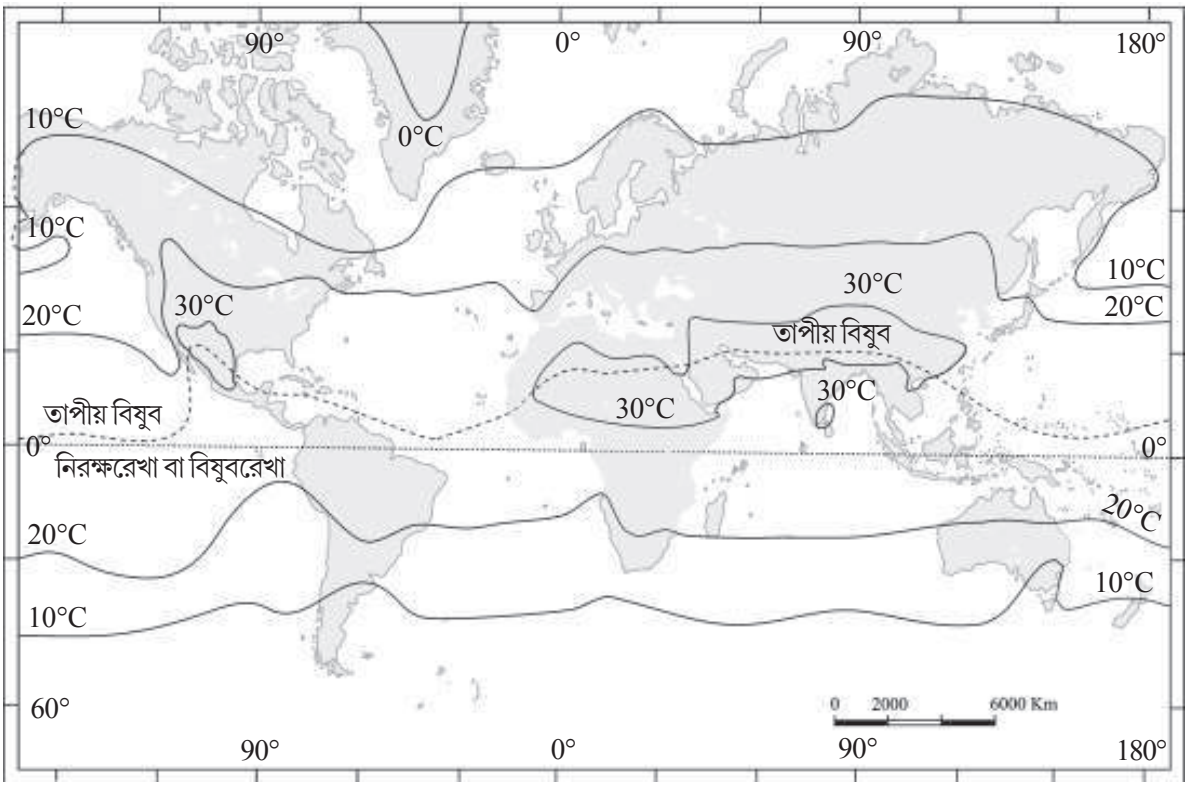

চিত্র **9.4 (b) :** জুলাই মাসে পৃষ্ঠদেশীয় বায়ুর তাপমাত্রার বণ্টন

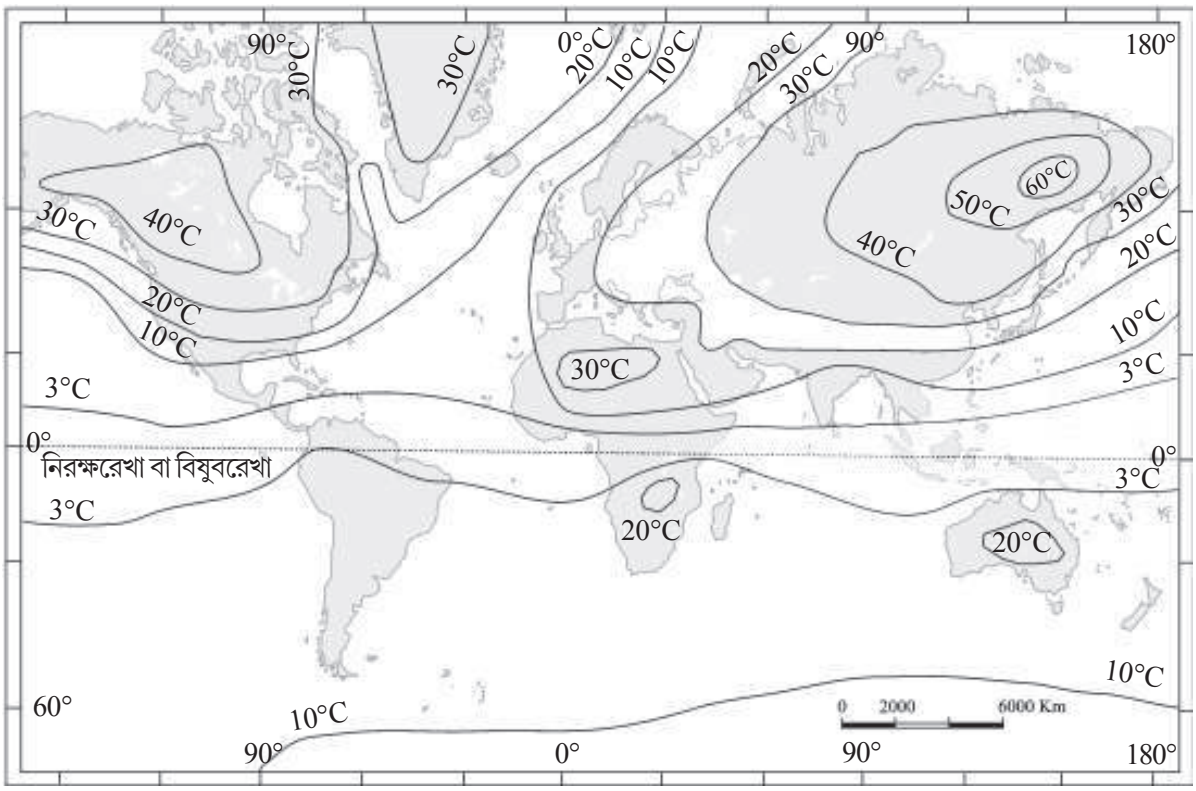

চিত্র **9.5 :** জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে তাপমাত্রার প্রসর

মহাদেশীয় অঞ্চলের স্থলভাগের 30° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর তাপমাত্রা 30°C-এর অধিক লক্ষ করা যায়। 40° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর সমোষ্ণরেখা 10° C এবং 40° দক্ষিণ অক্ষাংশে তাপমাত্রা 10° C পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র 9.5 এ জানুয়ারি এবং জুলাই মাসের তাপমাত্রার প্রসর দেখানো হয়েছে। সর্বাধিক তাপমাত্রার প্রসর ইউরেশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে পরিলক্ষিত হয় যা 60^0C-এর অধিক। এর মূল কারণ হচ্ছে 'মহাদেশীয়তা' (continentality)। সবচেয়ে কম তাপমাত্রার প্রসর যা 3°C যা 20° দক্ষিণ এবং 15° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

তাপমাত্রার বৈপরীত্য (Inversion of Temperature) :

সাধারণত উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। একে স্বাভাবিক তাপমাত্রা হ্রাসের হার বলে। কিন্তু কোনো কোনো সময় এই অবস্থার বিপরীতও হয় এবং স্বাভাবিক তাপ হ্রাসের হার বিপরীত হয়ে যায়। একে তাপমাত্রার বৈপরীত্য বলে। বৈপরীত্য সাধারণত অল্প সময়ের জন্য হয় কিন্তু এটি খুবই সামান্য ঘটনা। এক দীর্ঘ শীতকালীন মেঘমুক্ত রাত এবং শান্ত বায়ু বৈপরীত্যের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি। দিনে প্রাপ্ত তাপ রাতে বিকিরিত হয়ে যায় এবং ভোরের দিকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ু তুলনামূলক অধিক শীতল হয়ে পড়ে। মেরু অঞ্চলে সারা বছর জুড়ে তাপমাত্রার বৈপরীত্য এক সামান্য ঘটনা।

ভূ-পৃষ্ঠীয় বৈপরীত্য বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে স্থিরতা বৃদ্ধি করে। ধোঁয়া ও ধূলিকণা বৈপরীত্য স্তরের নীচে একত্রিত হয়ে অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে শীতকালে সকালে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়, যা খুবই সাধারণ ঘটনা। এই বৈপরীত্য কিছু ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হয়; সূর্য উদয় হওয়ার পর এবং পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এই বৈপরীত্য শেষ হয়ে যায়। পাহাড় ও পর্বত অঞ্চলে বায়ু ভালোভাবে নিষ্কাশিত হওয়ার কারণে বৈপরীত্য সংঘটিত হয়। পাহাড় ও পর্বতে রাতের বেলায় সৃষ্টি হওয়া শীতল বায়ু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। ভারী এবং ঘন হওয়ার কারণে শীতল বায়ু প্রায় জলের মতো আচরণ করে এবং ঢাল বরাবর নীচে এসে গহ্বর এবং উপত্যাকার নীচে উষ্ণ বায়ুর নীচে গভীরভাবে স্তূপীকৃত হয়। একে **বায়ু নিষ্কাশন** (*air drainage*) বলে। এটি উদ্ভিদকে তুষারপাত জনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

- প্ল্যাঙ্ক-এর নীতি বিবৃতি করে যে, একটি বস্তু যতই উত্তপ্ত বা গরম হবে তা তত বেশি শক্তি বিকিরিত করবে এবং ওই বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ততই কম হবে।
- আপেক্ষিক তাপ হল এক গ্রাম পদার্থের তাপমাত্রা এক সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় শক্তি।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর বাছাই করো :

(i) নিম্নে বর্ণিত কোন্ অক্ষাংশের ওপর 21 জুন দুপুরে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়?

(a) নিরক্ষরেখায় (c) 23.5° উত্তর

(b) 23.5° দক্ষিণ (d) 66.5° উত্তর

(ii) নিম্নলিখিত শহরগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম দিন কোথায় দেখা যায়?

(a) তিরুবনন্তপুরম (c) হায়দ্রাবাদ

(b) চণ্ডীগড় (d) নাগপুর

(iii) নিম্নলিখিত কোন্ প্রক্রিয়া দ্বারা বায়ুমণ্ডল মুখ্যত উত্তপ্ত হয়?

(a) ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৌর বিকিরণ (c) দীর্ঘ তরঙ্গ পার্থিব বিকিরণ

(b) প্রতিফলিত সৌর বিকিরণ (d) বিক্ষিপ্ত সৌর বিকিরণ

(iv) নিম্নলিখিত দুটি স্তম্ভের মধ্যে সঠিক জোড়া মেলাও :

(i) বিকিরণ	(a) উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রার পার্থক্য।
(ii) অ্যালবেডো	(b) সমান তাপমাত্রাযুক্ত স্থানসমূহকে যুক্তিকরণের রেখা।
(iii) সমোষ্ণরেখা	(c) আগত সৌর বিকিরণ।
(iv) বার্ষিক প্রসর	(d) একটি বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত দৃশ্যমান আলোর শতকরা হার।

(v) পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় উত্তর গোলার্ধের উপক্রান্তীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা অধিক হওয়ার মূল কারণ :

(a) নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষা উপক্রান্তীয় অঞ্চলে মেঘাচ্ছন্নতা কম থাকে।

(b) উপক্রান্তীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দিনের দৈর্ঘ্য নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বেশি হয়।

(c) উপক্রান্তীয় অঞ্চলে 'গ্রিনহাউস প্রভাব' নিরক্ষীয় অঞ্চল অপেক্ষা বেশি থাকে।

(d) উপক্রান্তীয় অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত।

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর কমপক্ষে 30টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) পৃথিবীর উপর স্থান ও কালভেদে তাপমাত্রার অসম বণ্টন কীভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে?

(ii) ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রা বণ্টনের নিয়ন্ত্রকসমূহ কী কী?

(iii) ভারতে মে মাসে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে কিন্তু উত্তরায়ণের পর তাপমাত্রা অধিক থাকে না। কেন?

(iv) সাইবেরিয়া সমভূমিতে বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর অধিক থাকে কেন?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর কমপক্ষে 150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) অক্ষাংশ এবং পৃথিবীর নিজ অক্ষের হেলানো অবস্থা কীভাবে ভূপৃষ্ঠে গৃহীত বিকিরণের মাত্রাকে প্রভাবিত করে?

(ii) পৃথিবী তথা এর বায়ুমণ্ডল কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপীয় সমতা বজায় রাখে তা আলোচনা করো।

(iii) জানুয়ারি মাসে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার বণ্টনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

তুমি তোমার শহরে অথবা শহরের নিকটে অবস্থিত একটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার নির্বাচন করো। পর্যবেক্ষণাগারের জলবায়ু সম্বন্ধীয় সারণিতে দেওয়া তাপমাত্রা বিষয়ক তথ্যকে তালিকাবদ্ধ করো।

(i) পর্যবেক্ষণাগারের উচ্চতা, অক্ষাংশ এবং সেই সময়কাল নির্ণয় করো যে সময়ে গড় গণনা করা হয়েছে।

(ii) সারণিতে দেওয়া তাপমাত্রা সম্বন্ধীয় শব্দসমূহের সংজ্ঞা নিরূপণ করো।

(iii) এক মাসের প্রতিটি দিনের তাপমাত্রার গড় গণনা করো।

(iv) একটি লেখচিত্রে (graph) তাপমাত্রার সর্বোচ্চ দৈনিক গড়, সর্বনিম্ন দৈনিক গড় এবং গড় তাপমাত্রাকে অঙ্কন করো।

(v) বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর গণনা করো।

(vi) কোন্ কোন্ মাসে দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তা বের করো।

(vii) কোনো স্থানের তাপমাত্রা নির্ধারণকারী কারণসমূহ এবং জানুয়ারি, মে, জুলাই ও অক্টোবর মাসে তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণসমূহ তালিকাভুক্ত করো।

উদাহরণ

পর্যবেক্ষণাগার	:	নতুন দিল্লি (সফদরজং)
অক্ষাংশ	:	28°35′ উত্তর
পর্যবেক্ষণ-এর সময়কাল	:	1951 - 1980
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা	:	216 মিটার

মাস	দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় (°C)	দৈনিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় (°C)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)
জানুয়ারি	21.1	7.3	29.3	0.6
মে	39.6	25.9	47.2	17.5

এক মাসের দৈনিক তাপমাত্রার গড়

জানুয়ারি $\frac{21.1+7.3}{2} = 14.2^{\circ}C$

মে $\frac{39.6+25.9}{2} = 32.75^{\circ}C$

বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর

মে মাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা - জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা

বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর = 32.75°C – 14.2°C = 18.55°C

অধ্যায়

10

বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন এবং আবহাওয়াগত প্রক্রিয়াসমূহ

Atmospheric Circulation and Weather Systems

পূর্বে নবম অধ্যায়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রার অসমবণ্টন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বায়ু উষ্ণতায় প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডায় সংকুচিত হয়। এটি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বৈচিত্র্যের ফলাফল। ফলস্বরূপ বায়ু গতিশীল হয় এবং উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর গতি পরিবর্তিত হয়। তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে, অনুভূমিক গতিতে প্রবাহিত বায়ু হল বাতাস। বায়ুর উত্থান বা অবনমন বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে নির্ধারিত করে। বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তাপ ও আর্দ্রতা পুনঃবণ্টিত হয়, যার ফলে সারা পৃথিবীর অবিরত তাপমাত্রা বজায় থাকে। আর্দ্র বায়ু ওপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে মেঘ গঠন করে এবং অধঃক্ষেপণরূপে নেমে আসে। এই অধ্যায়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পার্থক্যের কারণ, বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়, বায়ুর ঘূর্ণন পদ্ধতি, বায়ুপুঞ্জের গঠন, বিভিন্ন বায়ুপুঞ্জের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বিপদজনক আবহাওয়া এবং বিধ্বংসী ক্রান্তীয় ঝড় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure) :

তোমরা কি জান যে আমাদের শরীর বায়ুচাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়? যদি কেউ উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর চাপ কমতে থাকে। এর ফলে তার শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (atmospheric pressure) বলতে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত এক একক ক্ষেত্রফলে বায়ুস্তম্ভের ভরকে (weight) বোঝায়। বায়ুচাপের একককে পাসক্যাল (Pascal বা Pa) দ্বারা বা মিলিবার (Milibar) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হল 1,013.2 মিলিবার। মাধ্যাকর্ষণের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের কাছে বায়ুর ঘনত্ব বেশি হয় এবং তাই উচ্চ চাপ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু চাপ একটি পারদ (mercury) ব্যারোমিটার (Barometer) বা অ্যানোয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid barometer) এর সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য ব্যাবহারিক ভূগোল - ভাগ 1 (NCERT, 2006) বইটি দেখো এবং এই যন্ত্রগুলো সম্পর্কে শেখো। বায়ুচাপ উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়। একই উচ্চতাবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানে বায়ুচাপের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং এই বিভিন্নতাই বায়ুর গতিশীলতার প্রধান কারণ, যেমন - বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

বায়ুচাপের উল্লম্ব পরিবর্তন (Vertical Variation of Pressure) :

নিম্ন বায়ুমণ্ডলে বায়ুচাপ উচ্চতার বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুত হ্রাস পায়। উচ্চতা প্রতি 10 মিটার বৃদ্ধিতে বায়ুচাপের হ্রাসের পরিমাণ প্রায় 1 mb হয়। এটা সবসময় একই হারে হ্রাস পায় না। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় একটি আদর্শ বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ এবং তাপমাত্রাকে সারণি 10.1-এ দেখানো হল।

সারণি 10.1 : নির্দিষ্ট স্তরে প্রমাণ চাপ এবং তাপমাত্রা

স্তর	চাপ (*mb*)	তাপমাত্রা (°*C*)
সমুদ্রস্তর	1,013.25	15.2
1 km	898.76	8.7
5 km	540.48	–17. 3
10 km	265.00	– 49.7

উল্লম্ব বায়ুচাপের ঢালের প্রভাব অনুভূমিক বায়ুচাপের ঢাল অপেক্ষা অনেক বেশি হয়। কিন্তু এর বিপরীত দিকে কার্যকর মাধ্যাকর্ষীয় বল দ্বারা এর ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই, ঊর্ধ্বগামী বায়ু অধিক শক্তিশালী হয় না।

অনুভূমিক চাপের বণ্টন (Horizontal Distribution of Pressure) :

বায়ুর দিক এবং গতিবেগের পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুচাপের মধ্যে ছোটো একটি পার্থক্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বায়ুচাপের অনুভূমিক

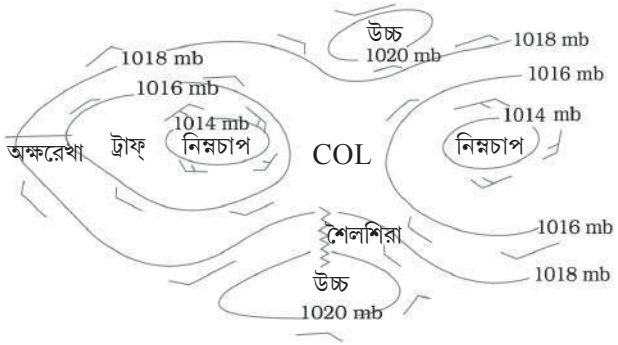

চিত্র **10.1** : উত্তর গোলার্ধে সমপ্রেষ রেখা, বায়ুচাপ এবং বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়া

বণ্টন অপরিবর্তনীয় স্তরে সমপ্রেষরেখা বা সমচাপ রেখা (Isobar) অঙ্কনের দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়। সমপ্রেষরেখা হল এমন কতগুলো রেখা যা সমচাপযুক্ত অঞ্চলসমূহকে যুক্ত করে। বায়ুচাপের উপর উচ্চতাগত প্রভাবকে দূর করার জন্য এবং তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো স্টেশনে সমুদ্রতলের স্তর থেকে কমিয়ে বায়ুচাপকে পরিমাপ করা হয়। সমুদ্রতলের ওপর বায়ুচাপের বণ্টন আবহাওয়ার মানচিত্রে দেখানো হয়।

চিত্র 10.1-এ বিভিন্ন বায়ুচাপ পরিস্থিতিতে সমপ্রেষ রেখা বা সমচাপ রেখার (isobars) আকৃতিকে দেখানো হয়েছে। নিম্নচাপ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রটি এক বা একাধিক নিম্নচাপযুক্ত সমচাপ রেখা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উচ্চচাপ প্রক্রিয়ায় (High pressure system) কেন্দ্রটি এক বা একাধিক উচ্চচাপযুক্ত সমচাপ রেখা দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

সমুদ্রতলে বায়ুচাপের বিশ্ববণ্টন (World Distribution of Sea Level Pressure) :

জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে সমুদ্রতলে বায়ুচাপের বিশ্ববণ্টন চিত্র 10.2 এবং 10.3-এ দেখানো হয়েছে। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি সমুদ্রতলের বায়ুচাপ কম হওয়ায় অঞ্চলটি নিরক্ষীয় নিম্নচাপ (Equatorial Low) হিসাবে পরিচিত হয়। 30° উত্তর এবং

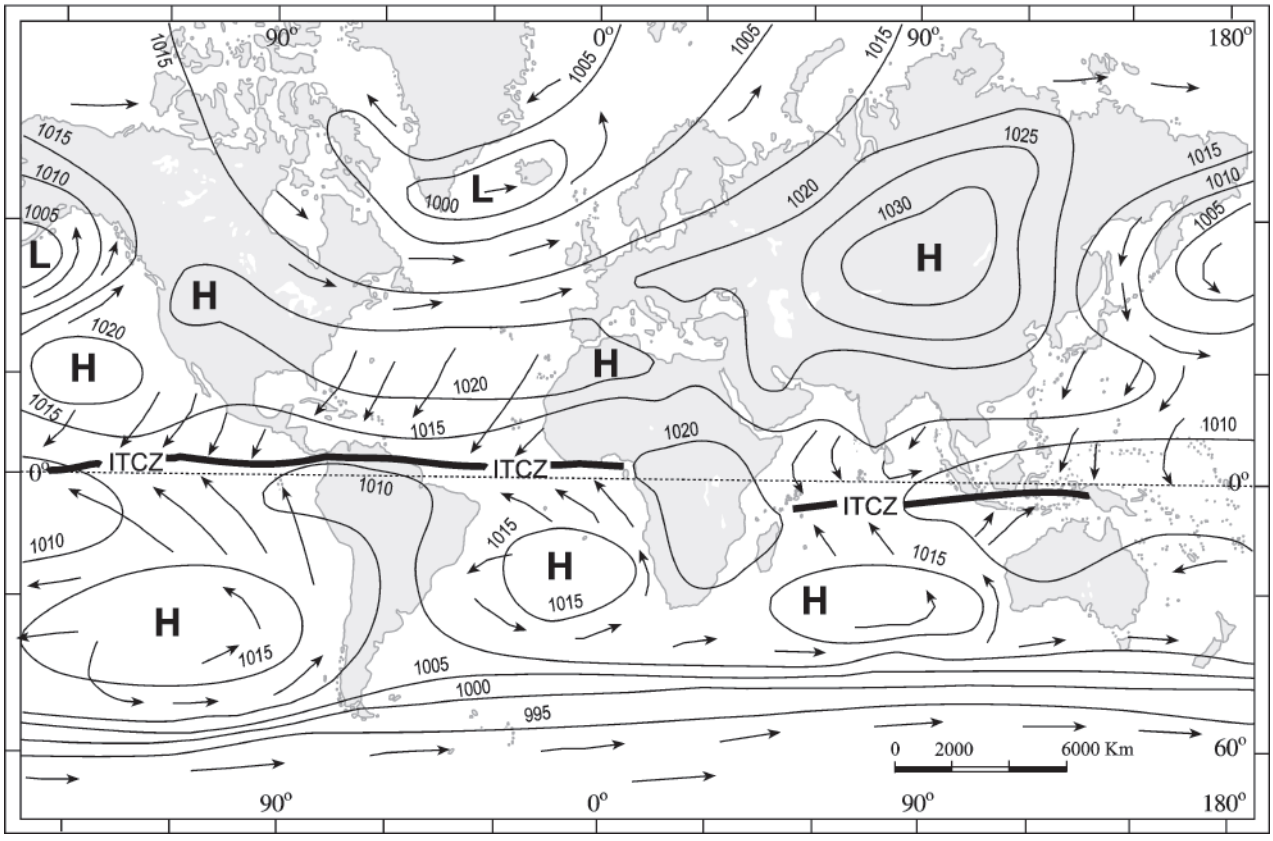

চিত্র **10.2** : বায়ুচাপের বণ্টন (মিলিবারে) - জানুয়ারি

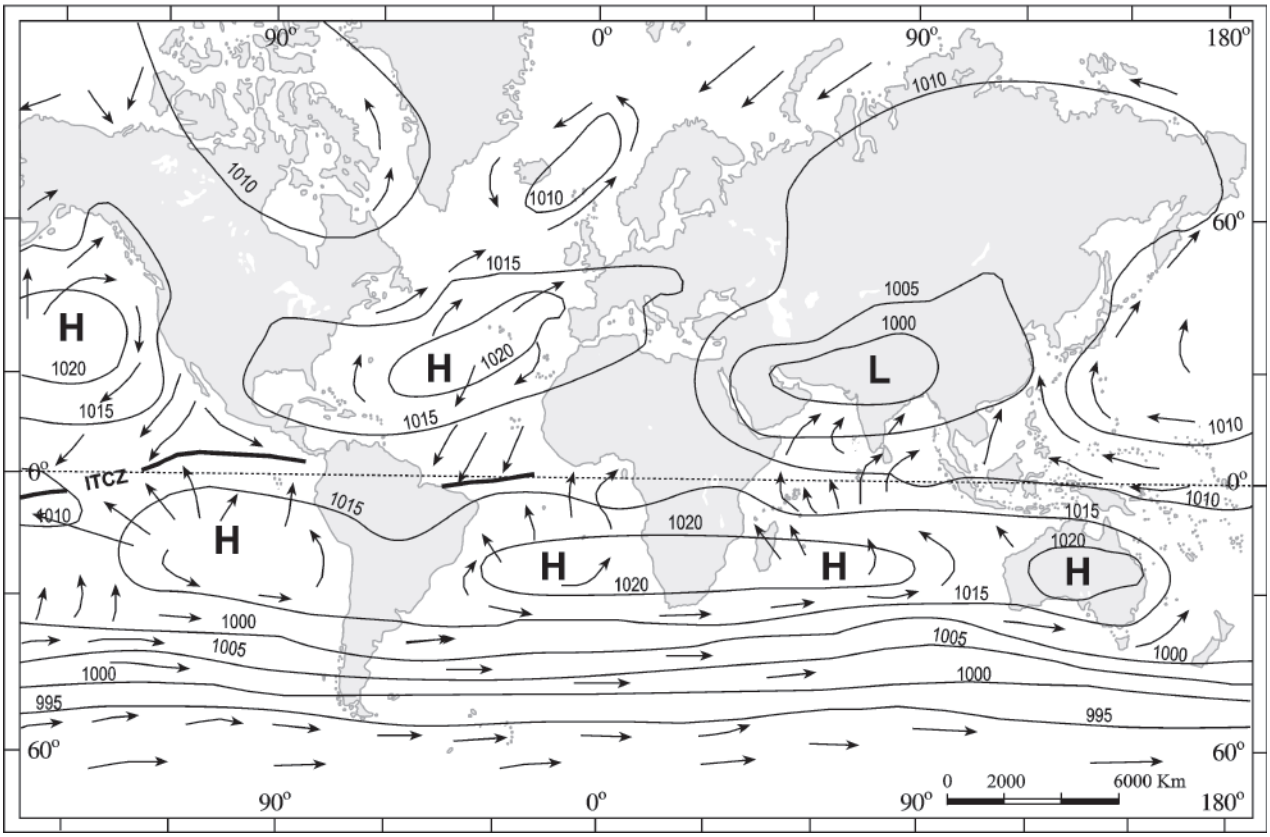

চিত্র **10.3** : বায়ুচাপের বণ্টন (মিলিবারে) - জুলাই

30° দক্ষিণ অক্ষাংশে উচ্চ চাপ অঞ্চল দেখা যায় বলে এই উচ্চ চাপযুক্ত অঞ্চলগুলোকে **উপ-ক্রান্তীয় উচ্চচাপ** (Subtropical highs) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আবার মেরুপ্রদেশের দিকে 60^0 উ. এবং 60^0 দ. অক্ষাংশের নিম্নচাপ বলয়গুলোকে **মেরুদেশীয় নিম্নচাপ বলয়** (Subpolar lows) বলা হয়। মেরুপ্রদেশের নিকটে বায়ুচাপ উচ্চ হলে তখন এটি **মেরুবৃত্তীয় উচ্চচাপ** (Polar high) হিসাবে পরিচিত হয়। এই চাপবলয়গুলো অস্থায়ী প্রকৃতির। এগুলো সূর্যের আপাত গতি দ্বারা আন্দোলিত হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতকালে এগুলো দক্ষিণ দিকে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হয়।

বায়ুর গতিবেগ এবং দিক নিরূপণে প্রভাবকারী বলসমূহ (Forces Affecting the Velocity and Direction of Wind) :

তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছ যে, বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বিভিন্নতার কারণে বায়ু গতিশীল হয়। এইপ্রকার গতিশীল বায়ুকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ধরাতলের বিভিন্নতার কারণে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। এছাড়া পৃথিবীর আবর্তন গতি ও বায়ুপ্রবাহের গতিকে (wind movement) প্রভাবিত করে। পৃথিবীর আবর্তনজনিত বল যা কোরিওলিস বল (Coriolis force) নামে পরিচিত। সুতরাং, ভূ-পৃষ্ঠের নিকটে অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ তিনটি বলের সমন্বয়জনিত ফল। এগুলো হল — বায়ুচাপের ঢালজনিত বল (pressure gradient force), ঘর্ষণজনিত বল (frictional force) এবং কোরিওলিস বল (Coriolis force)। এছাড়া, মহাকর্ষীয় বল (gravitational force) বায়ুপ্রবাহকে নিম্নমুখী করে।

বায়ুচাপের ঢালজনিত বল (Pressure Gradient Force):

বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ভিন্নতা একটি বল (force) উৎপন্ন করে। দূরত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাপের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় **বায়ুচাপের ঢাল** (pressure gradient)। বায়ুচাপের ঢাল শক্তিশালী হয় যেখানে সমচাপ রেখাগুলো (isobars) একে অপরের কাছাকাছি থাকে এবং দুর্বল হয় যেখানে সমচাপ রেখাগুলো পরস্পরের দূরে অবস্থান করে।

ঘর্ষণজনিত বল (Frictional Force) :

এটি বায়ুর গতিকে প্রভাবিত করে। এটি পৃষ্ঠতলে সর্বাধিক হয়

এবং এর প্রভাব সাধারণত 1 থেকে 3 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর ঘর্ষণ ন্যূনতম হয়ে থাকে।

কোরিওলিস বল (Coriolis Force) :

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহের দিকের পরিবর্তন ঘটে। 1844 সালে ফরাসি পদার্থবিদ এই বল সম্পর্কে বর্ণনা দেন এবং এরপর থেকে এই বলটিকে কোরিওলিস বল (Coriolis Force) বলা হয়। এটি উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বায়ুপ্রবাহ বিক্ষিপ্ত (deflect) হয়। বায়ুর বিক্ষেপণ তখনই অধিক হয় যখন বায়ুর গতিবেগ উচ্চ থাকে। কোরিওলিস বল অক্ষাংশের কোণের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। এটি মেরুরেখায় সর্বোচ্চ হয় এবং নিরক্ষরেখায় অনুপস্থিত থাকে।

কোরিওলিস বল বায়ুচাপীয় ঢালজনিত বলের সমকোণে কাজ করে। বায়ুচাপের ঢালজনিত বল সমপ্রেষ রেখার সমকোণে থাকে। বায়ুচাপের ঢালজনিত বল (pressure gradient force) উচ্চতর হলে বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ বেশি হয় এবং বায়ুপ্রবাহের দিকের বিক্ষেপণ বৃহত্তর হয়। ফলে এই দুইটি বল একে অপরের সমকোণে অবস্থান করায় নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ু এর চারপাশে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষরেখায় কোরিওলিস বল শূন্য হয় এবং সমপ্রেষ রেখার সমকোণে প্রবাহিত হয়। নিম্নচাপ বলয়টি জোরদার হয়। এই কারণেই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় নিরক্ষরেখার নিকটে গড়ে ওঠে না।

বায়ুচাপ এবং বায়ুপ্রবাহ (Pressure and Wind) :

বায়ুর গতিবেগ এবং দিকটি হল বায়ু দ্বারা উৎপাদিত বলের মোট ফলাফল। ভূপৃষ্ঠ থেকে 2-3 কিমি. উচ্চতায় উপরের বায়ুমণ্ডলে

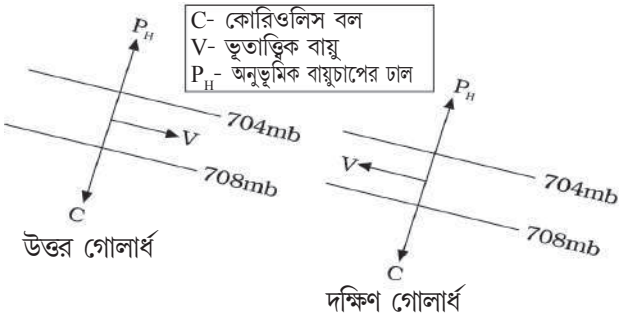

চিত্র **10.4** : ভূতাত্ত্বিক বায়ু

বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের ঘর্ষণীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে এবং প্রধানত বায়ুচাপের ঢাল এবং কোরিওলিস বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন সমপ্রেষরেখা সোজা হয় এবং কোনো ঘর্ষণের প্রভাব থাকে না, তখন বায়ুচাপের ঢালজনিত বলটি কোরিওলিস বল দ্বারা ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এর ফলে বায়ু সমপ্রেষ রেখার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু **ভূতাত্ত্বিক বায়ু (geostrophic wind)** নামে পরিচিত (চিত্র 10.4)।

নিম্নচাপ ক্ষেত্রের চারপাশে বায়ু সঞ্চালনকে **ঘূর্ণবাত সঞ্চালন (cyclonic circulation)** বলা হয়। উচ্চচাপ ক্ষেত্রে এরূপ হলে একে **প্রতীপ ঘূর্ণবাত সঞ্চালন (anti cyclonic circulation)** বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুর দিক নির্দেশনা দুই গোলার্ধে এদের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন হয় (সারণি 10.2)।

ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি অনেক সময় উচ্চচাপ বা নিম্নচাপ ক্ষেত্রের চারপাশে বায়ু সঞ্চালন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে প্রবাহিত বায়ু সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সাধারণত, নিম্নচাপ অঞ্চলের উপর বায়ু

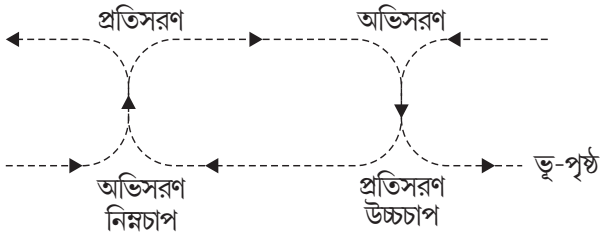

চিত্র **10.5** : বায়ুর অভিসরণ এবং প্রতিসরণ

ঘনীভূত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়। উচ্চচাপীয় অঞ্চলে উপরের বায়ু উপর থেকে নীচের দিকে অবনমিত হয় এবং পৃষ্ঠদেশে প্রতিসারিত হয় (চিত্র 10.5)। অভিসরণ (convergence) ছাড়াও কিছু প্রতিকূল স্রোত (eddies), পরিচলন স্রোত (convection currents), পর্বতের ঢাল বরাবর উত্তোলন (orographic uplift) এবং সীমান্ত (fronts) বরাবর উত্তোলনের ফলে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়, যা মেঘ এবং বৃষ্টিপাতের (precipitation) জন্য প্রয়োজনীয়।

বায়ুমণ্ডলের সাধারণ সঞ্চালন (General circulation of the atmosphere) :

নিয়ত বায়ুর (planetary winds) ধরন (pattern) অনেকাংশে নির্ভর করে : (i) বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতার অক্ষাংশগত বৈচিত্র্যের

সারণি **10.2** : ঘূর্ণবাত এবং প্রতীপ ঘূর্ণবাতে বায়ুর দিকের ধরন

বায়ুচাপের প্রক্রিয়া	কেন্দ্রে বায়ুচাপের অবস্থা	বায়ুর দিকের ধরন	
		উত্তর গোলার্ধ	দক্ষিণ গোলার্ধ
ঘূর্ণবাত	নিম্ন	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে	ঘড়ির কাঁটার দিকে
প্রতীপ ঘূর্ণবাত	উচ্চ	ঘড়ির কাঁটার দিকে	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে

উপর (ii) চাপবলয়ের (pressure belts) উপস্থিতি (iii) সূর্যের আপাত গতি অনুসরণ করে চাপ বলয়ের প্রতিস্থাপন (iv)

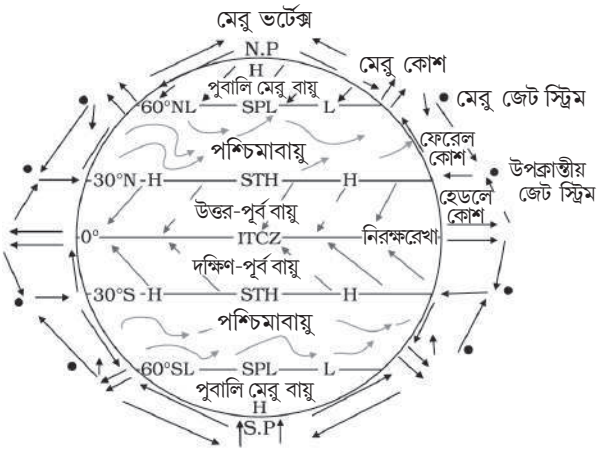

চিত্র **10.6** : বায়ুমণ্ডলের সরলীকৃত সাধারণ সঞ্চালন

মহাদেশ (continents) এবং মহাসাগরের (oceans) বণ্টন (v) পৃথিবীর আবর্তন। নিয়ত বায়ুর গতির (movement) প্রক্রিয়াকে **বায়ুমণ্ডলের সাধারণ সঞ্চালন (general circulation of the atmosphere)** বলে। বায়ুমণ্ডলের সাধারণ সঞ্চালন সমুদ্রের জলরাশিকে গতিশীল করে তোলে যা পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সাধারণ সঞ্চালনের পরিকল্পিত বর্ণনা চিত্র 10.6-এ প্রদর্শিত হয়।

বায়ু আন্তঃক্রান্তীয় সম্মিলন অঞ্চলে (Inter Tropical Convergence Zone - ITCZ) উচ্চ সৌর বিকিরণ (insolation) এবং নিম্নচাপ সৃষ্টি করে পরিচলনের ফলে ওপরে উঠে যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলে ঘনীভূত হয়। ঘনীভূত বায়ু পরিচলন কোশ (convective cell) বরাবর উপরে ওঠে। এটি 14 কিমি উচ্চতায় ট্রপোস্ফিয়ারের (troposphere) উপরে পৌঁছায় এবং মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রায় 30^0 উত্তরে বায়ু একত্রিত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এই একত্রিত বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রশমিত হয় এবং একটি **উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ** (subtropical high) গঠন করে। প্রশমিত (sinking) হওয়ার আরেকটি কারণ হল 30° উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছানোর সময় বায়ুর শীতলীকরণ। ভূ-পৃষ্ঠের নীচের দিকে বায়ুটি **পুবালি বায়ু** (easterlies) এর মতো নিরক্ষরেখার (equator) দিকে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষরেখার অপর পাশ থেকে পুবালি বায়ু আন্তঃক্রান্তীয় সম্মিলন অঞ্চলে (ITCZ) অভিঃসৃত (Converge) হয়। পৃষ্ঠের উপরের দিকে এবং উল্টোভাবে এই ধরনের সঞ্চালনকে **কোশ (cells)** বলা হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই ধরনের কোশকে **হেডলে কোশ** (Hadley Cell) বলা হয়। মধ্যবর্তী অক্ষাংশে মেরু থেকে প্রশমিত ঠান্ডা বায়ু এবং উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ থেকে উষ্ণ বায়ু সঞ্চালিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে এই বায়ুগুলোকে **পশ্চিমাবায়ু** (westerlies) বলা হয়। এবং কোশটি **ফেরেল কোশ** (Ferrel cell) হিসাবে পরিচিত। মেরু অক্ষাংশে ঠান্ডা ঘন বায়ুটি মেরুর কাছাকাছি শান্ত হয়ে যায় এবং মেরু পুবালি বায়ু (polar easterlies) হিসাবে মধ্যবর্তী অক্ষাংশের দিকে বয়ে যায়। কোশটিকে **মেরুকোশ** (polar cell)ও বলা হয়। এই তিনটি কোশ বায়ুমণ্ডলের সাধারণ সঞ্চালনের ধরন নির্ধারণ করে। নিম্ন অক্ষাংশ থেকে উচ্চ অক্ষাংশে তাপশক্তির স্থানান্তর (transfer of heat energy) সাধারণ সঞ্চালনকে বজায় রাখে।

বায়ুমণ্ডলের সাধারণ সঞ্চালন মহাসাগরকেও প্রভাবিত করে। বায়ুমণ্ডলের বৃহৎ মাত্রার প্রবাহমান বায়ু মহাসাগরের ধীর এবং অধিক শক্তিশালী সমুদ্রস্রোতের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে মহাসাগর বায়ুতে শক্তি এবং জলীয় বাষ্পের যোগান দেয়। এই মিথস্ক্রিয়া (interaction) মহাসাগরের একটি বড়ো অংশে খুব ধীর গতিতে সংঘটিত হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ সঞ্চালন এবং মহাসাগরের উপর এর প্রভাব

প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণায়ন এবং শীতলতা সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ জল ধীরে ধীরে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় এবং ঠান্ডা পেরু স্রোতের দিকে (Peruvian current) এটি প্রতিস্থাপিত হয়। পেরু উপকূলে উষ্ণ জলের এরকম উপস্থিতি **'এল নিনো'** (El Nino) হিসাবে পরিচিত। এই (এল নিনো) ঘটনাটি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর (Central Pacific) ও অস্ট্রেলিয়ার বায়ুচাপ পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বায়ুচাপের এই পরিবর্তনটি **দক্ষিণী আন্দোলন (southern oscillation)** নামে পরিচিত। দক্ষিণী আন্দোলন এবং এল নিনোর যৌথ ঘটনাটি ENSO হিসাবে পরিচিত হয়। যে বছরগুলোতে ENSO শক্তিশালী হয়, সেই বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার বড়ো মাত্রার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার শুষ্ক পশ্চিমা উপকূলে ভারী বৃষ্টিপাত, অস্ট্রেলিয়া এবং কখনো-কখনো ভারতে খরা এবং চিনে বন্যা দেখা দেয়। এই ঘটনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বিশ্বের প্রধান অংশগুলোতে দীর্ঘ পরিসরে পূর্বাভাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মৌসুমি বায়ু (Seasonal Wind) :

বিভিন্ন স্থানের সর্বোচ্চ তাপ, চাপ এবং বায়ু বলয়ের স্থানান্তরের কারণে বিভিন্ন ঋতুতে বায়ু সঞ্চালনের ধরনে পরিবর্তন দেখা যায়। বর্ষাকালে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই ধরনের পরিবর্তনের সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। তোমরা ভারত:প্রাকৃতিক পরিবেশ (India:Physical Environment) (NCERT, 2006) বইয়ে মৌসুমি বায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করবে। সাধারণ সঞ্চালন থেকে পৃথক অন্যান্য স্থানীয় বিচ্যুতিগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

স্থানীয় বায়ু (Local Winds) :

পৃথিবীর উপরিভাগের উষ্ণতা (heating) এবং শীতলীকরণের (cooling) মধ্যে পার্থক্য এবং দৈনন্দিন বা বার্ষিক বিকশিত চক্রের মাধ্যমে কয়েকটি সাধারণ, স্থানীয় বা আঞ্চলিক বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

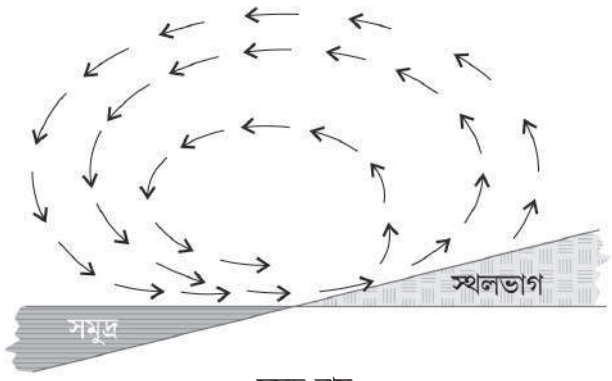

সমুদ্র বায়ু

স্থল বায়ু

চিত্র **10.7 : স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ু**

স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ু (Land and Sea Breezes) :

পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, স্থলভাগ এবং সমুদ্র পৃথকভাবে তাপ শোষণ করে এবং স্থানান্তর করে। দিনের বেলা স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং সমুদ্র অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়। অতএব, স্থলভাগ জুড়ে বায়ু নিম্নচাপীয় অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়, অথচ সমুদ্র তুলনামূলকভাবে শীতল থাকে এবং সমুদ্রের উপর বায়ুচাপ প্রধানত বেশি হয়। এভাবে সমুদ্র থেকে স্থলভাগ পর্যন্ত বায়ুচাপীয় ঢাল (pressure gradient) তৈরি হয় এবং সমুদ্রবায়ু হিসেবে বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে বয়ে যায়। রাত্রিবেলা ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। স্থলভাগ দ্রুত তাপ হারায় এবং সমুদ্রের তুলনায় অধিক শীতল হয়। বায়ুচাপীয় ঢালটি স্থলভাগ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি স্থলবায়ুর ফলাফল (চিত্র 10.7)।

পার্বত্য এবং উপত্যকা বায়ুপ্রবাহ (Mountain and Valley Winds) :

পাহাড়ি অঞ্চলে দিনের বেলা পার্বত্য ঢাল উত্তপ্ত হয়ে বায়ু ঢাল বরাবর উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং এই ফাঁকা জায়গাটি পূর্ণ করতে উপত্যকা থেকে বায়ু এই স্থানে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুটি **উপত্যকা বায়ুপ্রবাহ** (valley breeze) নামে পরিচিত। রাতের বেলায় ঢালগুলো শীতল হওয়ায় ঘনত্বপূর্ণ বায়ু পাহাড়ের ঢাল বরাবর উপত্যকার দিকে নামতে থাকে। একে **পার্বত্য বায়ুপ্রবাহ** (mountain wind) বলে। পার্বত্য চূড়ায় যখন তুষারপাত হয়, তখন তুষার ক্ষেত্রের বায়ু শীতল ও ভারী বলে তা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে থাকে, তাকে **ক্যাটিয়াবেটিক বা নিকাশী বায়ুপ্রবাহ** (katabatic wind) বলা হয়। আরেক প্রকার উষ্ণ বায়ু পার্বত্য অঞ্চলের বিপরীত ঢালে সৃষ্টি হয়। পার্বত্যাঞ্চল অতিক্রম করার সময় এই আর্দ্র বায়ু ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। যখন এটি ঢালের নীচের দিকে নামে তখন শুষ্ক বায়ু সমতাপীয় প্রক্রিয়া (adiabatic process) দ্বারা উষ্ণ হয়ে যায়। এই শুষ্ক বায়ু অল্প সময়ের মধ্যে বরফকে তরলে পরিণত করতে পারে।

বায়ুপুঞ্জ (Air Masses) :

যখন বায়ু পর্যাপ্ত সময়ের জন্য একটি সমপ্রকৃতির (homogenous) অঞ্চলের উপর অবস্থান করে, তখন এটি ওই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ব করে। সমপ্রকৃতির অঞ্চলটি বিশাল সমুদ্রপৃষ্ঠ বা বিশাল সমতল ভূমি হতে পারে। তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বায়ুকে **বায়ুপুঞ্জ** (airmass) বলা হয়। তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার সামান্য অনুভূমিক বৈচিত্র্যযুক্ত বায়ুর একটি বড়ো অংশ

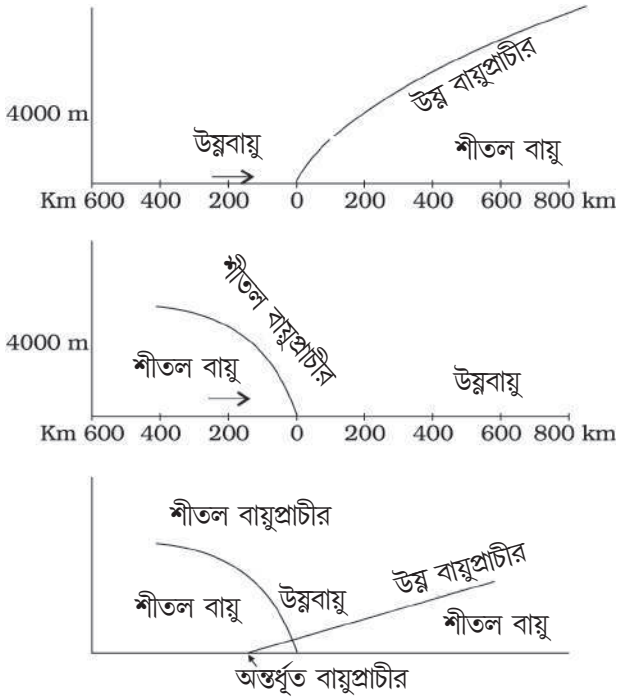

চিত্র **10.8** : উল্লম্ব বিভাগ : (a) উষ্ণ বায়ুপ্রাচীর; (b) শীতল বায়ুপ্রাচীর; (c) অন্তর্ধূত বায়ুপ্রাচীর।

হিসেবে একে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সমান্তরাল পৃষ্ঠতল, যার উপর বায়ুপুঞ্জ গঠিত হয়, তাকে **উৎস অঞ্চল (source regions)** বলা হয়।

উৎস অঞ্চল অনুযায়ী বায়ুপুঞ্জগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। পাঁচটি প্রধান উৎস অঞ্চল আছে। এইগুলো হল — (i) উষ্ণ ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় মহাসাগর (ii) উপক্রান্তীয় উষ্ণ মরুভূমি (iii) অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উচ্চ অক্ষাংশীয় মহাসাগর (iv) উচ্চ অক্ষাংশে খুব ঠান্ডা তুষারাবৃত মহাদেশ (v) সুমেরু এবং কুমেরু মহাদেশের স্থায়ীভাবে বরফাবৃত দেশসমূহ। উপরিউল্লিখিত অঞ্চলগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত ধরনের বায়ুপুঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয় : (i) সামুদ্রিক ক্রান্তীয় (mT); (ii) মহাদেশীয় ক্রান্তীয় (cT); (iii) সামুদ্রিক মেরু (mP); (iv) মহাদেশীয় মেরু (cP); (v) মহাদেশীয় মেরুবৃত্ত (cA)। ক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জগুলো উষ্ণ হয় এবং মেরু বায়ুপুঞ্জগুলো শীতল হয়।

বায়ুপ্রাচীর (Fronts) :

যখন দুটি ভিন্ন বায়ুপুঞ্জ মিলিত হয়, তখন দুটি বায়ুপুঞ্জের মধ্যে একটা বিভাজন রেখার সৃষ্টি হয়। এই বিভাজনরেখাকে বায়ুপ্রাচীর বলা হয়। সীমান্ত বা বায়ুপ্রাচীর গঠনের প্রক্রিয়াটি **বায়ুপ্রাচীরের সংগঠন (frontogenesis)** নামে পরিচিত। চার প্রকারের বায়ুপ্রাচীর রয়েছে : (a) শীতল (cold), (ii) উষ্ণ (warm), (iii) স্থিতিশীল (Stationary) (iv) অন্তর্ধূত (Occluded)। যখন বায়ুপ্রাচীর স্থিরভাবে অবস্থান করে, তখন একে একটি স্থির **বায়ুপ্রাচীর (stationary front)** বলা হয়।

যখন ঠান্ডা বায়ু উষ্ণ বায়ুপ্রাচীরের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার সংযোগ স্থলটিকে **শীতল বায়ুপ্রাচীর** (cold front) বলা হয়, আবার যদি উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ শীতল বায়ুপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়, তখন ওই সংযোগ স্থলটিকে **উষ্ণ বায়ুপ্রাচীর** (warm front) বলা হয়। যদি কোনো বায়ুপুঞ্জ ভূমিপৃষ্ঠের উপরে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলিত হয়, তবে এটি **অন্তর্ধূত বায়ুপ্রাচীর** (occluded front) হিসেবে পরিচিত। বায়ু প্রাচীরগুলো মধ্য অক্ষাংশে সংঘটিত হয় এবং তাপমাত্রা ও চাপের মধ্যে খাড়া ঢালের (steep gradient) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এগুলো তাপমাত্রায় আকস্মিক পরিবর্তন আনে এবং বায়ুকে উর্ধ্বগামী করে মেঘ সৃষ্টি করে এবং অধঃক্ষেপণ ঘটায়।

অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (Extra Tropical Cyclones) :

ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাইরে মধ্য এবং উচ্চ অক্ষাংশে ক্রমবর্ধমান সৃষ্ট প্রক্রিয়াগুলোকে **মধ্য অক্ষাংশীয়** (middle latitude) বা **অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত** (extra tropical cyclones) বলা হয়। মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে বায়ুপ্রাচীর চলাচল

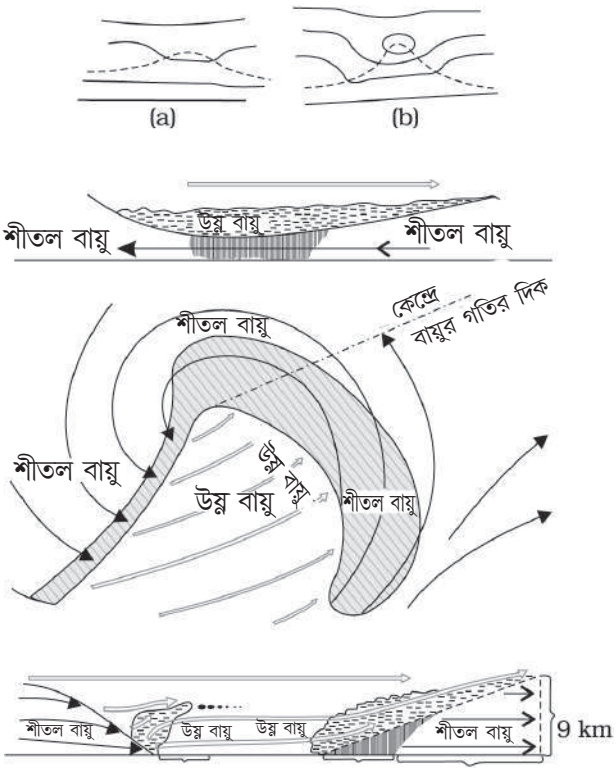

চিত্র **10.9** : অতি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত

করে এবং সেখানকার আবহাওয়ার অবস্থার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটায়।

অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত মেরু বায়ুপ্রাচীর বরাবর গড়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে, বায়ুপ্রাচীরটি স্থিতিশীল থাকে। উত্তর গোলার্ধে, বায়ুপ্রাচীরের দক্ষিণ দিক থেকে উষ্ণ বায়ু এবং উত্তরদিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। যখন বায়ুচাপ বায়ুপ্রাচীর বরাবর নীচে নেমে যায়, তখন উষ্ণ বায়ু উত্তর দিকে এবং শীতল বায়ু দক্ষিণ দিকে সাধারণত ঘড়ির কাঁটার (anticlockwise) বিপরীতে ঘূর্ণবাতীয় সঞ্চালন দেখা যায়। ঘূর্ণবাতীয় সঞ্চালন একটি উষ্ণ বায়ুপ্রাচীর (warm front) এবং শীতল বায়ুপ্রাচীর (cold front) এর সাথে একটি অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে। একটি বিকশিত ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র 10.9-এ দেখানো হল। প্রথমভাগে, উষ্ণ বায়ু বা উষ্ণ শাখার গহ্বরগুলোর সম্মুখে এবং পশ্চাতে শীতল বায়ু বা শীতল শাখার মধ্যে দেখা যায়। উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং আকাশে মেঘের একটি স্তর উষ্ণ বায়ু প্রাচীরের দিকে দেখা যায়, যার ফলে বৃষ্টিপাত ঘটে। পেছন থেকে আগত শীতল বায়ুপ্রাচীর উষ্ণ বায়ুর দিকে অগ্রসর হয় এবং উষ্ণ বায়ুকে উপরে ঠেলে দেয়। ফলস্বরূপ, কিউমুলাস (Cumulus) মেঘ শীতল বায়ুপ্রাচীর বরাবর বিকশিত হয়। উষ্ণ বায়ুপ্রাচীরের স্থান অধিকার করার জন্য শীতল বায়ু প্রাচীর উষ্ণ বায়ুপ্রাচীর অপেক্ষা অধিক দ্রুত ছুটে যায়। উষ্ণ বায়ু সম্পূর্ণ উত্থাপিত হয় এবং বায়ুপ্রাচীর অন্তর্ধূত (occluded) হয় এবং ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

বায়ু সঞ্চালনের প্রক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠ এবং শূন্যে (aloft) উভয়দিকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত থেকে বিভিন্নভাবে পৃথক। অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের একটি সুস্পষ্ট বায়ুপ্রাচীর পর্যায় (frontal system) আছে যা ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতে অনুপস্থিত।

এগুলো একটি বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করে এবং স্থলভাগ ও জলভাগ উভয়ের ওপরই এগুলোর উপস্থিতি দেখা যায়। যদিও ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতগুলো শুধুমাত্র সমুদ্রের উপর সৃষ্টি হয়, তবে স্থলভাগ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের তুলনায় অনেক বড়ো অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতে বায়ুর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় এবং এটি খুবই ধ্বংসাত্মক। অতিক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত পশ্চিম থেকে পূর্বে গমন করে কিন্তু ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গমন করে।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (Tropical Cyclones) :

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতগুলো হল একপ্রকার তীব্র প্রকৃতির ঝড় যা ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাসাগরে উৎপন্ন হয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে গতিশীল হয়, যা চক্রাকার তীব্র বায়ু, ভারী বৃষ্টিপাত ও সামুদ্রিক ঢেউ-এর কারণে বড়ো ধরনের ধ্বংস ঘটায়। এটি সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটি ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণবাত (cyclones) হিসাবে পরিচিত, আটলান্টিকে হ্যারিকেন (Hurricanes), পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ চিন সাগরে টাইফুন (Typhoons) এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সাগর অঞ্চলে উইলি উইলি (Willy-Willies) নামে পরিচিত।

উষ্ণ ক্রান্তীয় মহাসাগরের উপর ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাত সৃষ্টি হয় এবং তীব্রতর হয়। ক্রান্তীয় ঝড়ের গঠন এবং তীব্রতা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থাগুলো হল : (i) 27^0c তাপমাত্রার অধিক বৃহৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ (ii) কোরিওলিস (Coriolis) বলের উপস্থিতি (iii) উল্লম্ব বায়ুর গতিতে সামান্য বৈচিত্র্য (iv) পূর্বে বিদ্যমান একটি দুর্বল নিম্নচাপ অঞ্চল বা নিম্নস্তরের ঘূর্ণবাত সঞ্চালন (v) সমুদ্রস্তরের উপরে উচ্চ প্রতিসরণ (divergence)।

ঘনীভবন প্রক্রিয়া দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা ঝড়ের তীব্রতাকে বৃদ্ধি করে এবং এর দ্বারা কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টি হয় যা ঝড়ের কেন্দ্রের চারপাশে অবস্থান করে। সমুদ্র থেকে ক্রমাগত আর্দ্রতা সংগ্রহের ফলে ঝড়টি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্থলভাগে

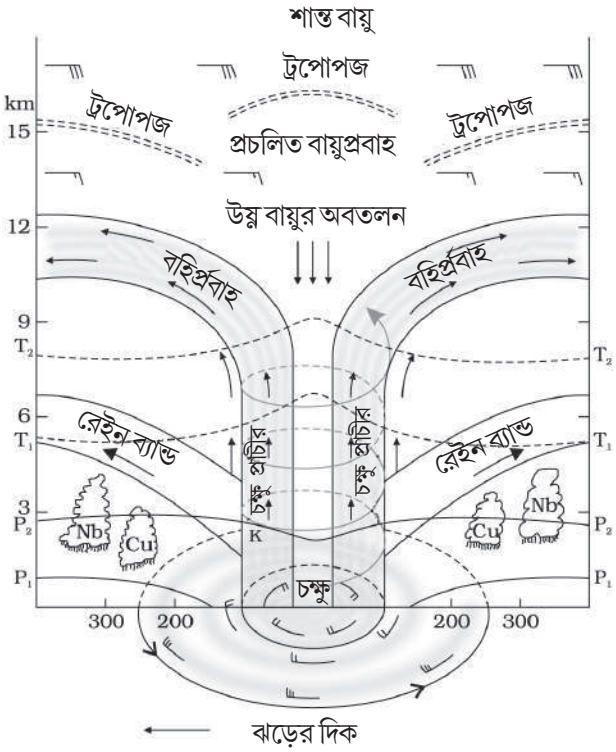

চিত্র **10.10** : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের উল্লম্ব পরিচ্ছেদ
(after Rama Sastry)

পৌঁছানোর সময় আর্দ্রতা সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঝড় কমে যায়। যেখানে একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত, উপকূল অতিক্রম করে ঐ স্থানটি **ঘূর্ণবাতের ভূমিফল (Landfall of the cyclone)** বলে পরিচিত। যেটি সাধারণত 20° উত্তর অক্ষাংশ অতিক্রম করে, সেই ঘূর্ণবাতটি পেছন দিকে বেঁকে গিয়ে আরও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে।

একটি পরিণত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত ঝড়ের উল্লম্ব কাঠামোর একটি পরিকল্পিত উপস্থাপনা চিত্র 10.10-এ দেখানো হল।

কুণ্ডলাকারে গতিশীল ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রস্থলটিতে শান্ত বায়ু লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে ঘূর্ণবাতের উপরিভাগে শান্ত বায়ু একটি স্তম্ভের মতো আকার গঠন করে। সাধারণভাবে এই স্তম্ভকে বলা হয় **ঘূর্ণবাতের চক্ষু** (Eye of the cyclone)। সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ব্যাসগত ব্যবধান 150 এবং 250 কিমি-এর মধ্যে হতে পারে।

চক্ষু হল অধঃগামী বায়ুযুক্ত শান্ত একটি অঞ্চল। চক্ষুর চারপাশে চক্ষুপ্রাচীর (eyewall) অবস্থিত থাকে, যেটি ট্রপোপজের (tropopause) উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর একটি শক্তিশালী চক্ররূপে বৃদ্ধি পায়। এই অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ সর্বাধিক হয়, যা ঘণ্টায় 250 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই ঘূর্ণবাতের ফলে মুষলধারে বৃষ্টি (torrential rain) হয়। চক্ষুপ্রাচীর থেকে রেইন ব্যান্ডগুলো (rain bands) বিকৃত হতে পারে এবং কিউমুলাস (cumulus) এবং কিউমুলোনিম্বাস (cumulonimbus) মেঘপুঞ্জের বহিঃঅঞ্চলে গমন করার প্রবণতা থাকে। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের উপর সমুদ্রঝড়ের ব্যাস 600 থেকে 1200 কিমি-র মধ্যে হয়। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন 300 থেকে 500 কিমি. ধীরগতিতে গমন করে। এই ঘূর্ণবাত ঝড়ের স্রোত (storm surges) সৃষ্টি করে এবং উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়। এই ঝড় স্থলভাগে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

বজ্রঝড় এবং টর্নেডো (Thunderstorms and Tornadoes) :

অন্যান্য বিধ্বংসী স্থানীয় ঝড়গুলো হল বজ্রঝড় এবং টর্নেডো। এটি স্বল্প সময়ের জন্য থাকে, অপেক্ষাকৃত ছোটো এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে,কিন্তু তীব্র প্রকৃতির হয়। বজ্রঝড় আর্দ্র উষ্ণ দিনে তীব্র পরিচলন দ্বারা সৃষ্টি হয়। বজ্রঝড় হল একটি পূর্ণ বিকশিত **কিউমুলোনিম্বাস মেঘ** (cumulonimbus cloud) যা বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। মেঘ যখন উপরের দিকে প্রসারিত হয়, যেখানে উপ-শূন্য তাপমাত্রা প্রবাহিত হয়, সেখানে শিলার (hails) সৃষ্টি হয় এবং শিলাবৃষ্টি (hailstorm) হিসেবে নীচে নেমে আসে। অপর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকলে বজ্রঝড় **ধূলিঝড়** (dust-storms) তৈরি করতে পারে। বজ্রঝড়ের বৈশিষ্ট্য হল উষ্ণ বায়ুর প্রবল ঊর্ধ্বপ্রবাহ, যার কারণে মেঘের আকার বাড়ে, আর এটি অধিক উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এটিই অধঃক্ষেপণের কারণ। পরে, বাতপ্রবাহ (downdraft) নীচের দিকে পৃথিবীতে শীতল বায়ু ও বৃষ্টিপাত নিয়ে আসে। ভয়াবহ বজ্রঝড়ের কারণে কখনো-কখনো বায়ু অধিক বলপূর্ণভাবে হাতির শুঁড়ের মতো সর্পিল অবতরণ করে। এর ফলে কেন্দ্রে অত্যন্ত কম বায়ুচাপ সৃষ্টি হয় এবং এর পথে এটি ব্যাপক ধ্বংস ঘটায়। এই ধরণের ঘটনাকে **'টর্নেডো'** (*tornado*) বলা হয়। টর্নেডো সাধারণত মধ্য অক্ষাংশে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের উপর টর্নেডোকে **জলস্তম্ভ (*water spouts*)** বলা হয়।

এই হিংসাত্মক ঝড়গুলো বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন শক্তির বিভিন্নতার বণ্টন ও সমন্বয় সাধনকে প্রকাশ করে। এই ঝড়ের মধ্যে স্থির এবং তাপশক্তি গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং অস্থির বায়ুমণ্ডল পুনরায় স্থিতিশীল অবস্থানে ফিরে আসে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

(i) যদি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ 1,000 mb হয়, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 1 km উপরে বায়ুর চাপ হবে:

(a) 700 মিলিবার (c) 900 মিলিবার

(b) 1,100 মিলিবার (d) 1,300 মিলিবার

(ii) আন্তঃক্রান্তীয় সম্মিলন অঞ্চল সাধারণত সংঘটিত হয় :

(a) নিরক্ষরেখার কাছে (b) কর্কটক্রান্তি রেখার কাছে

(c) মকরক্রান্তি রেখার কাছে (d) সুমেরু বৃত্তের কাছে

(iii) উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপের চারপাশে বায়ুর দিক হয় :

(a) ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ (c) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে

(b) সমচাপ রেখার সমকোণে (d) সমচাপ রেখার সমান্তরালে

(iv) নিম্নলিখিত কোন্‌টি বায়ুপুঞ্জ গঠনের উৎস স্থল?

(a) নিরক্ষীয় বনাঞ্চল (c) সাইবেরিয়ার সমভূমি

(b) হিমালয় পর্বত (d) ডেকান মালভূমি

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) বায়ুচাপ পরিমাপের একক কী? আবহাওয়া মানচিত্র বানানোর সময় কোনো স্থানের বায়ুচাপ সমুদ্রতল পর্যন্ত কমিয়ে কেন মাপা হয়?

(ii) যখন বায়ুচাপের ঢালজনিত বল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে থাকে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ থেকে নিরক্ষরেখার দিকে হয়, তবে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ু উত্তর পুবালি হয় কেন?

(iii) ভূতাত্ত্বিক বায়ু (geotrophic wind) কাকে বলে?

(iv) স্থল এবং সমুদ্র বায়ু (land and sea breezes) বর্ণনা করো।

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) বায়ুর দিক এবং গতিবেগ প্রভাবকারী কারণগুলো আলোচনা করো।

(ii) পৃথিবীর উপর বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ সঞ্চালনের একটি চিত্র অঙ্কন করো। 30° উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের উপর উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ গঠনের সম্ভাব্য কারণগুলো কী কী?

(iii) ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত কেন সমুদ্রের উপর সৃষ্টি হয়? ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কোন্ অংশে মুষলধারায় বৃষ্টি (torrential rains) হয়ে থাকে এবং উচ্চবেগের বায়ু প্রবাহিত হয় এবং কেন?

প্রকল্পমূলক কাজ :

(i) আবহাওয়া প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম যেমন-সংবাদপত্র, দূরদর্শন এবং রেডিয়ো থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করো।

(ii) কোনো সংবাদপত্রের মধ্যেকার আবহাওয়া বিভাগটি পড়ো, বিশেষত যেখানে একটি মানচিত্র রয়েছে যা কি না উপগ্রহ চিত্রকে প্রদর্শিত করছে। মেঘাচ্ছাদিত ক্ষেত্রগুলো রেখাঙ্কিত করো। মেঘের বণ্টন থেকে বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করো। দূরদর্শনে দেখানো পূর্বাভাসের সাথে সংবাদপত্রে প্রদত্ত পূর্বাভাসের তুলনা করো। সপ্তাহের কতদিনের পূর্বাভাস সঠিক ছিল তা হিসাব করে বলো।

অধ্যায়

11

বায়ুমণ্ডলীয় জল

WATER IN THE ATMOSPHERE

তোমরা ইতোমধ্যেই শিখেছ যে বায়ু জলীয় বাষ্প দ্বারা গঠিত। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আয়তন 0% – 4% হয়ে থাকে এবং এটি আবহাওয়াগত বিভিন্ন ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুমণ্ডলে জল তিনটি রূপে থাকে — কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। জলভাগ থেকে বাষ্পীভবন এবং উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর ও মহাদেশের মধ্যে বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে অনবরত জলের আদানপ্রদান চলতে থাকে।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিকে আর্দ্রতা (moisture) বলে। এটি পরিমাণগতভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে বলে **বিশুদ্ধ আর্দ্রতা বা চরম আর্দ্রতা** (absolute humidity)। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত বা মোট পরিমাণকে বায়ুর **বিশুদ্ধ আর্দ্রতা** বলে। প্রতি একক আয়তন বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ওজন গ্রাম/মিটার^3-এ প্রকাশিত হয়। বায়ু কতটা জলীয় বাষ্প ধারণ করে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বায়ুর তাপমাত্রার উপর। পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থানভেদে বিশুদ্ধ আর্দ্রতার পার্থক্য দেখা যায়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণও ওই তাপমাত্রায় ওই বায়ুর সর্বোচ্চ আর্দ্রতা গ্রহণ করার ক্ষমতার তুলনাকে বলা হয় **আপেক্ষিক আর্দ্রতা** (relative humidity)। বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে আর্দ্রতা গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে এবং কমে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতাও প্রভাবিত হয়। এই পরিবর্তন মহাসাগরের উপরিভাগে বেশি হয় এবং মহাদেশের উপরিভাগে কম হয়।

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যখন সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করে তখন তাকে সম্পৃক্ত বায়ু (saturated) বলে। এতে বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট উষ্ণতাযুক্ত ওই বায়ু ওই পর্যায়ে কোনো অতিরিক্ত পরিমাণ আর্দ্রতা গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। যে উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু সম্পৃক্ত হয়, তাকে বলে **শিশিরাঙ্ক** (dew point)।

বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন (EVAPORATION AND CONDENSATION)

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের সংযুক্তি ও অপসারণকে যথাক্রমে বাষ্পীভবন (evaporation) এবং ঘনীভবন (condensation) বলে। বাষ্পীভবন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে জল তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। বাষ্পীভবনের প্রধান কারণ হল তাপ। যে উষ্ণতায় জলের বাষ্পায়ন শুরু হয়, তাকে বাষ্পীভবনের লীন তাপ (latent heat of vapourisation) বলে।

উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে বায়ুর জল শোষণ ও ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যদি বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ কম হয়, তাহলে বায়ু আরও জলশোষণ এবং ধারণ করতে সক্ষম হয়। বায়ু সঞ্চালনের কারণে সম্পৃক্ত স্তর অসম্পৃক্ত স্তরে পরিবর্তিত হয়। যদি বায়ু চলাচল বেড়ে যায় বা বায়ুপ্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে বাষ্পীভবনের হারও বেড়ে যায়।

জলীয় বাষ্পের জলে রূপান্তরকে বলে ঘনীভবন (condensation)। তাপ কমে যাওয়ার কারণে ঘনীভবন হয়ে থাকে। যখন আর্দ্র বায়ু ঠান্ডায় ঘনীভূত হয় তখন ওই বায়ু এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তার জলীয় বাষ্প গ্রহণের ক্ষমতা স্থগিত হয়ে যায়। তখন অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হয়। যদি জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সরাসরি কঠিন রূপ নেয়, তাহলে ওই প্রক্রিয়াকে বলে উর্ধ্বপাতন (sublimation)। শীতলতার কারণে মুক্ত বাতাসে কতগুলো অতি ক্ষুদ্র কণিকাকে ভর করে ঘনীভবন ঘটে, এদেরকে বলা হয় **জলাকর্ষী ঘনীভবনের ভরকেন্দ্র** (hygroscopic condensation nuclei) । বিশেষত ধূলিকণা, ধোঁয়া, সমুদ্র থেকে আসা লবণকণা এগুলো ঘনীভবনের উল্লেখযোগ্য ভরকেন্দ্র অর্থাৎ এগুলোকে আশ্রয় করে ঘনীভূত জলকণাগুলো ভাসতে থাকে। যখন আর্দ্র বায়ু কোনো শীতলতর বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখনও ঘনীভবন ঘটে এবং ঘনীভবন তখনও হয় যখন বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের (dew point) কাছে পৌঁছায়। অতএব

ঘনীভবন নির্ভর করে ঠান্ডার পরিমাণ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর। বায়ুর আয়তন, উষ্ণতা, চাপ ও আর্দ্রতার দ্বারা ঘনীভবন প্রভাবিত হয়। ঘনীভবন সংঘটিত হয় (i) যখন বায়ুর তাপমাত্রা কমে শিশিরাঙ্কে পৌঁছায় এবং তার আয়তন স্থির থাকে; (ii) যখন বায়ুর আয়তন এবং উষ্ণতা দুটোই একসঙ্গে কমে যায় তখনও ঘনীভবন ঘটে; (iii) বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প বায়ুতে যুক্ত হয়ে ঘনীভবন ঘটায়। ঘনীভবন ঘটার জন্য সবচেয়ে উপযোগী অবস্থা হল বায়ুর উষ্ণতা কমে যাওয়া।

ঘনীভবনের পর বায়ুর আর্দ্রতা তথা বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটির রূপ নেয় — শিশির, তুহিন, কুয়াশা এবং মেঘ। উষ্ণতা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে ঘনীভবনের বিভিন্ন রূপগুলোর শ্রেণিবিভাজন হয়। শিশিরাঙ্ক যখন হিমাঙ্কের থেকে কম থাকে তখন যেমন ঘনীভবন ঘটে তেমনি শিশিরাঙ্ক হিমাঙ্কের থেকে বেশি হলেও ঘনীভবন ঘটে।

শিশির (Dew) :

অধিক শীতল ভূমিভাগে বিভিন্ন কঠিন বস্তুর (ভূমিভাগের উপরিস্থিত বায়ুর ভরকেন্দ্র ছাড়া) উপর যেমন - পাথর, ঘাস পাতা এবং গাছের পাতায় যখন জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে জমা হয় তখন তাকে শিশির বলে। শিশির গঠনের আদর্শ অবস্থা হল - পরিষ্কার আকাশ, শান্ত বায়ু, উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং শীতল ও দীর্ঘ রাত্রি। শিশির গঠনের জন্য এটি প্রয়োজনীয় যে, শিশিরাঙ্ক হিমাঙ্কের (0^0C) উপরে থাকতে হবে। অর্থাৎ শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের (0^0C) তাপমাত্রার থেকে বেশি হতে হবে।

তুষার (Frost) :

শীতল ভূমিভাগে যখন হিমাঙ্কের (0^0C) নীচের তাপমাত্রায় ঘনীভবন ঘটে তখন তুষার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শিশিরাঙ্ক অথবা হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় এটা হয়। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প যখন ঘনীভবনের ফলে জলবিন্দু থেকে সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার বরফরূপে জমা হয়, তখন তাকে তুষার বলে। যে আদর্শ ভৌগোলিক অবস্থায় সাদা তুষার ও শিশির গড়ে উঠে তা প্রায় একইরকম, তবে তুষারের ক্ষেত্রে বায়ুর উষ্ণতা হিমাঙ্ক অথবা হিমাঙ্কের নীচে হতেই হবে।

কুয়াশা এবং মিস্ট (Fog and Mist)

প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ কোনো অঞ্চলের বায়ুর হঠাৎ করে তাপমাত্রা নেমে গেলে তখন যে ঘনীভবন ঘটে তাতে ঘনীভূত জলীয় বাষ্প সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ভাসতে থাকে — একে কুয়াশা বলে। এই কুয়াশা (fog) তার ভিত্তিস্থানে অথবা ভূমিভাগের খুব কাছে মেঘের মতো অবস্থান করে। কুয়াশা ও মিস্ট-এর কারণে দৃশ্যমানতা (visibility) শূন্যতায় গিয়ে ঠেকে। পৌর এলাকা এবং শিল্পকেন্দ্রগুলো থেকে উত্থিত ধোঁয়া তথা ঘনীভবনের ভরকেন্দ্রের (nuclei) প্রাচুর্য কুয়াশা ও মিস্ট গঠনে সাহায্য করে। এরকম পরিস্থিতিতে যখন কুয়াশা ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায় তখন তা **ধোঁয়াশা** (smog) হিসেবে বর্ণিত হয়। কুয়াশা ও মিস্ট এর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল মিস্ট কুয়াশার চেয়ে অনেক বেশি জলীয় বাষ্প নিয়ে গঠিত। মিস্ট এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভরকেন্দ্র ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের ঘন স্তর ধারণ করে থাকে। পর্বতের ঢাল বেয়ে উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে শীতল ভূমিভাগের সংস্পর্শে আসে বলে পার্বত্য অঞ্চলে ঘন ঘন মিস্ট দেখা যায়। কুয়াশা মিস্ট থেকে শুষ্ক হয় এবং বায়ুর উষ্ণ স্রোত যেখানে শীতল স্রোতের সংস্পর্শে আসে সেখানে কুয়াশার উপস্থিতি অতি সাধারণ ঘটনা। কুয়াশা গঠনের ক্ষেত্রে ঘনীভূত জলীয় বাষ্প ভরকেন্দ্র তথা ধুলো, ধোঁয়া, লবণকণাকে আশ্রয় করে ভাসতে থাকে। তাই কুয়াশা হল মেঘেরই নামান্তর মাত্র।

মেঘ (Clouds) :

মুক্ত বাতাসে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার বরফের স্তূপ হল মেঘ। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে কিছুটা উচ্চতায় নানা আকারের মেঘ তৈরি হয়। তাদের উচ্চতা, বিস্তৃতি, ঘনত্ব এবং স্বচ্ছতার ও অস্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে মেঘকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় — (i) সিরাস (cirrus); (ii) কিউমুলাস (cumulus); (iii) স্ট্র্যাটাস (stratus); (iv) নিম্বাস (nimbus)।

সিরাস বা অলক মেঘ (Cirrus) :

সিরাস মেঘ অনেক অনেক বেশি উচ্চতায় (8,000 - 12,000 মিটার) গঠিত হয়। এই মেঘ পাতলা ও বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির হয় এবং পালকের মতো দেখতে হয়। এগুলো সবসময় সাদা রঙের হয়।

কিউমুলাস বা স্তূপ মেঘ (Cumulus) :

এই মেঘ পেঁজা তুলোর মতো। এটি সাধারণত 4,000 - 7,000 মিটার উচ্চতায় গঠিত হয়। এগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়ায়। এই মেঘের নিম্নভাগ সমতল হয় অর্থাৎ তলদেশ সমতল (flat base)।

স্ট্র্যাটাস বা স্তর মেঘ (Stratus) :

নামানুসারে স্তরে স্তরে সজ্জিত এই মেঘ আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে অবস্থান করে। সাধারণত এই মেঘ দুভাবে গঠিত হয় — তাপ বর্জনের ফলে অথবা বিভিন্ন উষ্ণতার বায়ুপুঞ্জের মিশ্রণের কারণে।

নিম্বাস বা বাদল মেঘ (Nimbus) :

নিম্বাস মেঘ কালো অথবা গাঢ় ধূসর বর্ণের হয়। এদের গঠন মধ্যম স্তরে অথবা পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি হয়ে থাকে। এই মেঘ অত্যন্ত ঘন ও অস্বচ্ছ হওয়ায় সূর্যকিরণ আসতে বাধা পায়। মাঝে মাঝে এই মেঘ খুব নীচে নেমে আসে যাতে মনে হয় যে, ভূমিকে স্পর্শ করছে। নিম্বাস মেঘ হল ঘন জলীয় বাষ্পের আকৃতিহীন স্তূপ।

মেঘের এই চার প্রধান ভাগের সমন্বয়ের ভিত্তিতে মেঘের প্রকারভেদ নিম্নলিখিতভাবে করা যায়। উঁচু মেঘ — সিরাস,

সিরোস্ট্র্যাটাস, সিরোকিউমুলাস। মাঝারি উঁচু মেঘ — অল্টোস্ট্র্যাটাস এবং অল্টোকিউমুলাস। নীচু মেঘ — স্ট্র্যাটোকিউমুলাস ও নিম্বোস্ট্র্যাটাস। উল্লম্ব মেঘ বা উপরদিকে যথেষ্ট প্রসারণশীল মেঘ — কিউমুলাস ও কিউমুলোনিম্বাস।

চিত্র 11.1

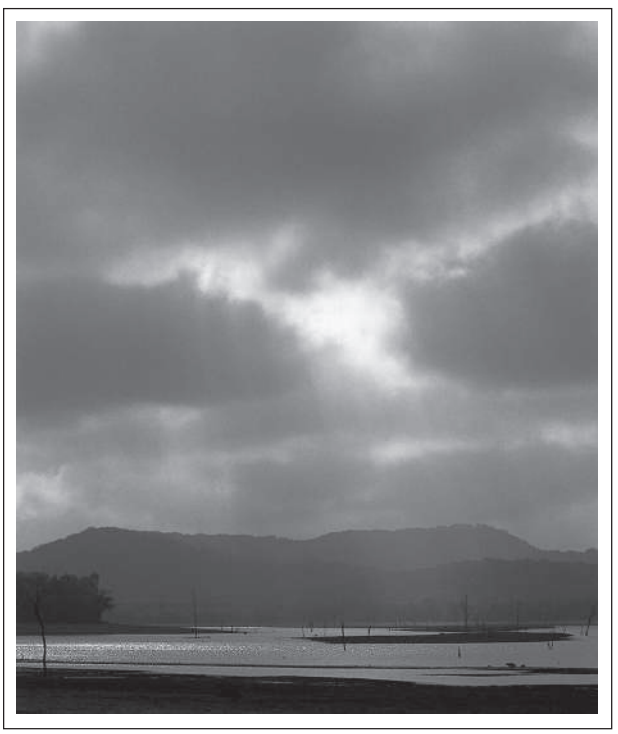

চিত্র 11.2

চিত্র 11.1 এবং 11.2 তে যে যে শ্রেণির মেঘ দেখা যাচ্ছে তাদের শনাক্ত করো।

অধঃক্ষেপণ (Precipitation) :

মুক্ত বাতাসে অবিরাম ঘনীভবন প্রক্রিয়া ঘনীভূত জলকণাগুলোকে আয়তনে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। মহাকর্ষীয় শক্তির প্রতিরোধে যখন বায়ু এই জলকণাগুলোকে ধরে রাখতে অসমর্থ হয়, তখন ওইগুলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের পর তরল পদার্থের নির্গমন বা সৃষ্টি হওয়াকে বলে অধঃক্ষেপণ (Precipitation)। অধঃক্ষেপণ তরল ও কঠিন দুই রূপেই হতে পারে। অধঃক্ষেপণ যখন তরল রূপে হয় তখন তাকে বলে বৃষ্টিপাত (rainfall)। যখন উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেডের কম হয় তখন যে অধঃক্ষেপণ ঘটে তাতে স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম বরফের দানা গঠিত হয়ে পড়তে থাকে, একে বলে তুষারপাত (snowfall)। এই প্রক্রিয়ায় এই স্ফটিকাকার দানাগুলো থেকে তুষারের পাতলা আবরণ তৈরি হয়। বৃষ্টি এবং তুষার ছাড়াও অধঃক্ষেপণের অন্য দুটি রূপ হল স্লিট এবং শিলাবৃষ্টি। এগুলির উৎপত্তি সীমিতভাবে হয় এবং পরবর্তী সময়ে এর উৎপত্তি সময় এবং স্থানভেদে হয়।

স্লিট (Sleet) হল হিমায়িত বৃষ্টির ফোঁটা। এছাড়া গলিত তুষার জলের পুনঃহিমায়িত রূপকেও স্লিট বলে। উপহিমায়িত বায়ুস্তরের (যেটি ভূ-ভাগের কাছে অবস্থিত) উপর যখন হিমাঙ্কের উপরের উষ্ণতাবিশিষ্ট বায়ুস্তর অবস্থান করে তখন অধঃক্ষেপণ ঘটে এবং তাতে স্লিট গঠিত হয়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো উষ্ণতর বায়ু ত্যাগ করে নীচে আসার সময় শীতল বায়ুস্তরের সংস্পর্শে কঠিন রূপ ধারণ করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের বটিকা (Sleet) রূপে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায় — এই বটিকা বা স্লিটগুলো যে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি হয় তাদের থেকে আকারে বড়ো হয় না।

মেঘ থেকে সৃষ্ট বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কঠিন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কঠিন বরফের টুকরোয় (বরফের ক্ষুদ্র বল) পরিণত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় — এগুলোকে শিলাখণ্ড (Hailstone) বলে। বৃষ্টির জল যখন কোনো শীতল বায়ুস্তরের উপর দিয়ে অতিক্রম করে তখন এগুলো গঠিত হয়। শিলাখণ্ডসমূহ (hailstones) — কতগুলো এককেন্দ্রিক বরফের স্তর দ্বারা তৈরি হয় যে স্তরগুলো একটির উপর অপরটি অবস্থান করে। যে অধঃক্ষেপণে এরকম শিলাখণ্ড সহযোগে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে, তাকে বলে শিলাবৃষ্টি (hail)।

বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ (Types of Rainfall) :

উৎপত্তিগতভাবে বৃষ্টিপাতকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় — পরিচলন, শৈলোৎক্ষেপ এবং ঘূর্ণবাত বৃষ্টিপাত।

পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convectional Rain) :

বায়ু উত্তপ্ত হলে হালকা হয়ে পরিচলন স্রোতের মাধ্যমে উপরে উঠে যায়। উপরে উঠে এটি প্রসারিত হয় ও তাপ হারায় এবং ফলস্বরূপ ঘনীভবন ঘটে এবং কিউমুলাস মেঘ বা স্তূপ মেঘ গঠন করে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে, কিন্তু এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এধরনের বৃষ্টিপাত সাধারণত গ্রীষ্মকালে অথবা দিনের উষ্ণতম সময় হয়ে থাকে। এই বৃষ্টি নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং মহাদেশসমূহের অভ্যন্তর ভাগে হয়, বিশেষত উত্তর গোলার্ধে এটি একটি সাধারণ ঘটনা।

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত (Orographic Rain) :

সম্পৃক্ত বায়ুপুঞ্জ যখন পর্বত অতিক্রম করে তখন তা পর্বতে প্রতিহত হয়ে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, উপরে উঠে এর তাপমাত্রা কমে যায় এবং জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়। এ ধরনের বৃষ্টিপাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পর্বতের প্রতিবাত ঢালে বেশি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। প্রতিবাত ঢালে বৃষ্টিপাতের পর বায়ু পর্বতের অন্য ঢালে পৌঁছে অবতরণ করে এবং এতে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তখন ঐ বায়ুর জলীয় বাষ্প গ্রহণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং এই অনুবাত ঢাল বৃষ্টিহীন ও শুষ্ক হয়ে পড়ে। প্রতিবাত ঢালে অবস্থিত যে অঞ্চলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়, তাকে বলে **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল** (rain-shadow area)। শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতকে ইংরেজিতে 'relief rain'ও বলা হয়।

ঘূর্ণবাত বৃষ্টিপাত (Cyclonic Rain) :

দুটি ভিন্নধর্মী তাপমাত্রায়, আর্দ্রতা এবং ঘনত্ববিশিষ্ট বায়ুপুঞ্জ যখন মিলিত হয় তখন বায়ুপুঞ্জের সীমান্তে (Front) যে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়, তাকে ঘূর্ণবাত বৃষ্টি বলে। প্রধানত ঘূর্ণবাতজনিত কার্যাবলির দ্বারাই এই ধরনের বৃষ্টিপাতের উৎপত্তি হয়। ইতোমধ্যেই তোমরা দশম অধ্যায়ে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত ও ঘূর্ণবাতজনিত বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে জেনেছ। ঘূর্ণবাত বৃষ্টিপাতকে বিশদভাবে বুঝতে হলে দশম অধ্যায়ে যে আলোচনা হয়েছে তা পড়তে হবে।

পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের বণ্টন (World Distribution of Rainfall) :

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে এক বছরে বিভিন্ন পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

সাধারণত আমরা যদি নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে অগ্রসর হই, দেখা যায়, ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। মহদেশসমূহের অভ্যন্তর ভাগের তুলনায় পৃথিবীর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। জলের বৃহত্তর উৎস হওয়ায় পৃথিবীর মহাসাগর তথা জলভাগে, স্থল ভাগের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে 35° থেকে 40° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ঘটে এবং পশ্চিমে ক্রমশ বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। কিন্তু, পশ্চিমা বায়ুর কারণে নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে 45° এবং 65° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অংশে মহাদেশগুলোর পশ্চিম প্রান্তে বৃষ্টিপাতের প্রথম সূচনা হয় এবং পূর্বদিকে ক্রমশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। যেখানে পর্বত এবং উপকূল সমান্তরালে অবস্থান করে সেখানে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (windward side) অবস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলে অধিকতর বৃষ্টি হয় এবং অনুবাত ঢালে অবস্থিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়।

অধঃক্ষেপণ-এর মোট বার্ষিক পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর অধঃক্ষেপণ তথা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গত বিভাগগুলো হল :

(i) বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 200 সেমি-র উপর — নিরক্ষীয় বলয়, পর্বতের প্রতিবাত ঢাল বরাবর শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলীয় অংশে এবং মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত ভূমিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত তথা বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 200 সেমি-এর উপর হয়।

(ii) 100 - 200 সেমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত — মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ, মহাদেশগুলোর উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝারি ধরনের তথা বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 100 - 200 সেমি হয়ে থাকে।

(iii) 50 - 100 সেমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত — ক্রান্তীয় স্থলভাগের মধ্যাংশ এবং নাতিশীতোষ্ণ স্থলভাগের পূর্বাংশ এবং অভ্যন্তরীণ অংশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 50 - 100 সেমি-এর মধ্যে হয়ে থাকে।

(iv) 50 সেমিরও কম বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত — মহাদেশের অভ্যন্তরীণ ভাগ এবং উচ্চ অক্ষাংশের যে স্থানগুলো বিশেষ করে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলগুলোতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত 50 সেমি-এরও কম হয়।

বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বণ্টনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের উপর বৃষ্টিপাতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে সারাবছর ধরে বৃষ্টি অসুবিধা সৃষ্টি করে যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশ্চিমাংশে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) নিম্নলিখিত কোন্‌টি মানবগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান ?

(a) জলীয় বাষ্প (c) ধূলিকণা

(b) নাইট্রোজেন (d) অক্সিজেন

(ii) নীচের কোন্ প্রক্রিয়াটি তরলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করার জন্য দায়ী ?

(a) ঘনীভবন (c) বাষ্পীভবন

(b) প্রস্বেদন (d) অধঃক্ষেপণ

(iii) যে বায়ু তার সর্বোচ্চ গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী জলীয় বাষ্প ধারণ করে থাকে —

(a) আপেক্ষিক আর্দ্রতা (c) বিশুদ্ধ আর্দ্রতা

(b) বিশেষ আর্দ্রতা (d) সম্পৃক্ত বায়ু

(iv) নীচের কোন্‌টি আকাশে অবস্থিত উচ্চ মেঘ ?

(a) সিরাস (c) নিম্বাস

(b) স্ট্র্যাটাস (d) কিউমুলাস

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) তিন প্রকার অধঃক্ষেপণের নাম লেখো।

(ii) আপেক্ষিক আর্দ্রতা — ব্যাখ্যা করো।

(iii) উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পায় কেন ?

(iv) মেঘ কীভাবে গঠিত হয় ? মেঘের শ্রেণিবিভাগ করো।

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) বিশ্বব্যাপী অধঃক্ষেপণের বণ্টন সংক্রান্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা দাও।

(ii) ঘনীভবনের বিভিন্ন রূপগুলো কী কী ? শিশির এবং তুষার-এর গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

1 জুন থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন অংশের অত্যধিক বৃষ্টিপাতের খবরগুলো লিপিবদ্ধ করো।

অধ্যায় 12

পৃথিবীর জলবায়ু ও জলবায়ুগত পরিবর্তন

World Climate and Climate Change

পৃথিবীর জলবায়ু সম্পর্কে সহজভাবে জানতে হলে সমগ্র অংশকে ছোটো ছোটো এককে বিভক্ত করে সেসকল অঞ্চলের জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করে বোধগম্যতার মাধ্যমে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে অধীত করা যেতে পারে। জলবায়ুর এই শ্রেণিবিন্যাসের জন্য তিনটি প্রধান পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে। এগুলো হল — **গবেষণা বা পরীক্ষামূলক (empirical), সৃষ্টি বা উদ্ভব সম্বন্ধীয় (Genetic) এবং প্রায়োগিক বা ব্যাবহারিক (applied)** গবেষণামূলক শ্রেণিবিন্যাস সংগৃহীত তথ্য, বিশেষত তাপমাত্রা এবং অধঃক্ষেপণ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়। সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রেণিবিন্যাস জলবায়ু সংগঠনের কারণের ভিত্তিতে করা হয়। প্রায়োগিক শ্রেণিবিন্যাস কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করা হয়।

কোপেন-এর মতানুসারে জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস (Koeppen's Scheme of Classification of Climate) :

জলবায়ুর বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে বহুল প্রচলিত হল ভি কোপেনকৃত গবেষণামূলক জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস। আবহবিদ কোপেন নির্ধারণ করেন যে, স্বাভাবিক উদ্ভিদের বণ্টনের সাথে জলবায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি নির্ণয় করেন যে, নির্দিষ্ট মানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ওপর সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বণ্টন নির্ভর করে। এর ভিত্তিতে তিনি জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ করেন। বার্ষিক ও মাসিক গড় তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের গড় তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণামূলক শ্রেণিবিন্যাস করেন। তিনি বড়ো হরফ ও ছোটো হরফের ইংরেজি অক্ষরের মাধ্যমে জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস করেন। যদিও 1918 সালে কোপেনকৃত শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পরিবর্তিত হলেও কোপেনের এই শ্রেণিবিন্যাস আজও বহুল চর্চিত এবং ব্যবহৃত।

কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে চারটি তাপমাত্রা ও একটি বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কোপেন-এর মতানুসারে সারণি 12.1 -এ জলবায়ুগত বিভাগ ও তাদের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। বড়ো হরফের A, C, D এবং E দ্বারা আর্দ্র জলবায়ু এবং B দ্বারা শুষ্ক জলবায়ু দেখানো হয়েছে।

ঋতুগত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জলবায়ুগত বিভাগ ও উপবিভাগকে ছোটো হরফের মাধ্যমে বর্ণনা

সারণি 12.1 : কোপেন-এর মতানুসারে জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণিবিন্যাস	বৈশিষ্ট্য
A - ক্রান্তীয়	শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা 18° C অথবা তার বেশি
B - শুষ্ক জলবায়ু	বৃষ্টিপাত অপেক্ষা বাষ্পীভবন অধিক কার্যকর
C - উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ	মধ্য অক্ষাংশে বছরের শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা – 3° সেন্টিগ্রেডের বেশি কিন্তু 18° সেন্টিগ্রেডের কম।
D - বরফাবৃত বনভূমির শীতল জলবায়ু	শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা – 3° সেন্টিগ্রেডের কম।
E - শীতল জলবায়ু	প্রত্যেক মাসের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 10° সেন্টিগ্রেডের কম।
H - উচ্চভূমি	উচ্চতার জন্য শীতল

করা হয়েছে। f, m, w এবং s প্রভৃতি ছোটো হরফের মাধ্যমে শুষ্ক ঋতুকে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে f দ্বারা শুষ্ক ঋতু দেখানো হয়নি। m = মৌসুমি জলবায়ু, w = শুষ্ক শীতকাল এবং s = শুষ্ক গ্রীষ্মকাল। ছোটো হরফের a, b, c এবং d দ্বারা তাপমাত্রার তীব্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। B শুষ্ক জলবায়ু উপবিভক্ত করে, বড়ো হরফ S দিয়ে স্টেপ বা নাতি শুষ্ক এবং W দ্বারা মরুভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। সারণি 12.2-এ জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ দেখানো হয়েছে। সারণি 12.1-এ জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণিবিন্যাস ও ধরণের বণ্টন দেখানো হয়েছে।

সারণি 12.2 : কোপেনকৃত জলবায়ুর বিন্যাস

শ্রেণি	প্রকৃতি	অক্ষর পরিচিতি	বৈশিষ্ট্য
A-ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু	ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু	Af	শুষ্ক ঋতু নেই।
	ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু	Am	বর্ষা, স্বল্পকালীন শুষ্ক ঋতু।
	ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু	Aw	শুষ্ক শীতকাল।
B-শুষ্ক জলবায়ু	উপক্রান্তীয় স্টেপ জলবায়ু	BSh	নিম্ন অক্ষাংশের নাতি আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ু
	উপক্রান্তীয় মরু জলবায়ু	BWh	নিম্ন অক্ষাংশের আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ু
	মধ্য অক্ষাংশের স্টেপ	BSk	মধ্য অক্ষাংশের নাতি আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ু
	মধ্য অক্ষাংশের মরু জলবায়ু	BWk	মধ্য অক্ষাংশের আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ু
C-উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ (মধ্য অক্ষাংশ) জলবায়ু	উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু	Cfa	শুষ্ক ঋতু নেই, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল
	ভূমধ্যসাগরীয়	Cs	শুষ্ক ও উষ্ণ গ্রীষ্মকাল
	সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূল	Cfb	শুষ্ক ঋতু নেই, উষ্ণ ও শীতল গ্রীষ্মকাল
D-শীতল তুষারময় আরণ্যক জলবায়ু	আর্দ্র মহাদেশীয়	Df	শুষ্ক ঋতু নেই, তীব্র শীতকাল।
	উপমেরু জলবায়ু	Dw	খুব তীব্র ও শুষ্ক শীতকাল।
E-শীতল জলবায়ু	তুন্দ্রা	ET	কোনো গ্রীষ্ম ঋতু নেই।
	চিরতুষারময়	EF	চির তুষারাবৃত অঞ্চল।
H-পার্বত্যাঞ্চল	পার্বত্যাঞ্চল	H	তুষার ঘেরা পার্বত্যাঞ্চল।

শ্রেণি - A : ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু (Tropical Humid Climates) :

ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যভাগে অবস্থিত। এই অংশে সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং আন্তঃক্রান্তীয় অভিসৃতি বলয়ের (ITCZ) উপস্থিতির ফলে এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তাপমাত্রার বার্ষিক গড় খুব কম এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত বেশি। ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়। যথা - (i) Af - ক্রান্তীয় আর্দ্র জলাবায়ু; (ii) Am -ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু; (iii) Aw-ক্রান্তীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু।

(i) ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (*Tropical Wet Climate -Af*) :

আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু নিরক্ষরেখার নিকটে দেখা যায়। প্রধান অঞ্চলগুলো হল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা, নিরক্ষীয় আফ্রিকার পশ্চিমাংশ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। বছরের প্রত্যেক মাসে বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়। তাপমাত্রা অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমশ বেশি হলেও বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর কম। যে-কোনো একটি দিনের সর্বাধিক তাপমাত্রা থাকে 30^0 সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে 20^0 সে.। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে **চাঁদোয়া** সৃষ্টি করে এবং এই জলাবায়ু অঞ্চলে ব্যাপক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়।

(ii) ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু (*Tropical Monsoon Climate -Am*) :

ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বাংশ এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ভারী বর্ষণ হয় এবং শীতকাল শুষ্ক থাকে। এই জলবায়ু প্রকৃতির বিস্তৃত বিবরণ **'ভারত : প্রাকৃতিক পরিবেশ'** বইতে দেওয়া হয়েছে।

(iii) ক্রান্তীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু (*Tropical Wet and Dry Climate - Aw*) :

Af প্রকৃতির জলবায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ক্রান্তীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায়। এই জলাবায়ুর সীমা মহাদেশের পশ্চিমাংশের শুষ্ক জলবায়ু এবং Cf ও Cw জলবায়ু অঞ্চলের পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। Aw প্রকৃতির জলবায়ু ব্রাজিলের আমাজন বনভূমির উত্তর ও দক্ষিণে, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের সন্নিহিত অঞ্চল, সুদানসহ মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলবায়ু অঞ্চলে Af এবং Am প্রকৃতির জলবায়ু থেকে কম বৃষ্টিপাত হয় এবং পরিবর্তনশীল। বর্ষাকালের স্থায়িত্ব কম এবং শুষ্ক ঋতুর স্থায়িত্ব বেশি হওয়ায় তীব্র খরার সৃষ্টি হয়। সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর শুষ্ক ঋতুতে সর্বাধিক থাকে। পর্ণমোচী বনভূমি এবং বৃক্ষ আচ্ছাদিত তৃণভূমি এই জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায়।

শ্রেণি B — শুষ্ক জলবায়ু (Dry Climates) :

শুষ্ক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হল, খুব কম বৃষ্টিপাত। এর ফলে উদ্ভিদের যথাযথ বৃদ্ধি হয় না। এই জলবায়ু পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে রয়েছে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার 15° - 60° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত দেখা যায়। নিম্ন অক্ষাংশে, 15° - 30° অক্ষাংশে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উচ্চ অংশ যেখানে তাপমাত্রা হ্রাস পায় সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না। মহাদেশের পশ্চিম সীমান্তে, যেখানে শীতল স্রোত মিলিত হয়, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর নিরক্ষরেখার দিকে আরও প্রসারিত হয়ে উপকূলভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য অক্ষাংশে, নিরক্ষরেখার 35° - 60° উত্তর ও দক্ষিণ মহাদেশের মধ্যভাগে যেখানে উপকূলীয় আর্দ্র বায়ু প্রবেশ করতে পারে না এবং সমগ্র অঞ্চল পর্বত দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেখানে B-শ্রেণির জলবায়ু দেখা যায়।

শুষ্ক জলবায়ু দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- স্টেপ বা মরুপ্রায় জলবায়ু (BS) এবং মরু জলবায়ু (BW)। এগুলোকে পুনরায় উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - উপক্রান্তীয় স্টেপ (BSh) এবং উপক্রান্তীয় মরু (BWh) জলবায়ু যা 15° - 35° অক্ষাংশের মধ্যে দেখা যায়। মধ্য অক্ষাংশের 35° - 60° অক্ষাংশের মধ্যে মধ্য অক্ষাংশীয় স্টেপ (BSk) এবং মধ্য অক্ষাংশীয় মরুভূমি (BWk) দেখা যায়।

উপক্রান্তীয় স্টেপ এবং উপক্রান্তীয় মরু জলবায়ু (*Subtropical Steppe (BSh) and Subtropical Desert (BWh) Climates*) :

উপক্রান্তীয় স্টেপ (*BSh*) এবং উপক্রান্তীয় মরু (*BWh*) জলবায়ুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ। শুষ্ক ও আর্দ্র জলবায়ুর মধ্যভাগে অবস্থিত উপক্রান্তীয় স্টেপ জলবায়ুতে মরু অঞ্চল অপেক্ষা কিছু বেশি বৃষ্টিপাত হয় যা স্বল্প পরিমাণে তৃণভূমি জন্মাতে সহায়ক। দু'ধরনের জলবায়ুতেই বৃষ্টিপাত পরিবর্তনশীল। বৃষ্টিপাতের এই পরিবর্তনশীলতার প্রভাব মরু অঞ্চল অপেক্ষা স্টেপ অঞ্চলের জনজীবনে বেশি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। মরু অঞ্চলে স্বল্পকালীন বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যদিও তা মাটির আর্দ্রতা সৃষ্টিতে কার্যকর নয়। শীতল স্রোতের সীমান্তবর্তী উপকূলীয় মরু অঞ্চলে কুয়াশার উপস্থিতি স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে। 1922 সালের 13 সেপ্টেম্বর লিবিয়ার আল আজিজিয়াতে সর্বাধিক তাপমাত্রা 58^0 সেন্টিগ্রেড লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বার্ষিক ও দৈনিক তাপমাত্রার প্রসরও বেশি থাকে।

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ (মধ্য অক্ষাংশ) জলবায়ু (*Warm Temperate (Mid-Latitude) Climates-C*) :

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রধানত মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে 30° - 50° অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলবায়ুতে সাধারণত উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং মৃদু শীতকাল দেখা যায়। এই জলবায়ুকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - (i) উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু, যেমন - শুষ্ক শীতকাল এবং উষ্ণগ্রীষ্মকাল (CWa); (ii) ভূমধ্যসাগরীয় (Cs); (iii) আর্দ্র উপক্রান্তীয়, যেমন - শুষ্ক ঋতু নেই এবং মৃদু শীতকাল (Cfa); (iv) সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু (Cfb)।

আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু (*Humid Subtropical Climate - Cwa*) :

আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা থেকে মেরুর দিকে, প্রধানত উত্তর ভারতীয় সমভূমি এবং দক্ষিণ চিনের অভ্যন্তরস্থ সমভূমির অন্তর্গত। এই জলবায়ু অঞ্চল *Aw* প্রকৃতির জলবায়ুর মতোই তবে শীতকাল উষ্ণ।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু (*Mediterranean Climate - Cs*) :

নামানুসারে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ভূমধ্য সাগর সন্নিহিত অঞ্চলসহ 30° - 40° অক্ষাংশের মধ্যস্থ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মহাদেশসমূহের পশ্চিম উপকূল, যেমন - মধ্য ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য চিলি, দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া - এই জলবায়ুর অন্তর্গত। উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উত্তাল গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পশ্চিমা বায়ুর দ্বারা এই অঞ্চল প্রভাবিত। এজন্য উষ্ণ ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং মৃদু বৃষ্টিবহুল শীতকাল এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে গড় মাসিক তাপমাত্রা প্রায় 25° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন তাপমাত্রা 10° সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় 35 - 90 সেমি।

আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু (*Humid Subtropical (Cfa) Climate*) :

উপক্রান্তীয় অক্ষাংশে মহাদেশের পূর্বাংশে আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। এই অঞ্চলে বায়ুপুঞ্জ সাধারণত অস্থিতিশীল এবং এর ফলে সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ, চিনের দক্ষিণ ও পূর্বাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, আর্জেন্টিনার উত্তর পূর্বাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে এই জলবায়ু দেখা যায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 75-150 সেমি-র মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে ঘূর্ণবাতজনিত বৃষ্টিপাত এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে গড় মাসিক তাপমাত্রা প্রায় 27° সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে এটা 5°-12° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর কম।

সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু (*Marine West Coast Climate -Cfb*) :

সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল থেকে মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে মেরুর দিকে দেখা যায়। এই জলবায়ুর অন্তর্গত প্রধান অঞ্চলগুলো হল - উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া চিলির দক্ষিণাংশ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং নিউজিল্যান্ড। সমুদ্রের প্রভাবে এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং শীতকালে অক্ষাংশগত অবস্থা অপেক্ষা উষ্ণ থাকে। গ্রীষ্মকালীন মাসের গড় তাপমাত্রা 15°-20° সেন্ট্রিগ্রেডের মধ্যে থাকে এবং শীতকালীন তাপমাত্রা 4°-10° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক ও দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর কম। সারাবছরব্যাপী বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 50-250 সেমির মধ্যে থাকে।

বরফাবৃত বনভূমির শীতল জলবায়ু (Cold Snow Forest Climates-D) :

উত্তর গোলার্ধের 40°-70° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় বরফাবৃত বনভূমির শীতল জলবায়ু (**D**) দেখা যায়। এই জলবায়ু অঞ্চলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - (i) Df - আর্দ্র শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু এবং (ii) Dw - শুষ্ক শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু। উচ্চ অক্ষাংশে শীতের প্রকোপ বেশি।

আর্দ্র শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু (*Cold Climate with Humid Winters -Df*) :

সামুদ্রিক পশ্চিম উপকূলীয় জলবায়ু থেকে মেরুর দিকে এবং মধ্য অক্ষাংশীয় স্টেপ অঞ্চলে আর্দ্র শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু দেখা যায়। শীতকাল শীতল এবং তুষারাবৃত। তুষারহীন ঋতুর দৈর্ঘ্য কম। বার্ষিক তাপমাত্রার গড় অধিক। আবহাওয়ার পরিবর্তন আকস্মিক এবং কম। মেরুর দিকে শীতের তীব্রতা বেশি।

শুষ্ক শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু (*Cold Climate with Dry Winters - Dw*) :

এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে প্রধানত শুষ্ক শীতযুক্ত শীতল জলবায়ু (*Dw*) দেখা যায়। শীতকালে প্রতীপ ঘূর্ণবাতযুক্ত অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহে এটি দুর্বল হলেও প্রত্যাবর্তনশীল বায়ু এই অঞ্চলে দেখা যায়। মেরুর দিকে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা খুব কম থাকে এবং শীতকালে কিছু কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে হিমাঙ্কের নীচে চলে যায় এবং বছরের প্রায় সাতমাস এই অবস্থা থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 12-15 সেমির কম থাকে।

মেরুদেশীয় জলবায়ু (Polar Climates (E)) :

মেরুদেশীয় জলবায়ু 70° অক্ষাংশ অতিক্রম করে মেরুর অভিমুখে দেখা যায়। মেরু দেশীয় জলবায়ু দুধরনের : (i) তুন্দ্রা (ET); (ii) চির তুষারাবৃত (EF)।

তুন্দ্রা জলবায়ু (*Tundra Climate -ET*) :

তুন্দ্রা জলবায়ুর নাম উদ্ভিদ প্রজাতির নামানুসারে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান ছোটো ঘাস, শৈবাল, তৃণ এবং ফুলপ্রদায়ী উদ্ভিদ প্রজাতির নামানুসারে হয়েছে। এটা সেই অঞ্চল যেখানে মাটি স্থায়ীভাবে চির হিমায়িত অবস্থায় থাকে। স্বল্পকালীন উদ্ভেদী ঋতু এবং জলের সাহায্যে শুধুমাত্র ছোটো ছোটো উদ্ভিদ জন্মায়। গ্রীষ্মকালে তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলে দিনের আলো খুব বেশি থাকে।

চির তুষারাবৃত জলবায়ু (*Ice Cap Climate - EF*) :

গ্রিণল্যান্ডের মধ্যভাগ এবং আন্টার্কটিকা মহাদেশে চিরতুষারাবৃত জলবায়ু দেখা যায়। গ্রীষ্মকালেও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। এই অঞ্চলে খুবই কম বৃষ্টিপাত হয়। তুষার ও বরফ পুঞ্জীভূত হয়ে আরোহী চাপের ফলে তুষারপাতরূপে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ভেঙে যায়। এগুলো হিমশৈলরূপে সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগরে ভাসমান অবস্থায় থাকে। আন্টার্কটিকার 79° দক্ষিণ অক্ষাংশে 'প্ল্যাটো স্টেশন' (Plateau Station is an inactive American research and South Pole)-এ এই জলবায়ুর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

উচ্চভূমি বা পার্বত্য জলবায়ু (Highland Climates - H) :

উচ্চভূমি জলবায়ু ভূ-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে স্বল্প দূরত্বে গড় তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও প্রাবল্য ভূমির উচ্চতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। পার্বত্য পরিবেশে উল্লম্ব উচ্চতা অনুসারে জলবায়ুগত স্তর দেখা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) :

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে সমসাময়িক জলবায়ু সম্পর্কে জেনেছি। বিগত 10,000 বছরে আমরা জলবায়ুর সামান্য পরিবর্তন অনুভব করেছি। কখনও ব্যাপক পরিবর্তনশীলতা দেখা গেছে। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পৃথিবীতে জলবায়ুর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক রেকর্ডে হিমযুগ ও আন্তঃ হিমযুগের পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ভূ-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত উচ্চ ভূমিভাগ বা উচ্চ অক্ষাংশে হিমবাহের অগ্রগমন বা পশ্চাদ সরণ প্রদর্শিত হয়েছে। উষ্ণ ও শীতল যুগে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে হিমহ্রদও সৃষ্টি হয়েছে। বৃক্ষস্থিত বলয় দ্বারাও আর্দ্র ও শুষ্ক যুগের ধারণা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বিবরণেও অনেকাংশে জলবায়ুর বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল প্রমাণের নিরিখে বলা যায় যে, জলবায়ুর পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ভারতেও শুষ্ক ও আর্দ্র যুগ পর্যায়ক্রমে দেখা গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খুঁজে বের করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব 8000 বছরের কাছাকাছি সময়ে রাজস্থান মরুভূমির জলবায়ু আর্দ্র ও শীতল ছিল। খ্রিস্টপূর্ব 3000-1700 পর্যন্ত এখানে অধিকতর বৃষ্টিপাত হত। খ্রি.পূ. প্রায় 2000-1700 পর্যন্ত এই অঞ্চল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রভাগে ছিল। তখন থেকেই শুষ্ক অবস্থা জোরালো হতে থাকে।

ভূ-তাত্ত্বিক যুগে 500-300 মিলিয়ন বছর পূর্বে ক্যামব্রিয়ান, অরডোভিসিয়ান এবং সিলুরিয়ান যুগে পৃথিবী কিছুটা উষ্ম ছিল। প্লিস্টোগিন যুগের সময়, হিমযুগ ও আন্তঃ হিমযুগ দেখা যায়। প্রায় 18,000 বছর পূর্বে অন্তিম হিমযুগ দেখা যায়। 10,000 বছর পূর্বে বর্তমান আন্তঃ হিমযুগ শুরু হয়েছে।

সাম্প্রতিক অতীতের জলবায়ু (Climate in the recent past) :

সবসময় জলবায়ু পরিবর্তিত হয়। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে আবহাওয়ার ব্যাপকতা প্রত্যক্ষিত হয়েছে। 1990 সালে শতাব্দীর সর্বাধিক তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে কিছু ভয়ানক বন্যাও সংঘটিত হয়েছিল। 1967-1977 সালে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত **সহেল অঞ্চল** এর ফলে ভয়াবহ খরার প্রকোপে পড়েছিল। 1930 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমের বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে খরার তীব্রতাকে '**ধূলোর ঝুড়ি** (*dust bowl*)' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। জলবায়ুর এই ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষিভূমি ও কৃষিজ ফসল তথা বন্যার প্রকোপে জনসাধারণের পরিব্রাজনের ঘটনা ঐতিহাসিক রেকর্ড করেছে। ইউরোপে উষ্ণ, আর্দ্র, শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়া বহুবার দেখা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হল, দশম ও একাদশ শতকে উষ্ণতা ও শুষ্কতার প্রভাবে **বাইকিনস্** উপজাতিরা যখন গ্রিনল্যান্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করে। 1550 সাল থেকে 1850 সাল পর্যন্ত ইউরোপে '**ক্ষুদ্র বরফ যুগ** (Little Ice Age)' অনুভূত হয়েছিল। 1885-1940 সাল পর্যন্ত বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। 1940 সালের পর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী দেখানো হয়েছিল।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণ (Causes of Climate Change) :

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বহুবিধ। এগুলোকে জ্যোতির্বিদ্যাজাত এবং স্থলজগত কারণ — এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সৌরকলঙ্কে (sunspot) সূর্যের আপাতগতির ফলে উৎপন্ন সূর্যকিরণের পরিবর্তনের ওপর জ্যোতির্বিদ্যাগত কারণ নির্ভর করে। চক্রাকারে আবর্তনের ফলে সৌরকলঙ্কে গাঢ় ও শীতলতার হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে। আবহবিদদের মতানুসারে, যখন সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি পায় তখন আবহাওয়া শীতলতর ও আর্দ্রতর হয় এবং ব্যাপক ঝড়ো অবস্থা সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সৌরকলঙ্ক হ্রাস পেলে উষ্ণ ও শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করে। যদিও এসকল তথ্য পরিসংখ্যানগতভাবে অর্থবহ নয়।

অপর জ্যোতির্বিদ্যাগত তত্ত্ব হল '**মিলাঙ্কোভিচ দোলন** (Millankovitch oscillations)' যা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনকালে নিজ অক্ষের সাথে কৌণিকভাবে হেলে আবর্তিত হয় বলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। সূর্য থেকে আগত সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের পরিবর্তনেই জলবায়ুর এরূপ পরিবর্তন হয়।

আগ্নেয় ক্রিয়াকলাপও জলবায়ু পরিবর্তনের অপর একটি কারণ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ধূলিকণা (aerosols) নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এই ধূলিকণাসমূহ দীর্ঘকালব্যাপী বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান থাকায় সূর্যরশ্মি যথেষ্ট পরিমাণে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। সাম্প্রতিককালে **পিনাটোবা এবং এলকোয়েন আগ্নেয়গিরির** অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কয়েক বছরের জন্য কমে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক প্রভাব হল বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি। যার ফলে ভূ-উষ্ণায়ন হতে পারে।

ভূ-উষ্ণায়ন (Global Warming) :

গ্রিনহাউস গ্যাসের উপস্থিতির ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বায়ুমণ্ডল থেকে আগত সৌরকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাবার সময় অধিকাংশই দীর্ঘ তরঙ্গায়িত বিকিরণকে শোষণ করে। যেসকল গ্যাস এই দীর্ঘ তরঙ্গায়িত বিকিরণকে শোষণ করে তাদের **গ্রিনহাউস গ্যাস** বলে।

বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্তকারী এসকল প্রক্রিয়াকে গ্রিনহাউস প্রভাব (*greenhouse effect*) বলে অভিহিত করা হয়।

'গ্রিনহাউস' কথাটি শীতল অঞ্চলে তাপ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি উপমা থেকে প্রাপ্ত। 'গ্রিনহাউস'টি কাচ দিয়ে তৈরি করা হয়। কারণ স্বচ্ছ কাচ সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র সৌরতরঙ্গ শোষণ করে কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ বিকিরণে অক্ষম। এজন্য কাচকে অধিক বিকিরিত তাপ শোষণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং দীর্ঘ তরঙ্গ কাচ ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না পলে 'কাচঘর'-এর ভেতরকার তাপমাত্রা বহির্ভাগ থেকে বেশি থাকে। তোমরা যখন গ্রীষ্মকালে কোনো বাস বা গাড়ির জানালা বন্ধ করে রাখ তখন বহির্ভাগ থেকে ভেতরে অধিক উষ্ণতা অনুভব করবে। অনুরূপভাবে শীতকালে দরজা ও জানালা বন্ধ থাকলে বহির্ভাগ থেকে ভেতরকার তাপমাত্রা বেশি থাকে। এটি 'গ্রিনহাউস প্রভাব'-এর অপর একটি উদাহরণ।

গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ (*Greenhouse Gases-GHGs*) :

বর্তমানে যে সকল গ্রিনহাউস গ্যাস (*GHG*) নিয়ে সকলে চিন্তিত সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এবং ওজোন গ্যাস (O_3) প্রভৃতি। আরও কিছু গ্যাস, যেমন-নাইট্রিক অক্সাইড (NO) এবং কার্বন মনোঅক্সাইড (CO) ও সহজে গ্রিনহাউস গ্যাসে প্রতিক্রিয়া করে এবং বায়ুমণ্ডলে এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যে-কোনো গ্রিনহাউস (*GHG*) গ্যাসের অণুর কার্যকারিতা তার ঘনত্ব বৃদ্ধির পরিমাণ, বায়ুমণ্ডলে স্থায়িত্ব এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণ শোষণের ওপর নির্ভর করে। ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের (CFCs) প্রভাব খুব বেশি। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন গ্যাস স্তর সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে নিম্ন ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরের স্থানীয় বিকিরিত তাপে প্রভাব বিস্তার করে। অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গ্রিনহাউস গ্যাসের (GHGs) অনুগুলো বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘসময়ব্যাপী অবস্থানের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে এর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি (খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা) থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বনভূমি এবং মহাসাগরে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রশমিত হয়। বনভূমিও তার বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে। অতএব ভূমি ব্যবহারের জন্য বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করে সমতা আনার জন্য 20-50 বছর লেগে যাবে। এই গ্যাস বার্ষিক প্রায় 0.5 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়বীয় মডেলে (climatic models) জলবায়ুর পরিবর্তনের আনুমানিক সূচক হিসেবে প্রাক্ শিল্পাঞ্চল স্তরের ওপর কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্বের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়াকে অনুমান করা হয়েছে।

মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs) এর সৃষ্টি হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের উপস্থিতির ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি অক্সিজেনকে ওজোন গ্যাসে পরিবর্তন করে দেয়। এজন্য অতিবেগুনি রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। এই ক্লোরোফ্লুরো কার্বন প্রবাহ দ্বারা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর বিনষ্ট হয়। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে ওজোন গ্যাস স্তরের সর্বাধিক হ্রাস দেখা যায়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে ওজোন স্তরের নিঃশেষিত হওয়াকে '**ওজোন গহ্বর** (*ozone hole*)' নামে অভিহিত করা হয়। এই গহ্বর দিয়ে অতি বেগুনি রশ্মি ট্রোপোস্ফিয়ার স্তর ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়।

বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব হ্রাস করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রয়াস করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 1997 সালে '**কিয়োটো খসড়া চুক্তি** (*Kyoto protocol*)'-এর ঘোষণা। এই খসড়া চুক্তি 2005 সালে 141টি দেশে কার্যকর করা হয়েছিল। 'কিয়োটো খসড়া চুক্তি' অনুসারে 35টি শিল্পোন্নত দেশে তাদের কার্যকারিতা 1990 সাল থেকে 2012 সালের মধ্যে 5 শতাংশ কমিয়ে আনতে বাধ্য করেছে।

বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের (GHGs) পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবার ভূ-উষ্ণায়ন শুরু হলে তার পশ্চাদপসরণ ঘটানো কষ্টকর। ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও ভূ-উষ্ণায়নের ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবনকে বিপর্যস্ত করবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ ও বরফ স্তূপ গলে সমুদ্র জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ দ্বীপসমূহে ব্যাপক সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্ব সংসারে এই সমস্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ইতোমধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস (GHGs) এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ভূ-উষ্ণায়ন বৃদ্ধির প্রবৃত্তি হ্রাস করার জন্য প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বসংসার এই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দেবে

এবং পৃথিবীব্যাপী এমন জীবনশৈলী সৃষ্টি করবে যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবে।

বর্তমানে ভূ-উষ্ণায়ন পৃথিবীর একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। এখন আমরা লিপিবদ্ধ তাপমাত্রা অনুসারে এই গ্রহ কীভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে সেটি দেখব।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপের তাপমাত্রা সংক্রান্ত তথ্য সহজে উপলব্ধ হয়েছে। 1961-90 সালে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ইতিপূর্বে তাপমাত্রা সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য অসংগতিপূর্ণ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে 1961-90 সালের গড় তাপমাত্রার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কার তাপমত্রা সম্পর্কে অনুমান করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্থানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় 14^0C। 1961-90 সালে ভূ-গোলকের তাপমাত্রার তুলনায় 1856-2000 সালের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্থানের বার্ষিক তাপমাত্রায় অসংগতি দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে দুটো পর্বে তাপমাত্রা সর্বাধিক হয়েছিল, 1901-44 সাল এবং 1977-99 সাল। এই দুটো পর্বের প্রত্যেকটিতেই বিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় 0.4^0C বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার এই দুটো পর্বের মধ্যেই কিছুটা শীতলতা অনুভূত হয়েছিল যা উত্তর গোলার্ধে অধিক লক্ষণীয়।

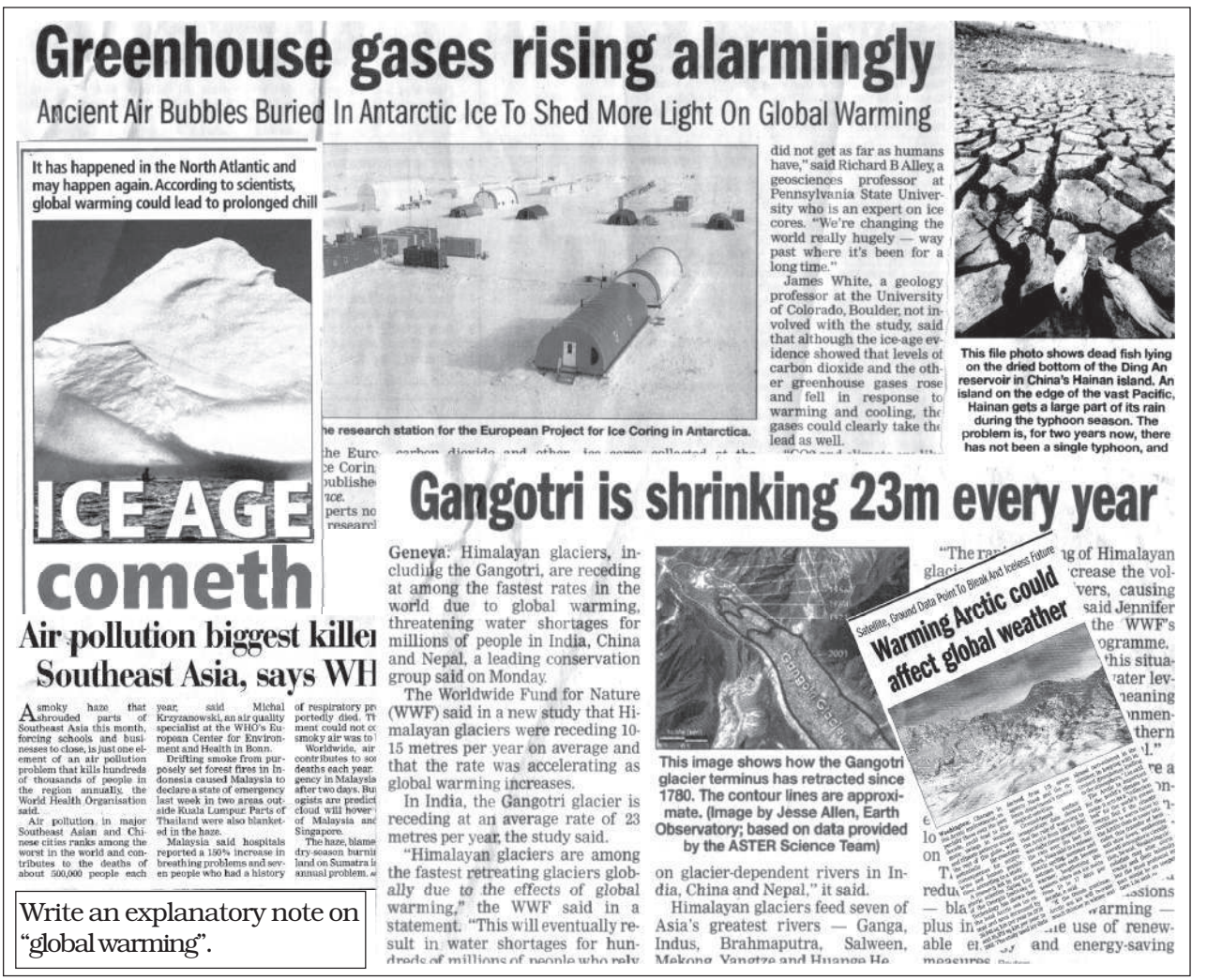

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের তুলনায় প্রায় 0.6^0C বেশি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। 1856-2000 সালের মধ্যে বিগত দশকেই সাতটি উষ্ণতম বছর লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীই নয়, সমগ্র সহস্রাব্দব্যাপী লিপিবদ্ধ তাপমাত্রা অনুযায়ী 1998 সালটি ছিল উষ্ণতম সাল।

Greenhouse gases rising alarmingly

Ancient Air Bubbles Buried In Antarctic Ice To Shed More Light On Global Warming

It has happened in the North Atlantic and may happen again. According to scientists, global warming could lead to prolonged chill

ICE AGE cometh

he research station for the European Project for Ice Coring in Antarctica.

did not get as far as humans have," said Richard B Alley, a geosciences professor at Pennsylvania State University who is an expert on ice cores. "We're changing the world really hugely — way past where it's been for a long time."

James White, a geology professor at the University of Colorado, Boulder, not involved with the study, said that although the ice-age evidence showed that levels of carbon dioxide and the other greenhouse gases rose and fell in response to warming and cooling, the gases could clearly take the lead as well.

This file photo shows dead fish lying on the dried bottom of the Ding An reservoir in China's Hainan island. An island on the edge of the vast Pacific, Hainan gets a large part of its rain during the typhoon season. The problem is, for two years now, there has not been a single typhoon, and

Gangotri is shrinking 23m every year

Geneva: Himalayan glaciers, including the Gangotri, are receding at among the fastest rates in the world due to global warming, threatening water shortages for millions of people in India, China and Nepal, a leading conservation group said on Monday.

The Worldwide Fund for Nature (WWF) said in a new study that Himalayan glaciers were receding 10-15 metres per year on average and that the rate was accelerating as global warming increases.

In India, the Gangotri glacier is receding at an average rate of 23 metres per year, the study said.

"Himalayan glaciers are among the fastest retreating glaciers globally due to the effects of global warming," the WWF said in a statement. "This will eventually result in water shortages for hundreds of millions of people who rely on glacier-dependent rivers in India, China and Nepal," it said.

Himalayan glaciers feed seven of Asia's greatest rivers — Ganga, Indus, Brahmaputra, Salween, Mekong, Yangtze and Huange He.

This image shows how the Gangotri glacier terminus has retracted since 1780. The contour lines are approximate. (Image by Jesse Allen, Earth Observatory; based on data provided by the ASTER Science Team)

Satellite, Ground Data Point To Bleak And Iceless Future

Warming Arctic could affect global weather

Air pollution biggest killer Southeast Asia, says WH

A smoky haze that shrouded parts of Southeast Asia this month, forcing schools and businesses to close, is just one element of an air pollution problem that kills hundreds of thousands of people in the region annually, the World Health Organisation said.

Air pollution in major Southeast Asian and Chinese cities ranks among the worst in the world and contributes to the deaths of about 500,000 people each year, said Michal Krzyzanowski, an air quality specialist at the WHO's European Center for Environment and Health in Bonn.

Drifting smoke from purposely set forest fires in Indonesia caused Malaysia to declare a state of emergency last week in two areas outside Kuala Lumpur. Parts of Thailand were also blanketed in the haze.

Malaysia said hospitals reported a 150% increase in breathing problems and seven people who had a history

Write an explanatory note on "global warming".

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো :

(i) নীচের কোন্‌টি কোপেনকৃত "A" প্রকৃতির জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত ?

(a) সব মাসে অধিক বৃষ্টিপাত ।

(b) শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

(c) প্রত্যেক মাসের গড় তাপমাত্রা $18^{\circ}C$ -এর বেশি থাকে।

(d) প্রত্যেক মাসের গড় তাপমাত্রা $10^{\circ}C$ -এর কম থাকে।

(ii) জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাসে কোপেন-এর পদ্ধতিটি ব্যক্ত করা যেতে পারে :

(a) ব্যাবহারিক; (b) নিয়মানুগ; (c) সৃষ্টি সম্বন্ধীয়; (d) গবেষণামূলক।

(iii) কোপেন-এর শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে ভারতীয় উপদ্বীপের অধিকাংশ স্থান যে প্রকৃতির জলবায়ুর অন্তর্গত সেটি হল :

(a) "Af" (b) "BSh" (c) "Cfb" (d) "Am"

(iv) নিম্নে প্রদত্ত কোন্ বছরটিতে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক উষ্ণতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল ?

(a) 1990 (b) 1998 (c) 1885 (d) 1950

(v) নিম্নে বর্ণিত চারটি জলবায়ুগত অবস্থার কোন্‌টি আর্দ্রতাকে প্রদর্শিত করে ?

(a) A—B—C—E

(b) A—C—D—E

(c) B—C—D—E

(d) A—C—D—F

2. নিম্নের প্রশ্নসমূহের 30 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাসে 'কোপেন' জলবায়ুর কোন্ দুটো উপাদানকে ব্যবহার করেছেন ?

(ii) কীভাবে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিন্যাস থেকে গবেষণামূলক বিন্যাস পদ্ধতি স্বতন্ত্র ?

(iii) কোন্ প্রকার জলবায়ুতে তাপমাত্রার প্রসর খুব কম থাকে ?

(iv) সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি পেলে কী ধরনের জলবায়ুগত অবস্থা দেখা যায় ?

3. নিম্নের প্রশ্নসমূহের 150 টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও :

(i) "A" প্রকৃতি এবং "B" প্রকৃতির জলবায়ুগত অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

(ii) "C" প্রকৃতি এবং "A" প্রকৃতির জলবায়ুতে তোমরা কী ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাবে ?

(iii) "গ্রিনহাউস গ্যাস" বলতে কী বোঝ ? গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

পৃথিবীপৃষ্ঠের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত 'কিয়োটো খসড়া চুক্তি'-র সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করো।

একক : V

মহাসাগরীয় জলরাশি

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- উদকচক্র বা জলচক্র
- মহাসাগরসমূহ — সমুদ্রগর্ভস্থ ভূপ্রকৃতি : মহাসাগরীয় জলরাশির তাপমাত্রা এবং লবণতার বণ্টন; মহাসাগরীয় জলরাশি — তরঙ্গের সঞ্চরণ, জোয়ার এবং সমুদ্রস্রোত।

অধ্যায়

13

মহাসাগরীয় জলরাশি
WATER (OCEANS)

আমরা কি জল ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি? বলা হয় যে জলই জীবন। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জল। পৃথিবীর সকল জীব খুবই সৌভাগ্যশালী কারণ পৃথিবী এমন একটি গ্রহ যেখানে জল রয়েছে (water planet), না হলে আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকত না। আমাদের সৌরমণ্ডলে (solar system) জল হল একটি বিরল সম্পদ। সূর্য অথবা সৌরজগতের অন্য কোথাও জল নেই। সৌভাগ্যবশত পৃথিবীপৃষ্ঠে জলের প্রাচুর্য রয়েছে। তাই, আমাদের গ্রহকে 'নীল গ্রহ'ও (*Blue Planet*) বলা হয়।

উদকচক্র বা জলচক্র (HYDROLOGICAL CYCLE) :

জল চক্রাকারে আবর্তনশীল একটি সম্পদ (cyclic resource)। জলকে ব্যবহার এবং পুনঃ ব্যবহার করা যেতে পারে। জল মহাসাগর থেকে ভূভাগে এবং ভূভাগ থেকে মহাসাগরে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। জলচক্র (hydrological cycle) ভূ-পৃষ্ঠে, ভূ-পৃষ্ঠের নীচে এবং ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বায়ুমণ্ডলে জলের সঞ্চালনকে ব্যাখ্যা করে।

জলচক্র (water cycle) কোটি কোটি বছর ধরে কার্যরত এবং পৃথিবীর সকল জীবনই এর ওপর নির্ভর করে আছে। বায়ুর পর, জল পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পৃথিবীর সর্বত্র জলের বণ্টন সমান নয়। অনেক স্থানে জলের প্রাচুর্যতা রয়েছে, আবার অনেক স্থানে জলের পরিমাণ খুবই সীমিত। জলচক্র হল বারিমণ্ডলে বিভিন্নরূপে অর্থাৎ তরল, কঠিন এবং গ্যাসীয়রূপে জলের সঞ্চালন (circulation)। এটি মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং জীব ও প্রাণীকূলের মধ্যে জলের অবিরাম আদানপ্রদানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

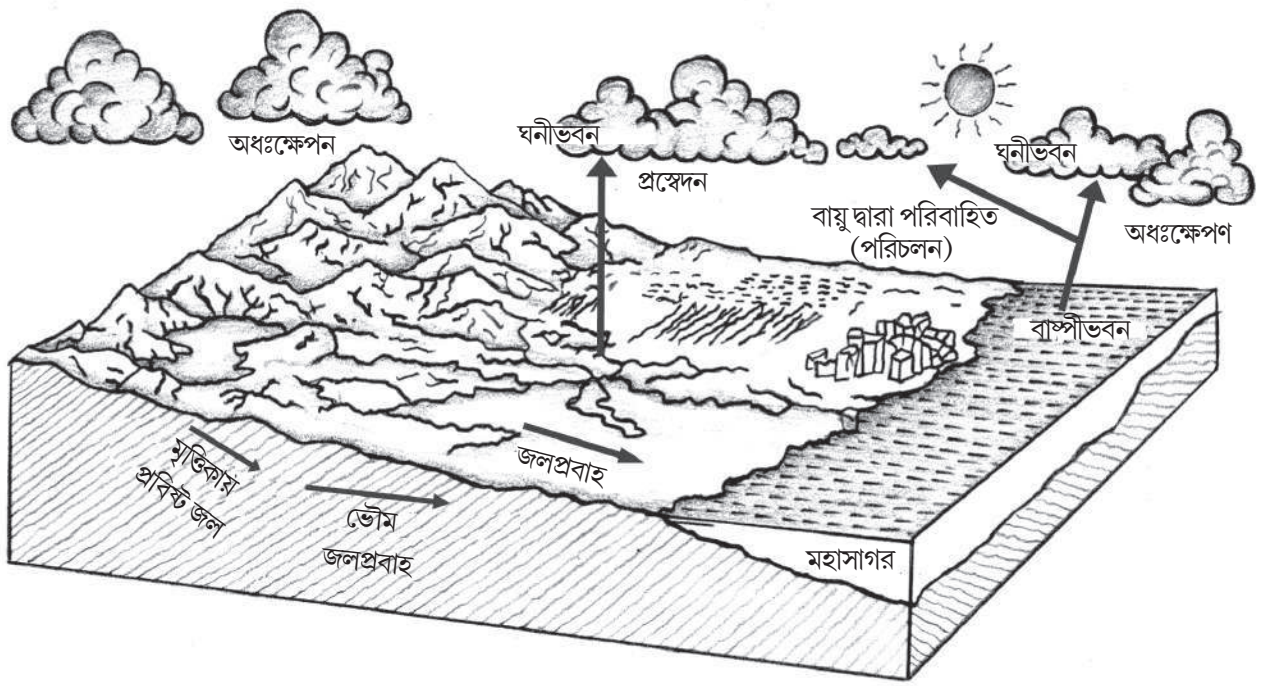

চিত্র **13.1** : জলচক্র (Hydrological Cycle)

সারণি 13.1 : ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল

জলাধার	আয়তন (মিলিয়ন কিউবিক কিমি)	মোট শতকরা
মহাসাগরসমূহ	1,370	97.25
বরফের চাদর এবং হিমবাহ গলিত জল	29	2.05
ভৌম জল	9.5	0.68
হ্রদসমূহ	0.125	0.01
মৃত্তিকার আর্দ্রতা	0.065	0.005
বায়ুমণ্ডল	0.013	0.001
জলস্রোত এবং নদীসমূহ	0.0017	0.0001
জীবমণ্ডল	0.0006	0.00004

সারণি 13.2 : জলচক্রের উপাদান এবং প্রক্রিয়াসমূহ

উপাদানসমূহ	প্রক্রিয়াসমূহ
মহাসাগর সমূহের সঞ্চিত জল	বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন, ঊর্ধ্বপাতন
বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত জল	ঘনীভবন
বরফ এবং তুষারে সঞ্চিত জল	অধঃক্ষেপণ
পৃষ্ঠদেশে জলপ্রবাহ	জলস্রোতে তুষার গলা জলপ্রবাহ
ভৌমজলের সঞ্চয়	জলস্রোতে স্বাদুজলের প্রবাহ ভূগর্ভে অনুপ্রবেশের দ্বারা সঞ্চিত জল বসন্তকালে ভৌমজলের নির্বাহ

সারণি 13.1-এ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে জলের বণ্টন দেখানো হয়েছে। পৃথিবীতে যে জল রয়েছে তার 71 শতাংশ জলই মহাসাগরসমূহে দেখা যায়। আর বাকি অংশ স্বাদু জলরূপে হিমবাহ, মুকুটাকৃতি বরফের আবরণ (icecaps), ভৌমজলের উৎস, হ্রদসমূহ, মৃত্তিকার আর্দ্রতা, বায়ুমণ্ডল, জলস্রোত এবং জীবকূলের মধ্যে রয়েছে। ভূভাগে যে জল অধঃক্ষেপিত হয় তার আনুমানিক শতকরা 59 ভাগ মহাসাগর ও অন্যান্য স্থান থেকে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বাকি অংশ ভূ-পৃষ্ঠে জলপ্রবাহ রূপে, ভূগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট জলের সঞ্চয় রূপে বা কিছু অংশ হিমবাহে পরিণত হয় (চিত্র 13.1)।

এটি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে পৃথিবীতে প্রাপ্ত নবীকরণযোগ্য জল পাওয়া গেলেও এর চাহিদা তুলনামূলকভাবে খুবই বেশি। এর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় এবং সাময়িককালের জন্য জল সংকট (water crisis) দেখা দেয়। নদীর জলের দূষণ এই সংকটকে অধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমরা জলের গুণমান বৃদ্ধিতে এবং উপলব্ধ জলের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

মহাসাগরতলের ভূ-প্রকৃতি (Relief of the Ocean Floor) :

পৃথিবীর বহিঃস্তরের বৃহৎ অবনমিত অংশে মহাসাগরসমূহ অবস্থান করছে। এই অংশে, আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র বেসিনের (ocean basin) প্রকৃতি এবং তাদের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানব। মহাদেশ সমূহের সাথে মহাসাগরসমূহ এমনভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত যে স্বাভাবিকভাবে এদের সীমানা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন বা অসম্ভব। ভূগোলবিদরা মহাসাগরের অংশকে 5 টি মহাসাগরে ভাগ করেছেন। এদের নাম হল — প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, কুমেরু মহাসাগর এবং সুমেরু মহাসাগর। বিভিন্ন সাগর (Seas), উপসাগর (Bays), খাদ (Gulfs) এবং অন্যান্য খাড়িসমূহ (Inlets) এই বৃহৎ চারটি মহাসাগরসমূহের অংশ বিশেষ।

সমুদ্রপৃষ্ঠের (sea level) নীচে 3 – 6 কিমি এর মধ্যে মহাসাগর তলের মুখ্য ভাগ দেখা যায়। মহাসাগরের জলের নীচের ভূ-ভাগ (Land) যা কি না মহাসাগরতল রূপে পরিচিত, এটি ভূ-পৃষ্ঠের ভূমিরূপের তুলনায় খুবই জটিল এবং পৃথক (চিত্র 13.2)। মহাসাগরের তলদেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম শৈলশিরা, গভীরতম খাত এবং বৃহৎ সমভূমি থাকায় এটি এবড়ো-থেবড়ো অসমান প্রকৃতির। মহাদেশসমূহের গঠনের মতো এই ভূমিরূপগুলোর গঠনেও গাঠনিক বা টেকটনিক (Tectonic)। কারণ, অগ্ন্যুৎপাতজনিত (Volcanic) কারণ এবং সঞ্চয়জাত প্রক্রিয়াসমূহের (Depositional processes) বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

মহাসাগরের বিভাজন (Divisions of the Ocean Floors) :

মহাসাগর তলদেশকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল (i) মহীসোপান (the Continental Shelf); (ii) মহীঢাল (the Continental Slope); (iii) গভীর সমুদ্রের সমভূমি (the Deep Sea Plain); (iv) গভীর সমুদ্র খাত (the Oceanic Deeps)। এই বিভাগগুলো ছাড়াও সমুদ্র তলদেশে আরো অনেক মুখ্য ও গৌণ ভূ-প্রকৃতি রয়েছে। এগুলো হল শৈলশিরা, পাহাড়, সামুদ্রিক পাহাড়, গায়ট (guyots), খাত (trenches), সামুদ্রিক গিরিখাত বা ক্যানিয়ন (canyons) প্রভৃতি।

মহীসোপান *(Continental Shelf)* :

মহীসোপান হল মহাদেশের প্রান্তভাগ বা সীমান্ত যা অপেক্ষাকৃত অগভীর সমুদ্র এবং খাড়ি দ্বারা বেষ্টিত বা ঘেরা। এটি মহাসাগরের সবচেয়ে অগভীর অংশ যার গড় ঢাল 1° বা তারও কম হয়। সোপানের প্রান্তভাগের ঢাল খুব খাড়া (very steep) হয়, একে ভগ্ন সোপান (Shelf break) বলে।

মহাসোপানের প্রস্থ (width) এক মহাসাগর থেকে অন্য

মহাসাগরে ভিন্ন প্রকৃতির হয়। মহীসোপানের গড় প্রস্থ প্রায় 80 কিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিছু কিছু মহাদেশীয় প্রান্তভাগ মহীসোপান প্রায় থাকে না বা খুবই সংকীর্ণ। যেমন-চিলির উপকূল ভাগ, সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল প্রভৃতি। এর বিপরীতে সুমেরু মহাসাগরে সাইবেরিয়া মহীসোপানটি বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সোপান, যার প্রস্থ 1500 কিমি। মহীসোপানের গভীরতাতেও বিভিন্নতা দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে এটি 30 মি. আবার কিছু ক্ষেত্রে এর গভীরতা 600 মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মহীসোপানের ওপর পলি সঞ্চয়ের ঘনত্বও একেক মহাসাগরে একেক রকম হয়। এই সঞ্চিত পলি বিভিন্ন নদী, হিমবাহ, বায়ু দ্বারা বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে বাহিত হয় এবং তরঙ্গ ও স্রোত দ্বারা বণ্টিত হয়। মহীসোপানের দীর্ঘ সময় ধরে যে বিরাট পলি সঞ্চিত হয় সেগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির উৎস।

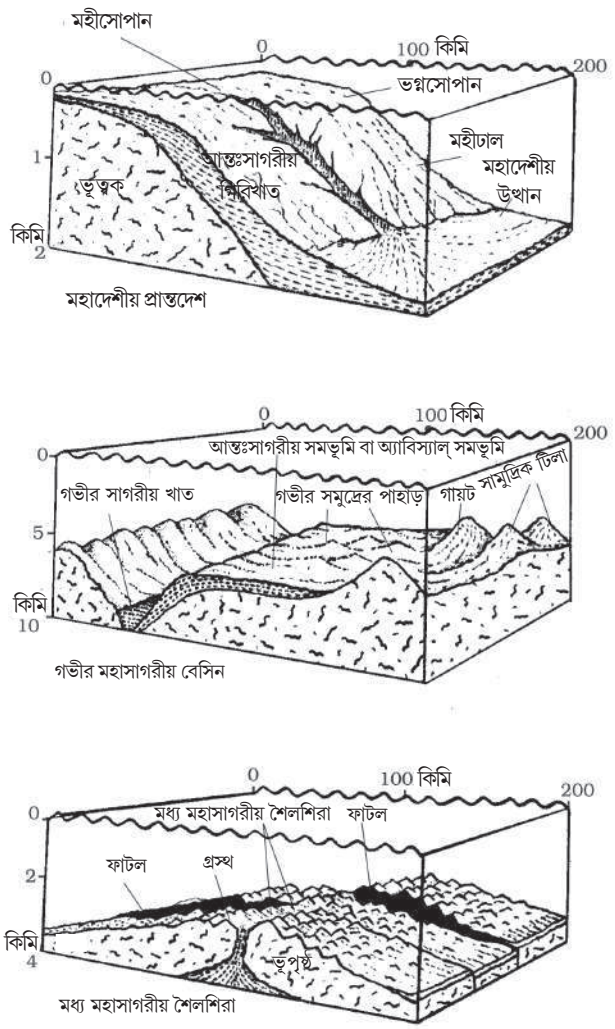

চিত্র **13.2** : মহাসাগরীয় তলদেশের ভূ-প্রকৃতির গঠন

মহীঢাল (*Continental Slope*) :

মহীঢাল মহাসাগরীয় বেসিন (ocean basin) এবং মহীসোপান (continental slope) কে যুক্ত করে। মহীসোপানের তলদেশে যেখানে খাড়া ঢালে পরিবর্তিত হয়, সেখানে মহীঢালের সূচনা হয়। মহীঢাল অঞ্চলে ঢালের মাত্রার প্রবণতা 2° থেকে 5°-এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে ঢালের গভীরতা (depth) 200 মি থেকে 3,000 মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। মহীঢালের সীমানা মহাদেশের সমাপ্তির ইঙ্গিত করে। এই অঞ্চলেই গিরিখাত (Canyon) এবং খাত (Trench) দেখা যায়।

গভীর সামুদ্রিক সমভূমি (*Deep Sea Plain*) :

মহাসাগরীয় বেসিন (ocean basin)-এ মৃদু ঢালযুক্ত অঞ্চলই হল গভীর সামুদ্রিক সমভূমি (Deep sea plain)। এগুলোই হল পৃথিবীর সবচেয়ে সমতল এবং কোমল অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলোর গভীরতা 3000 মি থেকে 6000 মিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। এই সমভূমিগুলো পলির সূক্ষ্ম কণা যেমন কর্দম এবং সিল্ট বা পলি দ্বারা আবৃত।

মহাসাগরীয় খাত বা পরিখা খাত (*Oceanic Deeps or Trenches*) :

মহাসাগরীয় খাত হল মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর অংশ। সমুদ্রখাতগুলো অপেক্ষকৃত খাড়া পার্শ্ববিশিষ্ট এবং সংকীর্ণ বেসিনযুক্ত হয়। এই অঞ্চলগুলোর গভীরতা পার্শ্ববর্তী মহাসাগরীয় তলদেশ অপেক্ষা 3 – 5 কিমি বা তারও বেশি হয়। এই অঞ্চলগুলো হল মহীঢালের ভিত্তি ভূমি যা বৃত্তীয় দ্বীপমালার কাছে অবস্থিত এবং সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ও প্রবল ভূমিকম্পীয় ক্ষেত্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণেই এইসব অঞ্চল মহীসঞ্চরণ সংক্রান্ত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন অব্দি 57টি খাতের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে 32টি প্রশান্ত মহাসাগরে, 19টি আটলান্টিক মহাসাগরে এবং 6টি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।

ক্ষুদ্র ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (Minor Relief Features) :

উপরোক্ত মহাসাগরীয় তলদেশের প্রধান ভূমিরূপগুলো ছাড়াও কিছু ক্ষুদ্র ভূ-প্রকৃতি রয়েছে। এগুলো আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে এদের প্রাধান্য রয়েছে।

মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরাসমূহ (*Mid-Oceanic Ridges*) :

একটি মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা দুটি পর্বত শৃঙ্খলের সমন্বয়ে গঠিত যাকে দীর্ঘ অবনত ভূমি পৃথক করেছে। পার্বত্য শৈলশিরাগুলো শৃঙ্গবিশিষ্ট, এদের উচ্চতা 2500 মিটার পর্যন্ত হতে পারে, আবার এদের মধ্যে কিছু এমনও শৃঙ্গ আছে যেগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ অব্দি প্রসারিত। মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরার অংশ আইসল্যান্ড হল এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সামুদ্রিক টিলা (*Seamount*) :

এটি একটি চূড়া বিশিষ্ট পাহাড় যা কি না সমুদ্রতল থেকে উত্থিত হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ অব্দি পৌঁছাতে পারে না। সামুদ্রিক টিলার উৎপত্তি আগ্নেয়গিরি থেকে। এটি 3000 – 4500 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। এম্পেরর সামুদ্রিক টিলা যা কি না প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত এই ভূমিরূপের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আন্তঃসাগরীয় গিরিখাতসমূহ বা ক্যানিয়নসমূহ (*Submarine Canyons*) :

এগুলো গভীর উপত্যকা, যেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির তুলনা কলোরাডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সঙ্গে করা যায়। কখনো-কখনো বড়ো নদী মোহনার আগে বিস্তৃত হয়ে মহীসোপান বা মহীঢালের আড়াআড়ি কর্তন করতে দেখা যায়। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত আন্তঃসাগরীয় গিরিখাত হল হাডসন্ ক্যানিয়ন (Hudson Canyon)।

গায়ট (*Guyots*) :

এটি একটি সম উচ্চতল বিশিষ্ট সামুদ্রিক টিলা। এরকম সমতল শীর্ষ বিশিষ্ট জলমগ্ন টিলা বা পাহাড় গঠনের সময় ক্রমাগত অবনমনের পর্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে। হিসাব করে দেখা গেছে শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরেই 10,000-এর বেশি সংখ্যক সামুদ্রিক টিলা এবং গায়ট রয়েছে।

অ্যাটল (*Atoll*) :

এগুলো ক্রান্তীয় মহাসাগরে দৃষ্ট অনুচ্চ দ্বীপ। এর মধ্যভাগ অবনত এবং চারদিক প্রবাল প্রাচীন দিয়ে ঘেরা। এটি সমুদ্রের (লেগুন) একটি ভাগ বা অংশ হতে পারে বা কোনো সময় পরিষ্কার, নোনা জল বা অধিক পরিমাণ জল দ্বারা ঘেরাও হতে পারে।

মহাসাগরীয় জলরাশির তাপমাত্রা (Temperature of Ocean Waters) :

এই অংশে বিভিন্ন মহাসাগরীয় জলরাশির তাপমাত্রার স্থানীয় এবং উল্লম্ব বণ্টন এবং এর পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মহাসাগরীয় জলরাশিও ভূমিভাগের মতো সৌরশক্তি দ্বারা উত্তপ্ত হয়। স্থলভাগের তুলনায় মহাসাগরীয় জলরাশির তাপীয় এবং শীতলীকরণ প্রক্রিয়া (heating and cooling process) ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

তাপমাত্রা বণ্টনে প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ (Factors Affecting Temperature Distribution)

মহাসাগরীয় জলরাশির তাপমাত্রা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী কারণগুলো হল :

(i) **অক্ষাংশ (*Latitude*) :** নিরক্ষরেখা থেকে যতই মেরুর দিকে যাওয়া যায় পৃষ্ঠ জলরাশির তাপমাত্রা কমতে থাকে। এর কারণ হল মেরু প্রদেশের দিকে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের (insolation) পরিমাণও কমতে থাকে।

(ii) **স্থলভাগ ও জলভাগের অসম বণ্টন (*Unequal distribution of land and water*) :** দক্ষিণ গোলার্ধের মহাসাগরের তুলনায় উত্তর গোলার্ধের মহাসাগরসমূহ অনেক বড়ো ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অধিক পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে।

(iii) **সাময়িক বায়ুপ্রবাহ (*Prevailing wind*) :** স্থলভাগ থেকে মহাসাগরের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় সেটি মহাসাগরের পৃষ্ঠের উষ্ণ জলরাশিকে উপকূলভাগ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এর ফলে নীচের শীতল জলরাশি উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়। ফলস্বরূপ তাপমাত্রার দ্রাঘিমাংশগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, সমুদ্র বায়ু বা উপকূল অভিমুখী বায়ুর প্রভাবে উষ্ণ জল উপকূলের দিকে সঞ্চিত হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(iv) **সমুদ্রস্রোত (*Ocean currents*) :** উষ্ণ সমুদ্রস্রোত (warm ocean currents) শীতল অঞ্চলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়, আবার শীতল স্রোত উষ্ণ মহাসাগরীয় অঞ্চলের তাপমাত্রার হ্রাস ঘটায়। উপসাগরীয় স্রোত (Gulf stream) (উষ্ণ স্রোত) উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায় আবার ল্যাব্রাডর স্রোতের (শীতল স্রোত) প্রভাবে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের তাপমাত্রার হ্রাস পায়।

এই সব কারণগুলো স্থানীয়ভাবে সমুদ্রস্রোতের তাপমাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নিম্ন অক্ষাংশে অবস্থিত উন্মুক্ত সাগরের (open sea) তুলনায় পরিবেষ্টিত সাগরসমূহের (enclosed seas) তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। অন্যদিকে উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত পরিবেষ্টিত সাগরের তাপমাত্রা উন্মুক্ত সাগরের তুলনায় কম হয়।

তাপমাত্রার অনুভূমিক ও উল্লম্ব বণ্টন (Horizontal and Vertical Distribution of Temperature) :

মহাসাগরীয় জলরাশির তাপীয় গভীরতার পার্শ্বচিত্রে (temperature-depth profile) দেখানো হয়েছে কীভাবে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। পার্শ্বচিত্রে (profile) সমুদ্রপৃষ্ঠের জল এবং গভীরতম স্তরের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল (boundary region) কে দেখানো হয়েছে। এই সীমান্তটি সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে সাধারণত 100-400 মিটার নীচে শুরু হয়ে কয়েকশো মিটার নীচ পর্যন্ত প্রসারিত (চিত্র 13.3)। এই সীমান্ত অঞ্চলের সেখানে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তাকে **থার্মোক্লাইন** (*thermocline*) বলে। মোট জলরাশির শতকরা 90 ভাগ গভীর সমুদ্রে থার্মোক্লাইনের নীচে দেখা যায়। এই অঞ্চলে তাপমাত্রা 0°C পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মধ্য এবং নিম্ন অক্ষাংশে মহাসাগরীয় তাপমাত্রার পরিকাঠামোকে পৃষ্ঠদেশ থেকে সমুদ্র তলদেশ পর্যন্ত ত্রিস্তর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া (three-layer system) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম স্তরটিতে উষ্ণ মহাসাগরীয় জলরাশিকে দেখানো হয়েছে এবং এটি 500 মিটার পুরু এবং তাপমাত্রার প্রসর 20° থেকে 25°C পর্যন্ত হয়ে থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই স্তরটির উপস্থিতি সারা বছর লক্ষ করা গেলেও মধ্য অক্ষাংশে শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালেই এই স্তরটি বিকশিত হয়।

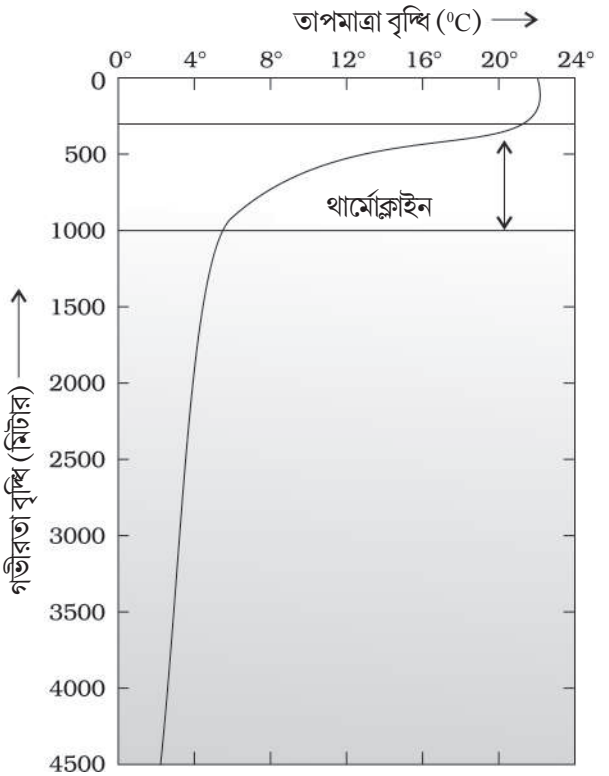

চিত্র **13.3 : থার্মোক্লাইন (Thermocline)**

প্রথম স্তরের নীচে স্থিত দ্বিতীয় স্তরটিকে থার্মোক্লাইন স্তর (thermocline layer) বলা হয়। এই স্তরটির বৈশিষ্ট্য হল গভীরতা বৃদ্ধির সাথে দ্রুত তাপমাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। থার্মোক্লাইন 500 থেকে 1000 মিটার পর্যন্ত পুরু হয়।

তৃতীয় স্তরটি খুবই শীতল এবং মহাসাগরীয় তলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। সুমেরু এবং কুমেরু বৃত্তে পৃষ্ঠ জলরাশির তাপমাত্রা 0°C এর কাছাকাছি থাকে এবং তাই গভীরতা বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রার খুব স্বল্প পরিবর্তন ঘটে। এখানে শীতল জলরাশির একটি স্তরই বিদ্যমান যা পৃষ্ঠদেশ থেকে গভীর মহাসাগরীয় তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

মহাসাগরীয় পৃষ্ঠ জলরাশির গড় তাপমাত্রা 27°C পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এটি নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে ক্রমাগত কমতে থাকে। অক্ষাংশ জনিত বৃদ্ধিতে তাপমাত্রা হ্রাসের মাত্রা সাধারণত প্রতি অক্ষাংশে 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। 20° অক্ষাংশ গড় তাপমাত্রা 22^{0}C, 40^0 অক্ষাংশে 14^{0}C এবং মেরু প্রদেশের কাছে 0^{0}C হয়ে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধে মহাসাগরীয় জলরাশির তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিরক্ষরেখায় দেখা যায় না কিন্তু নিরক্ষরেখার সামান্য উত্তর দিকে এটি দেখা যায়। উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা হল যথাক্রমে 19^{0}C এবং 16^{0}C । এই তাপমাত্রাগত পার্থক্যের কারণ হল উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের স্থলভাগ ও জলভাগের অসম বণ্টন। চিত্র 13.4-এ মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার স্থানিক নকশা দেখানো হয়েছে।

এটি একটি সুপরিচিত তথ্য যে, মহাসাগরসমূহের উচ্চতম তাপমাত্রা সর্বদা তাদের পৃষ্ঠদেশেই হয়ে থাকে কারণ তারা সূর্য থেকে সরাসরি তাপ গ্রহণ করে এবং পরিচলন প্রক্রিয়ায় এই তাপ মহাসাগরের নিম্ন স্তরে প্রেরিত হয়। এর ফলস্বরূপ গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু এই তাপমাত্রা হ্রাসের হার সর্বত্র সমান নয়। 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত তাপমাত্রা খুব দ্রুত গতিতে কমতে থাকে। এরপর তাপমাত্রা হ্রাসের হার কমে যায়।

মহাসাগরীয় জলরাশি লবণতা (Salinity of Ocean Waters) :

প্রকৃতির সব জলরাশি যেমন বৃষ্টির জল বা মহাসাগরীয় জলরাশি সর্বত্রই খনিজ লবণ মিশ্রিত রয়েছে। লবণতা (Salinity) এমন একটি শব্দ যার ব্যবহার মহাসাগরীয় জলে মিশ্রিত লবণের মাত্রা নির্ধারণের জন্য করা হয় (সারণি 13.4)। 1000 গ্রাম (1 কিলোগ্রাম) সমুদ্রের জলে মিশ্রিত লবণের (গ্রামে) পরিমাণ দ্বারা এর পরিমাপ করা হয়। এটি প্রতি 1000 এর কত ভাগ ($^o/_{oo}$) বা ppt (Parts per thousand) রূপে ব্যক্ত করা হয়। লবণতা সমুদ্র জলরাশির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 24.7 $^o/_{oo}$ লবণতাকে ক্ষার জলের সীমা নির্ধারণ করার উচ্চ সীমা হিসাবে ধরা হয়।

মহাসাগরীয় লবণতাকে যেসব কারণ প্রভাবিত করে সে কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(i) মহাসাগরসমূহের পৃষ্ঠস্তরের জলরাশির লবণতা প্রধানত বাষ্পীভবন এবং অধঃক্ষেপণের ওপর নির্ভর করে।

(ii) উপকূলীয় অঞ্চলে পৃষ্ঠদেশের লবণতা নদীর দ্বারা প্রবাহিত স্বাদু জল এবং মেরু অঞ্চলে বরফ জমাট ও বরফ গলার প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

(iii) বায়ু প্রবাহও সমুদ্র জলরাশিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে লবণতাকে প্রভাবিত করে।

(iv) সমুদ্র স্রোতেরও লবণতার পরিবর্তনশীলতায় বিশেষ অবদান রয়েছে। জলে লবণতা, তাপমাত্রা এবং ঘনত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই, তাপমাত্রা বা ঘনত্বে কোনো রকমের পরিবর্তন সেই অঞ্চলের লবণতাকে প্রভাবিত করে।

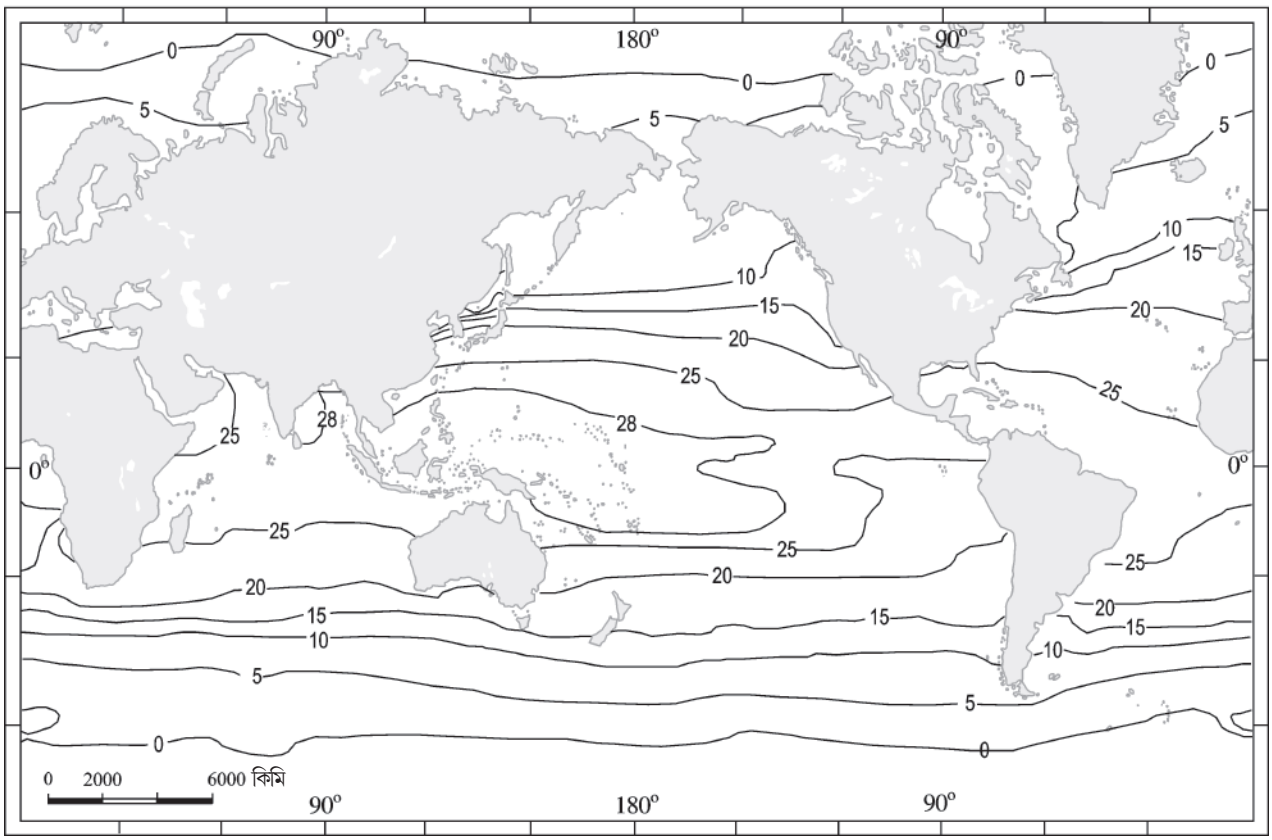

চিত্র **13.4** : মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশসমূহের তাপমাত্রার (°C) স্থানিক ধরন

জলরাশির (water bodies) লবণতা
তুর্কির লেইক ভ্যান (330 $^{o}/_{oo}$),
মৃত সাগর (238 $^{o}/_{oo}$),
বৃহৎ লবণ হ্রদে (220 $^{o}/_{oo}$) সর্বোচ্চ মাত্রায় দেখা যায়।

সারণি 13.4 : সমুদ্র জলরাশিতে মিশ্রিত লবণ প্রতি কিলোগ্রাম জলে লবণতার পরিমাণ (গ্রাম)

ক্লোরিন	18.97
সোডিয়াম	10.47
সালফেট	2.65
ম্যাগনেসিয়াম	1.28
ক্যালশিয়াম	0.41
পটাশিয়াম	0.38
বাই কার্বনেট	0.14
ব্রোমিন	0.06
বোরেট	0.02
স্ট্রোন্‌টিয়াম	0.01

লবণতার আনুভূমিক বণ্টন (Horizontal Distribution of Salinity) :

সাধারণত মুক্ত মহাসাগরের জলরাশির লবণতার প্রসর 33 $^{o}/_{oo}$ থেকে 37 $^{o}/_{oo}$ এর মধ্যে থাকে। চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা ঘেরা লোহিত সাগরে লবণতার পরিমাণ 41$^{o}/_{oo}$, যদিও সুমেরু মহাসাগর ও নদী মোহনায় লবণতার পরিমাণ 0 - 35 $^{o}/_{oo}$-এর মধ্যে ওঠা নামা করে। উষ্ণ এবং শুষ্ক অঞ্চলে, যেখানে বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি, সেখানে লবণতার পরিমাণ কখনো-কখনো 70 $^{o}/_{oo}$ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে লবণতার বিভিন্নতা দেখা যায় প্রধানত এর আকার এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রীয় বিস্তারের জন্য, উত্তর গোলার্ধের পশ্চিম ভাগে লবণতা 35 $^{o}/_{oo}$ থেকে 31 $^{o}/_{oo}$ হয়ে যায়, এর কারণ হল সুমেরু অঞ্চলে থেকে বরফ গলা জল ঐ অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। একইভাবে 15° - 20° দক্ষিণের পর লবণতা 33 $^{o}/_{oo}$ পর্যন্ত কমে যায়।

আটলান্টিক মহাসাগরের গড় লবণতা 36 $^{o}/_{oo}$ এর কাছাকাছি হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ লবণতা 15° থেকে 20° অক্ষাংশের মধ্যে লিপিভুক্ত করা হয়েছে। সর্বাধিক লবণতা (37 $^{o}/_{oo}$) 20° উত্তর থেকে 30° উত্তরে এবং 20° পশ্চিম থেকে 60° পশ্চিমে লক্ষণীয় হয়েছে। এটি ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে কমতে থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর সাগরে উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ দ্বারা অধিক লবণাক্ত জলের আগমনের ফলে অধিক লবণতা পরিলক্ষিত হয়।

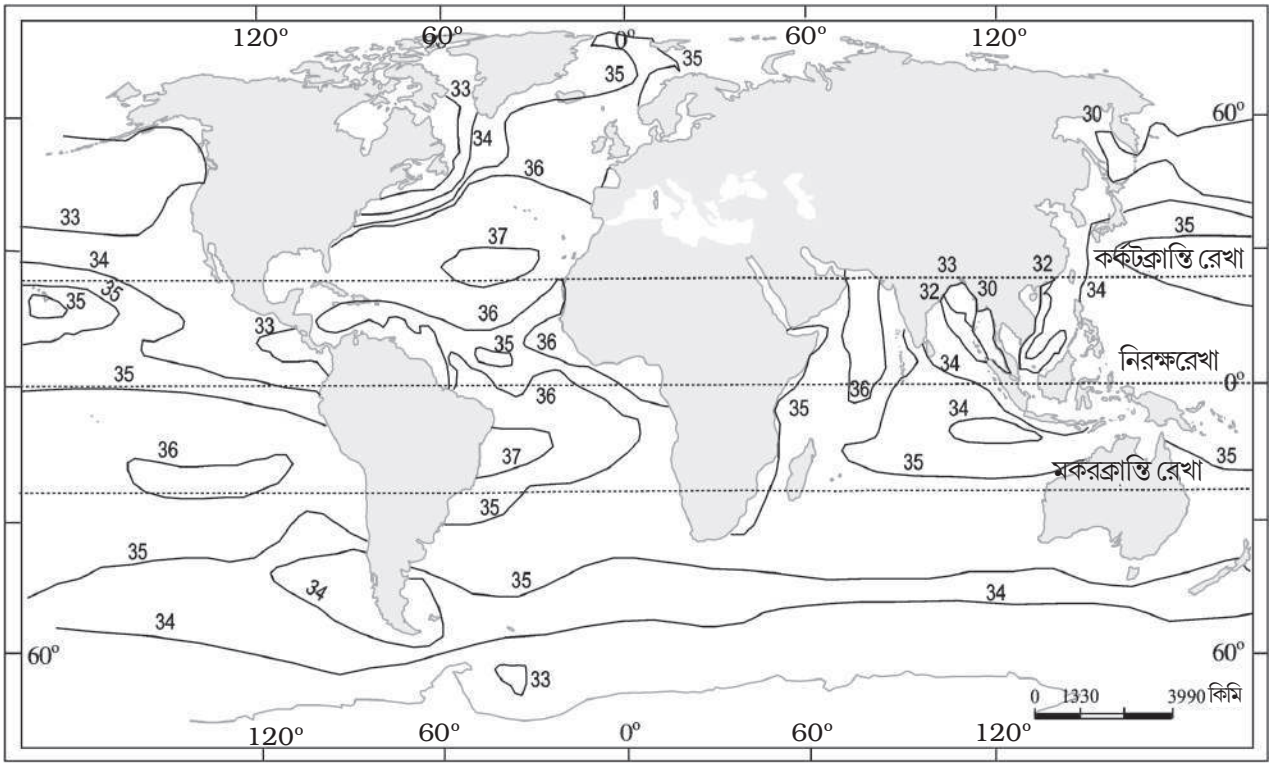

চিত্র **13.5** : পৃথিবীর মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশের লবণতার বণ্টন

অধিক মাত্রায় নদীর জলের প্রবাহের ফলে বাল্টিক সাগরে লবণতার পরিমাণ কম। ভূমধ্যসাগরে লবণতা উচ্চ বাষ্পীভবনের কারণে অধিক হয়। কৃষ্ণ সাগরে লবণতার পরিমাণ কম হওয়ার কারণ হল অধিক মাত্রায় নদী দ্বারা স্বাদু জলের প্রবাহ। কৃষ্ণ সাগরে মিলিত নদীগুলোকে মানচিত্র দেখে খুঁজে বের করো।

ভারত মহাসাগরের গড় লবণতার পরিমাণ 35 $^{o}/_{oo}$। বঙ্গোপসাগরে নদী প্রবাহের জন্য লবণতার প্রবণতা কম দেখা যায়। অন্যদিকে, উচ্চ বাষ্পীভবন এবং স্বাদু জলের নিম্ন প্রবাহের ফলে আরব সাগরের লবণতার পরিমাণ অধিক হয়ে থাকে। চিত্র 13.5-এ পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের লবণতার পরিমাণ দেখানো হল।

লবণতার উল্লম্ব বণ্টন (Vertical Distribution of Salinity): গভীরতার সাথে সাথে লবণতা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন সমুদ্রের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। পৃষ্ঠদেশের লবণতা জলের বরফে বা বাষ্পে পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়। আবার স্বাদু জলের যোগানের ফলে (যা নদী দ্বারা হয়) কমে যায়। গভীরতায় লবণতা সাধারণত স্থির থাকে, কারণ সেখানে জলের 'হ্রাস' বা লবণের মাত্রার 'বৃদ্ধি' কোনোভাবেই হয় না। মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ এবং গভীর ক্ষেত্রের মধ্যে লবণতার পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। কম লবণতা বিশিষ্ট জল অধিক লবণতা বিশিষ্ট বা অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট জলের ওপর অবস্থান করে। লবণতা সাধারণত গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এখানে হেলোক্লাইন (*halocline*) নামে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে লবণতার বৃদ্ধির হার খুবই তীব্র। যদি অন্যান্য উপাদান স্থির থাকে তবে সমুদ্র জলের লবণতা বৃদ্ধি জলের ঘনত্বকে বাড়ায়। উচ্চ লবণতাযুক্ত সমুদ্র জলরাশি সাধারণত নিম্ন লবণতাযুক্ত জলরাশির নীচে অবস্থান করে। এর ফলে লবণতার স্তর বিন্যাস (stratification) ঘটে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

(i) সেই উপাদানটি চিহ্নিত করো যেটি জলচক্র বা উদক চক্রের (hydrological cycle) অংশ নয়।

(a) বাষ্পীভবন
(b) হাইড্রেশন বা জলযোজন
(c) অধঃক্ষেপণ
(d) ঘনীভবন

(ii) মহীঢালের গড় গভীরতা নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টির মধ্যে পরিবর্তিত হয় ?

(a) 2-20 মিটার (c) 20-200 মিটার

(b) 200-2,000 মিটার (d) 2,000-20,000 মিটার

(iii) নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি মহাসাগরীয় ভূ-প্রকৃতির গৌণ বৈশিষ্ট্য নয় ?

(a) সামুদ্রিক পাহাড় (c) মহাসাগরীয় খাত

(b) অ্যাটল (d) গায়ট

(iv) লবণতাকে প্রতি সমুদ্র জলে দ্রবীভূত লবণ (গ্রাম) কোন্ মাত্রায় রয়েছে তা প্রকাশিত হয় —

(a) 10 গ্রাম (c) 100 গ্রাম

(b) 1,000 গ্রাম (d) 10,000 গ্রাম

(v) নিম্নে বর্ণিত কোন্‌টি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মহাসাগর ?

(a) ভারত মহাসাগর (c) আটলান্টিক মহাসাগর

(b) সুমেরু মহাসাগর (d) প্রশান্ত মহাসাগর

2. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) পৃথিবীকে 'নীল গ্রহ' বলা হয় কেন ?

(ii) 'মহাদেশীয় সীমন্ত' বা 'মহীসীমান্ত' কী ?

(iii) বিভিন্ন মহাসাগরীয় গভীরতম খাতগুলোর তালিকা তৈরি করো।

(iv) থার্মোক্লাইন (thermocline) কী ?

(v) সমুদ্র তলদেশে যাওয়ার পর তোমরা কোন্ তাপীয় স্তরের সম্মুখীন হবে ? গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রায় বিভিন্নতা কেন দেখা যায় ?

(vi) সমুদ্র জলরাশির লবণতা কাকে বলে ?

3. নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) জলচক্র বা উদকচক্রের (hydrological cycle) বিভিন্ন উপাদানসমূহ কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ?

(ii) মহাসাগরীয় তাপমাত্রার বণ্টনে প্রভাবিত কারণগুলো নিরীক্ষণ করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

(i) পৃথিবীর মানচিত্রের সহায়তায় মহাসাগরীয় তলদেশের ভূ-প্রকৃতিগুলোকে পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে দেখাও।

(ii) মানচিত্রের সহায়তায় ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মধ্য মহাসাগরীয় শৈলশিরা অঞ্চলগুলোকে শনাক্ত করো।

অধ্যায়

14

মহাসাগরীয় জলরাশির গতিপ্রকৃতি

MOVEMENTS OF OCEAN WATER

সমুদ্রের জল চিরগতিশীল। সমুদ্রের জলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন-উষ্ণতা, লবণতা, ঘনত্ব এবং বাহ্যিক শক্তি যেমন সূর্য, চাঁদ, বায়ু সমুদ্রের জলের সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে। জলরাশির অনুভূমিক এবং উল্লম্ব সঞ্চালন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সামুদ্রিক জলের অনুভূমিক সঞ্চালন সমুদ্রস্রোত ও তরঙ্গকে বোঝায়। উল্লম্ব সঞ্চালন বোঝায় জোয়ারকে। বিশাল পরিমাণ জলরাশি যখন একটি নির্দিষ্ট দিকে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে সমুদ্রস্রোত (Ocean currents) বলে। তরলের ক্ষেত্রে জলের সঞ্চালন হয় অনুভূমিকভাবে। সমুদ্রস্রোতের মাধ্যমে জল একস্থান থেকে আরেক স্থানে অগ্রসর হয়, তরঙ্গের ক্ষেত্রে এটা হয় না, তবে তরঙ্গের প্রবণতা থাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। উল্লম্ব চলনে সাগর ও মহাসাগরে জলরাশির ওঠানামা সম্পন্ন হয়। সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল দিনে দুবার উপরে ওঠে এবং নীচে নামে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে শীতল জলের ঊর্ধ্বগমন এবং পৃষ্ঠ জলরাশির নিমজ্জনও মহাসাগরীয় জলরাশির উল্লম্বগতির রকম বিশেষ।

তরঙ্গ (WAVES) :

প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গ হল এক ধরনের শক্তি, এটি সমুদ্রপৃষ্ঠে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলকারী জলরাশি। তরঙ্গের অতিক্রমণের সময় জলকণাগুলো শুধুমাত্র একটি বৃত্তাকার পথ ঘুরে আসে। বায়ুপ্রবাহের কারণে সমুদ্রে তরঙ্গ এগিয়ে যায় এবং এর মধ্যস্থিত শক্তি তথা তরঙ্গশক্তির নির্গমন ঘটে তটরেখায় (shoreline)। পৃষ্ঠদেশে সমুদ্রের জলের সঞ্চালন সমুদ্রের একেবারে নীচের প্রান্তের স্থির জলকেও কখনো-কখনো প্রভাবিত করে। যখন তরঙ্গ সৈকতে আসে তখন তা ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ে। এটি চিরগতিশীল জলরাশি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের মধ্যেকার সংঘর্ষের কারণে হয়। যখন জলের গভীরতা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেক হয়, তখন তরঙ্গ ভেঙে যায়। বৃহত্তম তথা সবচেয়ে বড়ো তরঙ্গগুলো উন্মুক্ত সমুদ্রে (open ocean) দেখা যায়। তরঙ্গগুলো বায়ু থেকে শক্তি নিয়ে চলতে থাকে এবং ক্রমাগত দীর্ঘ হতে থাকে।

জলের বিপরীতমুখী দিকে বাতাসের সঞ্চালনের কারণে অধিকাংশ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। 2 নট বা তার থেকে কম গতিবেগযুক্ত মৃদু এবং শান্ত বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ অথবা তরঙ্গ (ripples) গঠিত হয় এবং বায়ুর গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলো দীর্ঘ হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ভেঙে-পড়া তরঙ্গের স্থানে সাদা ফেনা দেখা যায়। ঘূর্ণমান সমুদ্রতরঙ্গ তীরে আছড়ে পড়ে ফেনিল রূপে (Surf) মিলিয়ে যাওয়ার আগে হয়তো হাজার হাজার কিমি পরিক্রমণ করে।

তরঙ্গের আয়তন ও আকৃতি দেখে এর উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা বোঝা যায়। খাড়া তরঙ্গগুলো সতেজ থাকে এবং সম্ভবত স্থানীয় বায়ু দ্বারা গঠিত হয়। কম গতিসম্পন্ন তথা ধীর প্রকৃতির তরঙ্গগুলো অনেক দূরবর্তী স্থানে সৃষ্টি হয়, সম্ভবত অন্য আর এক গোলার্ধে। বায়ু কতক্ষণ ধরে প্রবাহিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট দিকে কতদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয় — এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ বায়ুর গতিবেগ তথা শক্তির উপর বেশির ভাগ তরঙ্গের উচ্চতা নির্ধারিত হয়।

তরঙ্গের চলাচলে জলরাশিকে (তরঙ্গকে) বাতাস পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এবং এইসময়ে মহাকর্ষীয় শক্তি তার আকর্ষণ ক্ষমতায় তরঙ্গশীর্ষ (crests) কে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায়। নীচে পড়ে যাওয়া জল তরঙ্গের অবনমিত অংশকে উপর দিকে ধাক্কা দেয়, তখন তরঙ্গ একটি নতুন পর্যায়ে চলতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে

চিত্র 14.1 : তরঙ্গ ও জলীয় অণু/জলকণাগুলোর গতি

তরঙ্গের নীচে জলের চলন হয় বৃত্তাকারে। এটা এই বোঝায় যে, জলরাশি উপরের দিকে বাহিত হয়ে তরঙ্গরূপে সামনে এগিয়ে যায় এবং তারপর নীচে নেমে পিছিয়ে যায় অর্থাৎ অন্তঃতরঙ্গরূপে সমুদ্রে ফিরে আসে।

তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তরঙ্গশীর্ষ এবং তরঙ্গ খাদ (Wave crest and trough) : তরঙ্গের উচ্চতম অংশ এবং নিম্নতম অংশকে যথাক্রমে তরঙ্গশীর্ষ বা চূড়া এবং তরঙ্গ খাদ বা অবনমিত অংশ বলে।

তরঙ্গ উচ্চতা (Wave height) : তরঙ্গের অবনমিত অংশ থেকে তরঙ্গের চূড়া পর্যন্ত উল্লম্ব দূরত্বকে বলে তরঙ্গ উচ্চতা।

তরঙ্গ বিস্তার (Wave amplitude) : তরঙ্গ বিস্তার বলতে তরঙ্গ উচ্চতার অর্ধভাগকে বোঝায়।

তরঙ্গ সময় (Wave period) : পরপর দুটি তরঙ্গশীর্ষ ও তরঙ্গ খাদ কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়ে পার হতে যে সময় লাগে, তাকে তরঙ্গ সময় বলে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) : পরপর দুটি তরঙ্গ চূড়ার মধ্যবর্তী অনুভূমিক দূরত্বকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

তরঙ্গের গতি (Wave speed) : যে গতিতে জলের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ অগ্রসর হয়, তাকে তরঙ্গের গতি বলে। তরঙ্গের গতি নট এককের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (Wave frequency) : নির্দিষ্ট একটি স্থানে এক সেকেন্ডের সময়ের ব্যবধানে যে সংখ্যক তরঙ্গ অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বলে।

জোয়ারভাটা (Tides) :

প্রধানত সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণে পর্যায়ক্রমে সমুদ্রতল-এর দিনে একবার অথবা দুবার ওঠানামাকে বলে জোয়ারভাটা। আবহাওয়াগত কারণে (বায়ু ও বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনে) যখন সমুদ্র জলের চলন ঘটে অর্থাৎ প্রচণ্ড গতিতে জল ওঠা-নামা করে তাকে সার্জেস (*surges*) বলে। এটি জোয়ার ভাটার মতো নিয়মিত হয় না। জোয়ারভাটা নিয়ে অধ্যয়ন খুবই জটিল কেননা আঞ্চলিক ও সাময়িকভাবে এর কম্পাঙ্ক, প্রাবল্য এবং উচ্চতার মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্য রয়েছে।

সূর্যের আকর্ষণ শক্তির তুলনায় চাঁদের আকর্ষণ শক্তি বেশি — এই দুই আকর্ষণ শক্তি জোয়ারভাটা সংঘটনের প্রধান দুটি কারণ। অন্য কারণটি হল কেন্দ্রাতিগ বল। এই বল মহাকর্ষীয় শক্তির বিপরীতে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পৃথিবীতে দুটি প্রধান জোয়ারজনিত স্ফীত অংশ বা জোয়ারের জলস্ফীতির (tidal bulge) জন্য দায়ী। পৃথিবীর যে দিক চাঁদের সামনে আছে সেখানে চাঁদের আকর্ষণের কারণে জলস্ফীতি ঘটায় স্ফীত অংশ সৃষ্টি হয়, আর তার বিপরীত দিকে যেখানে দূরত্বের কারণে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি কম, সেখানে কেন্দ্রাতিগ বলের কারণে জোয়ারি স্ফীত অংশ সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 14.2)।

চাঁদের আকর্ষণশক্তি এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি (জোয়ারভাটা সৃষ্টিকারী শক্তি) — এই দুটির পার্থক্যের কারণে জোয়ারভাটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। চাঁদের নিকটস্থ পৃথিবীর কোনো স্থানের উপর কেন্দ্রাতিগ বলের থেকেও চাঁদের টান তথা আকর্ষণ শক্তি বেশি থাকে। তাই চাঁদের আকর্ষণের পুরো শক্তি পৃথিবীস্থ ওই স্থানটিতে জলস্ফীতি ঘটিয়ে জোয়ারজনিত স্ফীতভাগ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিপরীত দিকে আকর্ষণ শক্তি কম কারণ এটি চাঁদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাব এখানে প্রবল হয়ে ওঠে। তাই কেন্দ্রাতিগ বলের পুরোটাই চাঁদ থেকে দূরবর্তী ঐ স্থানটিতে কার্যকরী হয়ে ওঠে। এটা চাঁদ থেকে দূরবর্তী স্থানে জোয়ারজনিত দ্বিতীয় স্ফীত ভাগটি সৃষ্টি করে। ভূপৃষ্ঠে জোয়ারি স্ফীত ভাগ সৃষ্টিকারী উল্লম্ব বল থেকে জোয়ারভাটা সৃষ্টিকারী অনুভূমিক বল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশস্ত মহীসোপান অঞ্চলে সৃষ্ট জোয়ারজনিত স্ফীত অংশগুলো

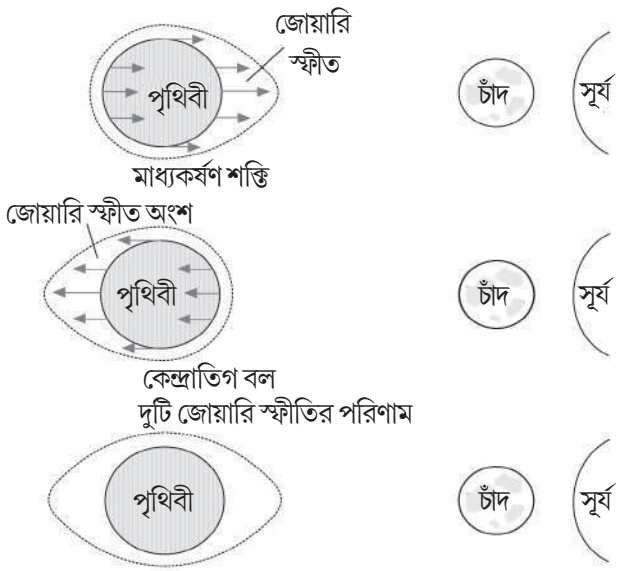

চিত্র 14.2 : মহাকর্ষীয় বল ও জোয়ারভাটার সম্পর্ক

অধিকতর উচ্চ হয়। মধ্য মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে সৃষ্ট জোয়ারি স্ফীত ভাগগুলোর উচ্চতা কম হয়। উপকূলরেখা বরাবর উপসাগর ও মোহনায় আকৃতি জোয়ারের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে দেয় ফানেল আকৃতির উপসাগর এবং মোহনাতে জোয়ারের জলস্ফীতি বেশি হয় এবং এখানে জোয়ারের উচ্চতা (10-16 মিটার) সবচেয়ে বেশি হয়। দ্বীপপুঞ্জগুলোতে উপসাগর ও মোহনাগুলোতে প্রণালীর মধ্য দিয়ে জোয়ারের জল প্রবেশ করলে তখন এ জোয়ারকে বলে জোয়ারি স্রোত (*tidal current*)।

কানাডার ফান্ডি উপসাগরে জোয়ারভাটা

পৃথিবীর উচ্চতম জোয়ার পরিলক্ষিত হয় কানাডাতে অবস্থিত নোভা স্কোটিয়ার ফান্ডি উপসাগরে। এর জোয়ারের স্ফীত অংশ 15-16 মিটার হয়। কারণ সেখানে প্রতিদিন (প্রায় 24 ঘণ্টা সময়) দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। প্রতিটি জোয়ারভাটা প্রতি ছয় ঘন্টা সময়ের মধ্যে আসবেই। সাধারণ অনুমানে বলা যায়, প্রতিটি জোয়ারে জল প্রতি এক ঘণ্টায় 240 সেমির (1440 সেমিকে 6 ঘণ্টা দিয়ে ভাগ করে) উপরে ওঠে। যদি তুমি কোনো সৈকতে (beach) খাড়া ভৃগু বরাবর (যেটা এখানে সাধারণ ঘটনা) হেঁটে থাক, তাহলে নিশ্চিতভাবে তুমি জোয়ারকে দেখেছ। যদি তুমি এক ঘণ্টা ধরে হেঁটে থাক, লক্ষ করবে যে, জোয়ার আসছে তুমি যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিলে পিছিয়ে ওই স্থানে ফিরে যাওয়ার আগেই জল তোমার মাথার উপরে চলে আসবে।

জোয়ারভাটার প্রকারভেদ (Types of Tides) :

স্থানভেদে এবং সময়ে সময়ে (মাঝে মাঝে) জোয়ারভাটার দিক এবং গতিতে পার্থক্য হয়। জোয়ারভাটার শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে — এই শ্রেণিবিভাগ 1 দিন অথবা 24 ঘণ্টায় কতবার জোয়ারভাটা সংঘটিত হচ্ছে তার উপর অথবা তাদের উচ্চতার উপর নির্ভর করে হয়।

পরিসংখ্যানভিত্তিক জোয়ারভাটা (*Tides based on Frequency*)

অর্ধ-দৈনিক জোয়ারভাটা (Semi-diurnal tide) : এ ধরনের জোয়ার সবচেয়ে বেশি হয় — এতে প্রত্যেকদিন দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। ধারাবাহিকভাবে আসা জোয়ার ও ভাটাগুলো প্রায় একই উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

দৈনিক জোয়ার (Diurnal tide) : এতে প্রত্যেক দিনে শুধুমাত্র একবার জোয়ার ও একবার ভাটা হয়। ধারাবাহিক পর্যায়ে আসা জোয়ারভাটার উচ্চতা আনুমানিকভাবে প্রায় একই হয়।

মিশ্র জোয়ার (Mixed tide) : যখন জোয়ারভাটার উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে মিশ্র জোয়ারভাটা বলে। এই জোয়ারভাটা সাধারণত উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জে পরিলক্ষিত হয়।

সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর অবস্থানভিত্তিক জোয়ারভাটা (Tides based on the Sun, Moon and the Earth Positions) : পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য ও চাঁদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে জলের উপরে ওঠার উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। ভরাকোটাল (*Spring tide*) এবং মরাকোটাল (*Neap tide*) হল এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জোয়ার।

ভরাকোটাল (*Spring tide*) : পৃথিবীর সঙ্গে উভয় তথা সূর্য ও চাঁদের অবস্থানগত সম্পর্ক জোয়ারের উচ্চতা নির্ধারণের দায়িত্ব বহন করে। যখন সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একটি সরলরেখায় অবস্থান করে জোয়ারের উচ্চতা তখন উচ্চতর হবে। এগুলোকে ভরাকোটাল বলে। এগুলো মাসে দুবার হয়। একটি হয় পূর্ণিমায় এবং আর একটি হয় অমাবস্যায়।

মরাকোটাল (*Neap tide*) : সাধারণত ভরাকোটাল ও মরাকোটালের মাঝখানে সাতদিনের ব্যবধান হয়ে থাকে। এই সময়ে সূর্য ও চাঁদ পরস্পরের প্রতি সমকোণে অবস্থান করে এবং সূর্য ও চাঁদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী আকর্ষণ কাজ করে। চাঁদের আকর্ষণ সূর্যের চেয়ে দ্বিগুণ হওয়ায় সূর্যের আকর্ষণজনিত টান কমে যায়।

মাসের মধ্যে একবার যখন চাঁদের কক্ষ পৃথিবীর খুব কাছে অবস্থান করে (প্যারিগি অবস্থান) তখন সাধারণত জোয়ারভাটা সংঘটিত হয়। এই সময়ে জোয়ারভাটার পরিসীমা স্বাভাবিক থেকে বেশি থাকে। দুই সপ্তাহ পর চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে (অ্যাপোগি অবস্থান) থাকে, চাঁদে মহাকর্ষীয় শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং জোয়ারভাটার পরিসীমা স্বাভাবিক থেকে কমে যায়।

প্রত্যেক বছর 3 জানুয়ারিতে পৃথিবী যখন সূর্যের নিকটতম অবস্থানে (অনুসূরীয় অবস্থান) তখন জোয়ারভাটার পরিসীমা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। যখন 4 জুলাই পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে (অপসূরীয় অবস্থান) জোয়ারের পরিসীমা স্বাভাবিক থেকে কম থাকে।

উচ্চ জোয়ার এবং নিম্ন জোয়ারের মধ্যবর্তী সময়ে যখন জলতল নামতে থাকে, তাকে বলে ভাটা (ebb)। নিম্ন জোয়ার ও উচ্চ জোয়ারের মধ্যবর্তী সময়ে যখন জলতল উপরে উঠতে থাকে, তাকে বলে **প্রবাহ বা জোয়ার** (*flow* or *flood*)।

জোয়ারভাটার গুরুত্ব (Importance of Tides) :

সূর্য-চাঁদ-পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থানের (যেটা আমাদের সঠিকভাবে জানা আছে) উপর নির্ভর করে জোয়ারভাটা সৃষ্টি হয়। তাই জোয়ারের আগাম পূর্বাভাস ভালোভাবে করা যায়। এটা নাবিক ও জেলেদেরকে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে সাহায্য করে। নৌ-চালনায় জোয়ারের প্রবাহের খুব গুরুত্ব রয়েছে। মোহনা থেকে নদীতীরস্থ পোতাশ্রয়গুলোতে প্রবেশের মুখে নদীবাহিত পলি জমে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে যায় এবং এতে নদী অগভীর হয়ে পড়ে, এর ফলে জাহাজ ও নৌকা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি হয়। জোয়ারের জল নদীর তলদেশে সঞ্চিত পলিস্তর এবং নদী মোহনা থেকে দূষিত জল সরাতে সাহায্য করে। জোয়ারভাটার শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (কানাডায়, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় এবং চিনে)। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দুর্গাদাওনিতে একটি 3 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জোয়ারভাটাজনিত বিদ্যুৎশক্তি প্রকল্পের কাজ চলছে।

সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents) :

নদী প্রবাহের মতো সমুদ্রস্রোত হল মহাসাগরস্থিত জলের প্রবাহ। একটি নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জলরাশি যখন নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়, তাকে সমুদ্রস্রোত বলে। সমুদ্রস্রোত দুধরনের শক্তি দ্বারা প্রবাহিত হয় : (i) প্রাথমিক শক্তিগুলো জলরাশিকে সঞ্চালনে উদ্যোগী করে তোলে (ii) গৌণ শক্তিগুলো স্রোতকে প্রবাহিত হতে প্রভাবিত করে।

সমুদ্রস্রোতে প্রভাবকারী প্রাথমিক শক্তিগুলো হল — (i) সৌরশক্তি থেকে সৃষ্ট তাপ (ii) বায়ুপ্রবাহ (iii) মহাকর্ষীয় বল (iv) কেন্দ্রাতিগ বল। সূর্য তাপে উত্তপ্ত হলে জলভাগ প্রসারিত হয়। এজন্যই মধ্য অক্ষাংশ থেকে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র জলতল 8 সেমি বেশি উঁচু হয়। এই কারণে অতি মৃদু নতিঢাল (gradient) সৃষ্টি হয় এবং জলরাশির প্রবণতা থাকে ঐ ঢাল বরাবর নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার। সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ু জলকে সঞ্চালনের জন্য ধাক্কা দেয়। বায়ু এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের সংঘর্ষ জলরাশিকে তার গতিপথে চলার জন্য প্রভাবিত করে। মহাকর্ষীয় বল জলরাশিকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে নতিঢালের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে (intervenes) উত্তর গোলার্ধে জলরাশি ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে বেঁকে যায়। এই বিশাল পরিমাণ জলারাশির একত্রীকরণ এবং নিজেদের চারদিকে আবর্তনকে বলে জায়ার্স (*Gyres*)। এ ধরনের ঘূর্ণন সমূহ সকল (ocean basin) মহাসাগরীয় বেসিনে বিশালকায় চক্রাকার স্রোতের সৃষ্টি করে।

সমুদ্রস্রোতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্রোতগুলোর শক্তি তাদের 'প্রবাহ' (drift) দ্বারা বোঝা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে 5 নটের বেশি গতিবেগযুক্ত স্রোতগুলো খুব শক্তিশালী হয়। সমুদ্রের গভীরে অবস্থিত স্রোতগুলো সাধারণত খুবই ধীর হয়, এদের গতিবেগ 0.5 নট-এর থেকেও কম। আমরা স্রোতের গতিবেগকে 'প্রবাহ' বলে থাকি। প্রবাহ নট এককে প্রকাশ করা হয়। কোনো একটি স্রোতের শক্তি বলতে তার গতিবেগকে বোঝায়। একটি দ্রুতগামী স্রোত শক্তিশালী হয়ে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠে একটি স্রোত সবচেয়ে শক্তিশালী হয় এবং গভীরতার সঙ্গে স্রোতের গতিবেগ তথা শক্তি কমতে থাকে। বেশির ভাগ স্রোতের গতিবেগ 5 নটের সমান অথবা তার থেকে কম হয়।

সামুদ্রিক জলের ঘনত্বের পার্থক্য সমুদ্রস্রোতের উল্লম্ব গতিশীলতাকে (vertical mobility) প্রভাবিত করে। বেশি লবণতাযুক্ত জল, কম লবণতাযুক্ত জল থেকে ভারী হয়। সেরকমভাবে শীতল জল, উষ্ণ জল থেকে ভারী হয়। ভারী জলের প্রবণতা থাকে ডুবে যাওয়ার, আর হালকা জলের প্রবণতা থাকে উপরে ভেসে থাকার। মেরু অঞ্চলে শীতল জলের সমুদ্রস্রোত ভারী হওয়ায় এটি মগ্ন (sink) থাকে এবং ধীরে ধীরে নিরক্ষরেখার দিকে চলতে থাকে। উষ্ণ জলের স্রোতগুলো নিরক্ষরেখা থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর উপরে ভেসে চলতে থাকে এবং এই স্রোতগুলো মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় শীতল জলকে প্রতিস্থাপিত করতে।

সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ (Types of Ocean Currents):

সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ জলের গভীরতার উপর ভিত্তি করে হয়। যেমন-পৃষ্ঠদেশীয় স্রোত এবং গভীর জলের স্রোত। (i) পৃষ্ঠদেশীয় স্রোত (*surface current*) মহাসাগরীয় জলের 10 শতাংশ জুড়ে আছে এবং এই জলরাশি মহাসাগরের ঊর্ধ্বাংশের 400 মিটার-এর মধ্যেই থাকে। (ii) গভীর স্রোত — এই স্রোত মহাসাগরীয় জলের 90 শতাংশ নিয়ে আছে। ঘনত্ব ও মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্যের জন্য এই জল সমুদ্র অববাহিকার চারদিকে ঘুরতে থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে উষ্ণতা যথেষ্ট কম হওয়ায় জলের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং এই কারণে এই স্রোত সমুদ্রে চলে যায়।

উষ্ণতার ভিত্তিতেও সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন-শীতল স্রোত ও উষ্ণ স্রোত। (i) শীতল স্রোত (*cold current*) — শীতল স্রোত উষ্ণ জলযুক্ত অঞ্চলে শীতল জল বয়ে আনে। এই স্রোতগুলো সাধারণত নিম্ন ও মধ্য অক্ষাংশের (উভয় গোলার্ধে) মহাদেশের পশ্চিম উপকূলীয় অংশে এবং উত্তর গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা যায়। (ii) উষ্ণস্রোত (*warm current*) — শীতল জলযুক্ত অঞ্চলে উষ্ণ জল বয়ে নিয়ে আসে এবং সাধারণত নিম্ন ও মধ্য অক্ষাংশের (উভয় গোলার্ধে) মহাদেশগুলোর পূর্ব উপকূলীয় অংশে দেখা যায়। উত্তর গোলার্ধে উচ্চ অক্ষাংশে এই উষ্ণ স্রোত মহাদেশগুলোর পশ্চিম উপকূলীয় অংশে পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান প্রধান স্রোতসমূহ (*Major Ocean Currents*) :

সাময়িক বায়ু (prevailing wind) এবং কেন্দ্রাতিগ বল প্রয়োগের কারণে উদ্ভূত চাপ দ্বারা অধিকাংশ সমুদ্রস্রোত প্রভাবিত হয়। সামুদ্রিক সঞ্চালনের ধরন এবং পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চলনের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে। মধ্য অক্ষাংশে সমুদ্র উপরিস্থ বায়ুর সঞ্চালন প্রধানত প্রতীপ ঘূর্ণবাতজনিত কারণে (উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে অধিকতর) হয়ে থাকে। সামুদ্রিক সঞ্চালনের ধরনের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য রয়েছে। উচ্চ অক্ষাংশে যেখানে অধিকাংশ বায়ুপ্রবাহ ঘূর্ণবাতজনিত কারণে হয়ে থাকে, সামুদ্রিক সঞ্চালন এই ধরনকে অনুসরণ করে। মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু সমুদ্রস্রোতের চলনকে প্রভাবিত করে। কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে নিম্ন অক্ষাংশে উষ্ণ স্রোতের উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

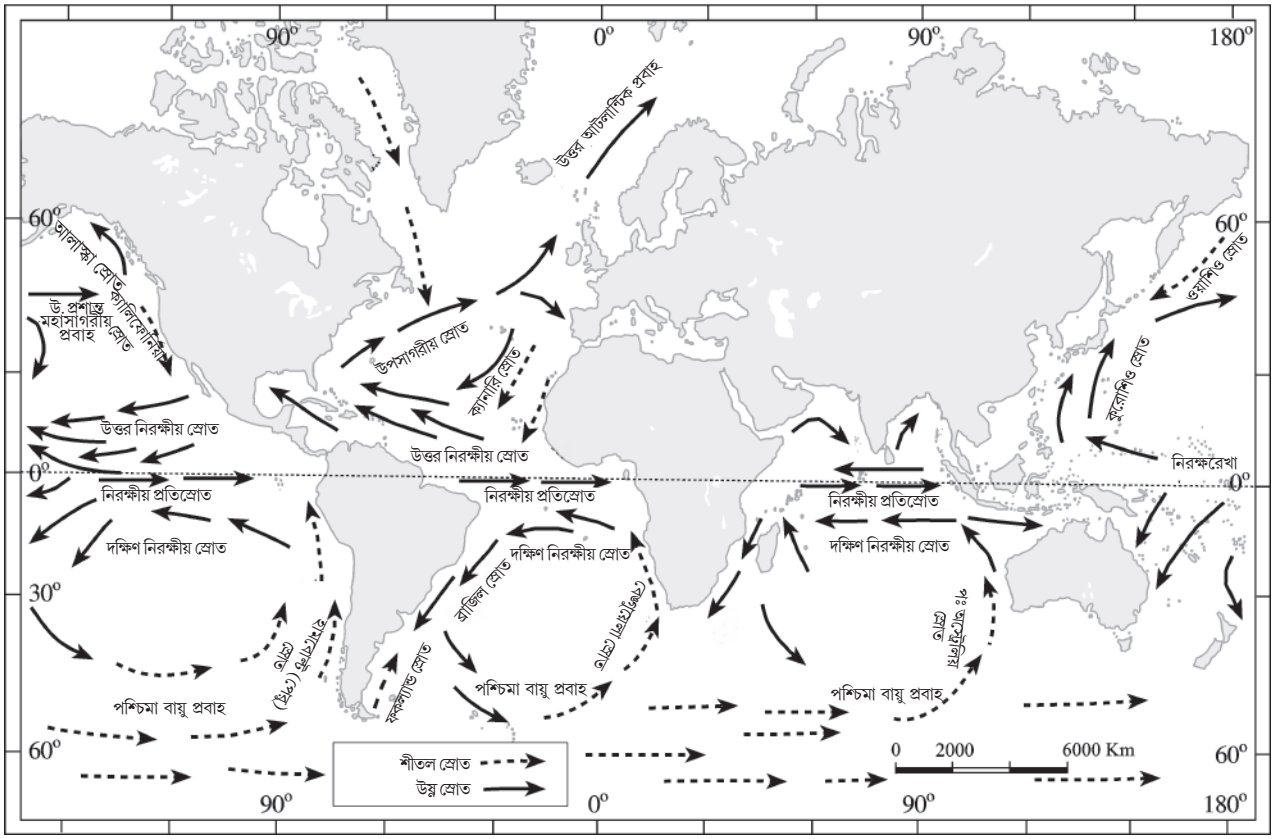

চিত্র 14.3 : প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের প্রধান প্রধান স্রোতসমূহ

বায়ুমণ্ডলে যেমন বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে তাপের পরিবহণ হয় ঠিক সেইভাবে সামুদ্রিক সঞ্চালনের মাধ্যমে তাপ একটি অক্ষাংশগত বলয় থেকে আর একটি বলয়ে পরিবাহিত হয়। সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত থেকে শীতল জল ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ জলের দিকে ধাবিত হয়, আবার নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ জল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন মহাসাগরের প্রধান প্রধান স্রোতগুলোকে চিত্র 14.3 -তে দেখানো হয়েছে।

প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

সাময়িক বায়ু কীভাবে সমুদ্রস্রোতের গতিকে প্রভাবিত করে? চিত্র 14.3 থেকে কিছু উদাহরণ দেখাও।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব (*Effects of Ocean Currents*) :

মানব জীবনের উপর সমুদ্রস্রোতের অনেকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অক্ষাংশগুলোতে (নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী ছাড়া) অবস্থিত মহাদেশগুলোর পশ্চিম উপকূলগুলোতে শীতল জলের কারণে ঐ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয় — এখানকার দৈনিক এবং বার্ষিক তাপমাত্রার পার্থক্য সামান্যই। সাধারণত এই অঞ্চল শুষ্ক কিন্তু এখানে কুয়াশা দেখা যায়। মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত মহাদেশগুলোর পশ্চিম উপকূলগুলো উষ্ণ জলের দ্বারা আবৃত যা এখানকার সামুদ্রিক জলবায়ুকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এই অঞ্চলগুলোর বৈশিষ্ট্য হল শীতল গ্রীষ্মকাল এবং তুলনামূলকভাবে মৃদু শীতকাল, এখানকার বার্ষিক তাপমাত্রার পরিসীমা সামান্য। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অক্ষাংশে অবস্থিত মহাদেশগুলোর পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়। এর ফলে এ অঞ্চলে উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ু দেখা যায়। এই অঞ্চলুগলো উপক্রান্তীয় প্রতীপ ঘূর্ণবাতযুক্ত অঞ্চলের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনের ফলে জলে অক্সিজেনের সংযুক্তি আরও বাড়িয়ে দেয় যা মাছের প্রধান খাদ্য, প্লাঙ্কটনের বৃদ্ধির জন্য দরকার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মৎস্যক্ষেত্রগুলো প্রধানত এই মিলনস্থলগুলোতে (উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থল) অবস্থিত।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) সমুদ্রজলের ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী গতি এই নামে পরিচিত :

(a) জোয়ারভাটা (c) তরঙ্গ

(b) স্রোত (d) উপরের কোনোটিই নয়

(ii) ভরাকোটাল যে কারণে হয় :

(a) চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীকে একই দিক থেকে আকর্ষণ করে।

(b) চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীকে বিপরীত দিক থেকে আকর্ষণ করে।

(c) খাঁড়িযুক্ত উপকূলরেখা।

(d) উপরের কোনোটিই নয়।

(iii) পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব যখন ন্যূনতম হয়, তখন চাঁদের অবস্থানকে বলে —

(a) অপসূরীয় অবস্থান (c) অনুসূরীয় অবস্থান

(b) প্যারিগি (d) অ্যাপোগি

(iv) পৃথিবী অনুসূর অবস্থানে পৌঁছায় যে মাসে —

(a) অক্টোবর (c) জুলাই

(b) সেপ্টেম্বর (d) জানুয়ারি

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) তরঙ্গ কী?

(ii) সমুদ্রের তরঙ্গগুলো কোথা থেকে শক্তি পায়?

(iii) জোয়ারভাটা কী?

(iv) জোয়ারভাটা কীভাবে হয়?

(v) স্রোত কীভাবে নৌচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) স্রোত কীভাবে তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে? এটা কীভাবে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূলীয় অঞ্চলের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে?

(ii) সমুদ্রস্রোতের কারণগুলো লেখো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

(i) একটি হ্রদ অথবা পুকুর পরিদর্শন করো এবং তাতে তরঙ্গের গতি পর্যবেক্ষণ করো। ওই পুকুরে বা হ্রদে একটি পাথর নিক্ষেপ করো এবং লক্ষ করো কীভাবে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে?

(ii) এমন একটি ভূগোলক এবং একটি মানচিত্র নাও, যার মধ্যে সামুদ্রিক স্রোতগুলোকে দেখানো হয়েছে। আলোচনা করো, সামুদ্রিক স্রোতগুলোর মধ্যে কিছু কেন উষ্ণ এবং কিছু শীতল এবং তাদের মধ্যে কেন কতগুলো স্রোত নির্দিষ্ট জায়গায় দিক্ পরিবর্তন করে এবং এর কারণগুলো পরীক্ষণ করো।

একক : VI

পৃথিবীতে জীবন

এই এককে আলোচিত বিষয়গুলো হল :

- জীবমণ্ডল - উদ্ভিদকুল ও অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর গুরুত্ব; বাস্তুতন্ত্র, জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র এবং বাস্তুসংস্থানিক সমতা; জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ।

অধ্যায় 15

পৃথিবীতে জীবন
LIFE ON THE EARTH

এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে এখন পর্যন্ত তোমরা পরিবিশের তিনটি পরিমণ্ডল যথা - শিলামণ্ডল, বায়ুমণ্ডল এবং জলমণ্ডল-এর বিষয়ে জানতে পেরেছ। তোমরা জান যে, পৃথিবীর সকল জীবন্ত জীবসমূহ যাদের নিয়ে জীবমণ্ডল গঠিত হয় তা পরিবেশের অন্যান্য মণ্ডলের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া করে। পৃথিবীর সকল জীবিত উপাদান জীবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। জীবমণ্ডল পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গঠিত।

> পৃথিবীতে জীবন প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। জীবিত জীব পাওয়া যায় মেরু থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চল, সমুদ্র তলদেশ থেকে বায়ুর কয়েকশো কিমি. পর্যন্ত, বরফ জমা জল থেকে শুষ্ক উপত্যকা, সমুদ্রের গভীর থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত ভৌমজল পর্যন্ত।

অধিকাংশ জীব শিলামণ্ডলেই পাওয়া যায় কিন্তু কিছু কিছু জীব জলমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলেও বাস করে। এমন বহু জীবও আছে যা এক মণ্ডল থেকে অন্য মণ্ডলে অবাধভাবে বিচরণ করে।

জীবমণ্ডল ও তার উপাদান পরিবেশের খুবই অপরিহার্য অংশ। এই উপাদানসমূহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য যেমন - ভূমি, জল এবং মৃত্তিকার সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া করে। এগুলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান যথা - তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং সূর্যরশ্মি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। স্থল, বায়ু এবং জলের সাথে জীবমণ্ডলের পারস্পরিক ক্রিয়া জীবসমূহের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বিবর্তনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাস্তুবিদ্যা (ECOLOGY) :

তোমরা বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত এবং পরিবেশগত নানা সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে নিশ্চয়ই পড়ে থাক। তোমরা কি কখনও ভেবেছ বাস্তুবিদ্যা কী? তোমরা জান যে, পরিবেশ অজীবজাত ও জীবজাত উপাদান দ্বারা গঠিত। এটি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে বৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়। এই সমতা বজায় রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন প্রাণী বা জীবগোষ্ঠী থাকা প্রয়োজন যাতে জৈব এবং অজৈব উপাদানের মধ্যে সুস্থ পারস্পরিক ক্রিয়া চলতে পারে। **বাস্তুসংস্থান তন্ত্র** (*ecological systems*) বলতে একটি নির্দিষ্ট আবাসস্থলে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জীবের সাথে অজীবজাত উপাদান যথা - স্থল, জল এবং বায়ুর এমন পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায় যার ফলস্বরূপ এদের মধ্যে শক্তিপ্রবাহ এবং বিভিন্ন ভৌতচক্র স্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়, তাকে বাস্তুসংস্থান তন্ত্র বলে।

> ইকোলজি (ecology) শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্টি। যথা - 'oikos' যার অর্থ হল house বা আবাস এবং 'logy' যার অর্থ হল 'বিজ্ঞান' বা 'অধ্যয়ন'। আক্ষরিক অর্থে বাস্তুবিদ্যা হল পৃথিবীতে উদ্ভিদ, মানব, পশু এবং অণুজীবদের বাসস্থানরূপে অধ্যয়ন। এরা সকলেই আন্তঃনির্ভরশীল উপাদান হিসেবে একসাথে বসবাস করে। একজন জার্মান প্রাণীবিদ আর্নেস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) 1869 সালে সর্বপ্রথম বাস্তুবিদ্যা (ecology) শব্দটি ব্যবহার করেন 'oekologie' রূপে। জীবগোষ্ঠী (জীবজাত) এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ (অজীবজাত) এর পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ন হল বাস্তুবিদ্যার বিজ্ঞান (science of ecology)। অতএব জীবগোষ্ঠীর পরস্পরের সঙ্গে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নই হল বাস্তুবিদ্যা।

বাস্তুতান্ত্রিক (*ecological*) অর্থ অনুযায়ী **আবাস** (Habitat) হল পরিবেশের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উপাদানের সমষ্টি। জীবজাত ও অজীবজাত উপাদান দ্বারা গঠিত তন্ত্র বা রীতিকে **বাস্তুতন্ত্র বা**

বাস্তুরীতি (ecosystem) বলে। বাস্তুতন্ত্রের এই সকল উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকারের বাস্তুতন্ত্র পাওয়া যায় যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অভিযোজিত হয়েছে। এই বিষয়কে **বাস্তু অভিযোজন** (*ecological adaptation*) বলে।

বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ (Types of Ecosystems)

বাস্তুতন্ত্র প্রধানত দুপ্রকার যথা - **স্থলজ** (*terrestrial*) বাস্তুতন্ত্র এবং **জলজ** (*aquatic*) বাস্তুতন্ত্র। স্থলজ বাস্তুতন্ত্রকে আবার **'বায়োম'** (*biomes*)-এ বিভক্ত করা যেতে পারে। বায়োম হল এক বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়। স্থলভূমিতে 'বায়োম'-এর সীমানা প্রধানত জলবায়ু দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। অতএব 'বায়োম' বলতে বোঝায় বিশেষ পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্কের একত্রীকরণ। বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং মৃত্তিকার অবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বায়োম হল বনভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি এবং তুন্দ্রা বায়োম। জলজ বাস্তুতন্ত্রকে লবণাক্ত জলের বাস্তুতন্ত্র এবং স্বাদুজলের বাস্তুতন্ত্রে ভাগ করা যেতে পারে। লবণাক্ত জলের বাস্তুতন্ত্রে মহাসাগর, মোহনা এবং প্রবাল প্রাচীর অন্তর্ভুক্ত। স্বাদুজলের বাস্তুতন্ত্রে হ্রদ, পুকুর, নদী এবং জলাভূমির বাস্তুতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত।

বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলি (Structure and Functions of Ecosystem) :

কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্রে ওই স্থানে উপস্থিত উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। গঠনগত দিক থেকে সকল প্রকার বাস্তুতন্ত্র অজীবজাত ও জীবজাত উপাদান দ্বারা গঠিত। জড় বা অজীবজাত উপাদানগুলো হল বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, সূর্যালোক, বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা, মৃত্তিকার অবস্থা, অজৈব পদার্থ (কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম ইত্যাদি)। সজীব বা জীবজাত উপাদান হল উৎপাদক, খাদক (প্রাথমিক, গৌণ বা দ্বিতীয় শ্রেণি, প্রগৌণ বা তৃতীয় শ্রেণি) এবং বিয়োজক। উৎপাদকরা হল সকল প্রকার সবুজ উদ্ভিদ যারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করে। প্রাথমিক খাদকরা হল তৃণভোজী প্রাণীসমূহ যথা হরিণ, ছাগল, ইঁদুর এবং অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণী। মাংসাশী প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণীর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে যথা - সাপ, বাঘ এবং সিংহ। এমন অনেক মাংসাশী প্রাণী আছে যারা অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের ভক্ষণ করে, এদের সর্বোচ্চ মাংসাশী প্রাণী বলে। যেমন - বাজপাখি, চিল এবং নেউল ইত্যাদি। যারা মৃত জীবদের ভক্ষণ করে (উদাহরণস্বরূপ শকুন এবং কাক) এবং অন্যান্য বিয়োজককারী যথা - ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন অণুজীবসমূহ দ্বারা মৃতদেহগুলো আরও বিয়োজিত হয়।

প্রাথমিক খাদকরা খাদ্যের জন্য উৎপাদকের ওপর নির্ভর করে আবার গৌণ খাদকরা প্রাথমিক খাদকদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পুনরায় গৌণ খাদকদের প্রগৌণ খাদকরা ভক্ষণ করে। বিয়োজকরা প্রত্যেক স্তরের মৃত দেহাবশেষ বিয়োজিত করে। বিয়োজকরা এদের (মৃত দেহাবশেষ) বিভিন্ন পদার্থে যেমন - পুষ্টিকর পদার্থ, জৈব ও অজৈব লবণে পরিবর্তিত করে যা মৃত্তিকার উর্বরতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি বাস্তুতন্ত্রের জীবসমূহ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে একে

চিত্র **15.1** : বাস্তুতন্ত্রের গঠন এবং কার্যাবলি

অপরের সাথে জড়িত থাকে (চিত্র 15.1)। উদাহরণস্বরূপ ধানের ওপর নির্ভরশীল কোনো পতঙ্গকে (গোবরে পোকা) ব্যাঙ এবং ব্যাঙকে সাপ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই সাপকে আবার একটি বাজপাখি ভক্ষণ করে। এই পর্যায়ক্রমিক খাদ্যগ্রহণ ও কোনো প্রাণীর খাদ্য হওয়া এবং ফলস্বরূপ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে শক্তির স্থানান্তরকে **খাদ্যশৃঙ্খল** (food chain) বলে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে শক্তির স্থানান্তরকরণকে **শক্তির প্রবাহ** (*flow of energy*) বলে। তবে, খাদ্যশৃঙ্খলসমূহ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি ইঁদুর খাদ্যের জন্য খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করে, সেই ইঁদুরকে আবার বিভিন্ন প্রকারের গৌণ খাদকরা (মাংসাশী প্রাণী) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই মাংসাশী প্রাণীদের বিভিন্ন প্রগৌণ খাদকরা ভক্ষণ করে (সর্বোচ্চ মাংসাশী প্রাণী)। এমতাবস্থায়, সকল মাংসাশী প্রাণীরা একাধিক শিকারের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে খাদ্যশৃঙ্খলগুলো একটি অপরটির সাথে আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে পড়ে। জীবসমূহের এই আন্তঃসম্পর্কিত জালকে **খাদ্যজাল বা খাদ্যজালিকা** (*food web*) বলে। সাধারণত দু'প্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়, যথা-চারণভূমির খাদ্যশৃঙ্খল এবং জলাভূমির খাদ্যশৃঙ্খল। চারণভূমির খাদ্যশৃঙ্খল উদ্ভিদ (উৎপাদক) দিয়ে শুরু হয়ে মাংসাশী (প্রগৌণ খাদক) প্রাণীতে শেষ হয়, যেখানে তৃণভোজী বা শাকাহারী প্রাণীরা মধ্যম স্তরে থাকে। শ্বসন, রেচন এবং বিয়োজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক স্তরে শক্তি হ্রাস পায়। খাদ্যশৃঙ্খলে তিন থেকে পাঁচটি স্তর থাকে এবং প্রত্যেক স্তরে শক্তির হ্রাস পায়। ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল (*detritus food-chain*) চারণভূমির খাদ্যশৃঙ্খল থেকে প্রাপ্ত মৃত পদার্থের ওপর নির্ভর করে এবং এতে জৈব পদার্থের বিয়োজনও ঘটে থাকে।

বায়োমের শ্রেণিবিভাগ (Types of Biomes) :

পূর্বের অনুচ্ছেদে তোমরা 'বায়োম' (biome)-এর অর্থ জানতে পেরেছ। এবার আমরা বিশ্বের প্রধান বায়োমসমূহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। পৃথিবীতে পাঁচটি প্রধান বায়োম দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হল - বনভূমি, মরুভূমি, তৃণভূমি, জলজ এবং উচ্চ স্থানীয় বায়োমসমূহ। এই বায়োমগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি নং 15.1-তে দেওয়া হয়েছে।

জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical Cycle) :

সূর্য হল শক্তির মূল উৎস যার ওপর সকল প্রকার জীবন নির্ভর করে। এই শক্তি দ্বারা জীবমণ্ডলের উদ্ভিদসমূহ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে যা এদের শক্তির মূল উৎস। সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড জৈব যৌগ এবং অক্সিজেনে পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত সৌরশক্তির তাপীয় ফলের মধ্যে খুবই অল্প পরিমাণে (0.1 শতাংশ) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এর অর্ধেকের বেশি অংশ উদ্ভিদের শ্বসন প্রক্রিয়ায় এবং অবশিষ্টাংশ অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত হয় অথবা গাছের অন্যান্য অংশে অপসারিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার জীবিত প্রাণী দ্বারা পৃথিবীতে জীবন গঠিত হয়। এই জীবিত জীবগোষ্ঠীসমূহ প্রকৃতির বিভিন্নতার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার প্রণালীবদ্ধ প্রবাহসমূহের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেমন - শক্তিপ্রবাহ, জলপ্রবাহ এবং পুষ্টিকর পদার্থের প্রবাহ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে এবং বিভিন্ন স্থানীয় পরিবেশে এই প্রবাহসমূহে বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, বিগত এক বিলিয়ন বছর ধরে বায়ুমণ্ডল এবং জলমণ্ডল গঠনকারী রাসায়নিক উপাদানের সমতা প্রায় একই আছে অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন হয়নি। রাসায়নিক উপাদানের এই সমতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোশীয় গঠন দ্বারা চক্রাকারে বজায় থাকে। এই চক্র জীব দ্বারা রাসায়নিক উপাদানের শোষণ থেকে আরম্ভ হয়ে এবং তা বিয়োজনের মাধ্যমে বায়ু, জল এবং মৃত্তিকায় পুনরায় ফিরে যায়। এই চক্রগুলো মুখ্যত সৌরশক্তির তাপীয়ফল থেকে শক্তি গ্রহণ করে। জীবমণ্ডলে জীব ও পরিবেশের মধ্যেকার রাসায়নিক উপাদানের এই চক্রাকার প্রবাহকে **জৈব ভূ-রাসায়নিক** (*biogeochemical cycle*) চক্র বলে। 'বায়ো' (*Bio*) শব্দের অর্থ জীবিত জীব এবং 'জিয়ো' (*geo*) কথার অর্থ হল পৃথিবীতে উপস্থিত শিলা, মৃত্তিকা, বায়ু এবং জল।

জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র দু'প্রকারের হয়। যথা - গ্যাসীয় এবং পাললিক চক্র। গ্যাসীয় চক্রে পদার্থের প্রধান ভাণ্ডার হল বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর। শিলাচক্রে মুখ্য ভাণ্ডার হচ্ছে মৃত্তিকা এবং ভূত্বকের পাললিক শিলা ও অন্যান্য শিলাসমূহ।

জলচক্র (*The Water Cycle*) :

সমস্ত জীবিত জীবকূল, বায়ুমণ্ডল এবং শিলামণ্ডলের মধ্যে জলের একটি চক্র বজায় রাখে যা কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় অবস্থায় বর্তমান থাকে, একে **জলচক্র** (hydrologic cycle) বলে। (জলচক্র সম্পর্কে বিশদ জানতে এই পুস্তকের 13 নং অধ্যায়টি দেখো)।

কার্বন চক্র (*The Carbon Cycle*) :

কার্বন হল সকল জীবগোষ্ঠীর মৌলিক উপাদান। এটি সকল জৈব উপাদানের মূল সংগঠক। জীবমণ্ডলে এক মিলিয়নের অর্ধেকাংশে কার্বন উপাদান বর্তমান। কার্বন চক্র কার্বন ডাইঅক্সাইডেরই পরিবর্তিত রূপ। এই পরিবর্তন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডের আত্তীকরণ দিয়ে শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া থেকে শর্করা, গ্লুকোজ তৈরি হয় যা অন্যান্য জৈব যৌগে যেমন - সুক্রোজ (sucrose), শ্বেতসার

সারণি 15.1 : বিশ্বের বায়োমসমূহ

বায়োম	উপ-বিভাগ	অঞ্চল	জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যসমূহ	মৃত্তিকা	উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল
বনভূমি	A. ক্রান্তীয় 1. নিরক্ষীয় 2. পর্ণমোচী B. নাতিশীতোষ্ণ C. বোরিয়েল	A1. 10° উ.-দ. A2. 10° - 25° উ.-দ. B. পূর্ব উত্তর আমেরিকা, উত্তর পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ। C. ইউরেশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল (সাইবেরিয়া, আলাস্কা, কানাডা এবং স্ক্যান্ডিনিভিয়া এর অংশবিশেষ।	A1. উষ্ণতা 20°-25°C, সমভাবে বণ্টিত A2. উষ্ণতা 25°-30°C, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 1,000 মিমি ঋতুকালীন। B. উষ্ণতা 20-30° C, বৃষ্টিপাত সমভাবে বণ্টিত 750-1,500 মিমি., সুনির্দিষ্ট ঋতু এবং তীব্র শীত। C. সংক্ষিপ্ত আর্দ্র পরিমিতি উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং দীর্ঘ শীতকালীন শুষ্ক শীত ঋতু। তাপমাত্রা খুব কম অধঃক্ষেপণ, মুখ্যত তুষারপাত 400 -1,000 মিমি.	A1. আম্লিক, পুষ্টিকর পদার্থ কম। A2. পুষ্টিকর পদার্থ বেশি। B. উর্বর, ক্ষয়িত পদার্থ দ্বারা সমৃদ্ধ। C. আম্লিক এবং পুষ্টিকর উপাদান কম। মৃত্তিকার পাতলা আবরণ।	A1. বহুস্তরীয় আচ্ছাদন, লম্বা এবং বিশাল গাছ। A2. স্বল্প ঘন, মাঝারি উচ্চতার বৃক্ষসমূহ; একাধিক প্রজাতির একসাথে পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গ, বাদুড়, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রভৃতি দুটোতেই পাওয়া যায়। B. মাঝারি ঘন বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। উদ্ভিদ প্রজাতিতে কম বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। কয়েকটি সাধারণ প্রজাতি হচ্ছে ওক, বিচ, ম্যাপল ইত্যাদি। কাঠবেড়ালি, খরগোশ, স্কাংক, পাখি, কালো ভাল্লুক, পাহাড়ি সিংহ ইত্যাদি। C. চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বনভূমি যেমন - পাইন, ফার, স্প্রুস ইত্যাদি। কাঠঠোকরা, বাজপাখি, ভাল্লুক, নেকড়ে, হরিণ, খরগোশ এবং বাদুড় হল কতগুলো মুখ্য প্রাণী।
মরুভূমি	A. উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি B. প্রায় শুষ্ক মরুভূমি C. উপকূলীয় মরুভূমি D. শীতল মরুভূমি	A. সাহারা, কালাহারি, মরুস্থলী,রাব-এল-খালি B. উষ্ণ মরুভূমির প্রান্তদেশীয় এলাকাসমূহ। C. আটাকামা D. তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল	A. উষ্ণতা 20° - 45°C. B. 21° - 38°C. C. 15° - 35°C. D. 2 °- 25°C A-D 50 মিমি.-এর কম বৃষ্টিপাত।	পুষ্টিকর পদার্থে সমৃদ্ধ এবং জৈব পদার্থের অল্প পরিমাণে উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।	A-C. অল্প পরিমাণ উদ্ভিদের উপস্থিতি, কিছু বড়ো স্তন্যপায়ী প্রাণী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ এবং পাখি। D. খরগোশ, ইঁদুর, হরিণ এবং স্থল কাঠবেড়ালি।
তৃণভূমি	A. ক্রান্তীয় সাভানা B. নাতিশীতোষ্ণ স্টেপ	A. আফ্রিকার বিশাল অংশ, অস্ট্রেলিয়া, দ. আমেরিকা এবং ভারত B. ইউরেশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা।	A. গরম উষ্ণ জলবায়ু, বৃষ্টিপাত 500-1,250 মিমি. B. উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং শীতল শীতকাল। বৃষ্টিপাত 500 - 900 মিমি.	A. সচ্ছিদ্র পাশাপাশি হিউমাসের পাতলা আবরণ। B. পাতলা ফ্লোকুলেট মৃত্তিকা ভিত্তিতে সমৃদ্ধ।	A. ঘাস : গাছ ও বিশাল গুল্ম অনুপস্থিত; জিরাফ, জেব্রা, মহিষ, চিতাবাঘ, হায়না, হাতি, ইঁদুর, গন্ধমুষিক, সাপ এবং কীট ইত্যাদি। কতগুলো সাধারণ প্রাণী।

					B. ঘাস; সাময়িক গাছসমূহ যথা - কার্পাস বনভূমি, ওক এবং উইলো, কৃষ্ণসার, জেব্রা, গন্ডার, বন্যঘোড়া, সিংহ, বিভিন্ন প্রকার পাখি, কীটপতঙ্গ, সাপ ইত্যাদি হল কতগুলো সাধারণ প্রাণী।
জলজ	A. স্বাদুজল B. সমুদ্রের জল	A. হ্রদ, ক্ষুদ্র নদী, নদী এবং অন্যান্য জলাভূমি। B. মহাসাগর, প্রবাল প্রাচীর, উপহ্রদ এবং সমুদ্রের খাঁড়ি।	A-B তাপমাত্রায় বিভিন্নতার পাশাপাশি শীতল বায়ুযুক্ত। তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত।	A. জলজ, জলা ও জলাভূমি বা বিল। B. জলজ, জোয়ারজনিত জলা ও জলাভূমি বা বিল।	শৈবাল ও অন্যান্য জলজ এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদকুল তথা জলজ প্রাণীসমূহ
শীর্ষ দেশীয়	———	উচ্চ পর্বতশ্রেণি ঢাল, যেমন - হিমালয়, আন্দিজ ও রকি পর্বতমালা।	তাপমাত্রা এবং অধঃক্ষেপণ অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে।	ঢালের উপরিস্থিত রেগোলিথ	উচ্চতা অনুসারে পর্ণমোচী থেকে তুন্দ্রা জাতীয় বনভূমি।

(starch), সেলুলোজ (cellulose) প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়। কিছু পরিমাণ শর্করা উদ্ভিদের দ্বারা সরাসরি ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন উদ্ভিদের পাতা অথবা মূল দ্বারা দিনের বেলায় অধিক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং মুক্ত হয়। উদ্ভিদের দ্বারা অব্যবহৃত অবশিষ্ট শর্করা গাছের কোশে সঞ্চিত হয়। গাছে এই কোশসমূহ হয়তো তৃণভোজী প্রাণীরা ভক্ষন করে নতুবা অণু জীবদের দ্বারা বিয়োজিত হয়। তৃণভোজীরা গৃহীত শর্করাকে কার্বন

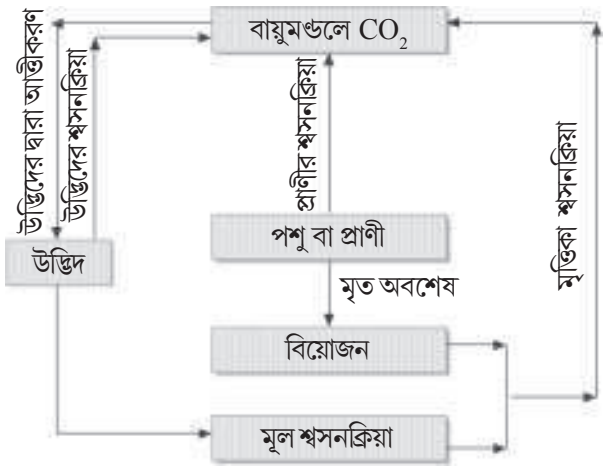

চিত্র **15.2** : কার্বন চক্র

ডাইঅক্সাইড গ্যাস পরিণত করে এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার দ্বারা তা বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে । অণুজীবরা প্রাণীদের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট শর্করা বিয়োজন করে। অণুজীবদের দ্বারা বিয়োজিত শর্করা তারপর অক্সিজেন প্রক্রিয়া দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিবর্তিত হয় এবং পুনরায় প্রকৃতিতে বা পরিবেশে ফিরে যায় (চিত্র 15.2)।

অক্সিজেন চক্র (The Oxygen Cycle) :

অক্সিজেন হল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রধান উপজাত দ্রব্য (By-product)। এটি কার্বোহাইড্রেটের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত, যার দ্বারা শক্তি, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল বিমুক্ত হয়। অক্সিজেন চক্র খুবই জটিল প্রক্রিয়া। অনেকগুলো রাসায়নিক গঠন ও সমন্বয়ের মধ্যে অক্সিজেন পাওয়া যায়। এটি নাইট্রোজেনের সাথে মিলে নাইট্রেট গঠন করে এবং অন্যান্য খনিজ ও বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিলে বিভিন্ন প্রকারের অক্সাইড তৈরি করে যেমন - লৌহ অক্সাইড (Iron Oxide), অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminium Oxide) এবং অন্যান্য। সূর্যালোকের দ্বারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় জলের অণুগুলো ভেঙে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রের দ্বারা বাষ্পমোচন ও শ্বসন প্রক্রিয়া দ্বারা বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

নাইট্রোজেন চক্র (The Nitrogen Cycle) :

বায়ুমণ্ডল গঠনকারী একটি মুখ্য সংগঠক হল নাইট্রোজেন। বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলোর মধ্যে এর পরিমাণ 78 শতাংশ। এটি বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ যেমন - অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acid), নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid), প্রোটিন, ভিটামিন এবং রঞ্জক পদার্থ (Pigment)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধুমাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট প্রজাতির জীব, যেমন - মৃত্তিকা ব্যাকটেরিয়া (Soil Bacteria) এবং নীলাভ সবুজ শৈবালই (Blue Green Algae) একে সরাসরি গ্যাসীয় রূপে গ্রহণ করতে সক্ষম। সাধারণত নাইট্রোজেনকে স্থিতিকরণের পরই ব্যবহার করা যেতে পারে। নাইট্রোজেনের প্রায় 90 শতাংশ জৈবিক অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রাণীরাই গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হল মৃত্তিকার আণবিক জীবসমূহের কার্যাদি যা গাছের শিকড় বা রন্ধ্রযুক্ত মৃত্তিকা থেকে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন বজ্রপাত এবং মহাজাগতিক বিকিরণের দ্বারাও স্থিরীকৃত হতে পারে। মহাসাগরে কিছু সামুদ্রিক প্রাণী নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করতে পারে। বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের এই প্রকার আবদ্ধীকরণের পর তা তখনই ব্যবহারযোগ্য হয় যখন সবুজ উদ্ভিদসমূহ নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। তৃণভোজী প্রাণীদের দ্বারা এই উদ্ভিদগুলোকে ভক্ষণ করার পর এর (নাইট্রোজেন) কিছু অংশ তাদের মধ্যেও চলে যায়। মৃত্তিকায় বর্তমান ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী। নিঃসৃত নাইট্রোজেনের বর্জ্যপদার্থ নাইট্রাইটে পরিবর্তিত হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করতে পারে যেটি সবুজ উদ্ভিদরা পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। কিছু অন্য প্রকারের ব্যাকটেরিয়াও আছে যারা নাইট্রেটকে আবার মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **ডিনাইট্রিফিকেশন** (Denifrification) বলে (চিত্র 15.3)।

চিত্র **15.3** : নাইট্রোজেন চক্র

অন্যান্য খনিজ চক্র (*Other Mineral Cycles*) :

জীবমণ্ডলের প্রধান ভূ-রাসায়নিক উপাদান যথা - কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ছাড়াও উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রয়েছে যা পুষ্টিকর উপাদান হিসেবে কাজ করে। জীবগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় এই খনিজ উপাদানসমূহ প্রাথমিকভাবে অজৈব উৎস রূপে পাওয়া যায়, যথা - ফসফরাস, সালফার, ক্যালশিয়াম এবং পটাশিয়াম। এগুলো সাধারণত মৃত্তিকা, হ্রদ, নদী এবং সাগরে লবণরূপে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যখন দ্রবীভূত লবণ জলচক্রে প্রবেশ করে তখন তা আবহবিকার প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূত্বকে এবং অবশেষে সাগরে গিয়ে পৌঁছায়। অন্যান্য লবণসমূহ পলল প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং আবহবিকার প্রক্রিয়ার পর তা পুনরায় চক্রে প্রবেশ করে। সকল জীবগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পরিবেশে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা খনিজ লবণ থেকে নিজস্ব খনিজের চাহিদা মেটায়। কিছু প্রাণী উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ভক্ষণ করে তাদের খনিজ চাহিদা পূর্ণ করে। জীবের মৃত্যুর পর খনিজ সমূহ বিয়োজন ও প্রবাহ প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকা ও জলে মিশে যায়।

বাস্তুসংস্থানিক সমতা (Ecological Balance) :

কোনো বাস্তুতন্ত্রে বা আবাসে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক গতিশীল সমতার অবস্থাকে **বাস্তুসংস্থানিক সমতা** বলে। এটি তখনই সম্ভব যখন জীবগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়। ক্রমাগত পরিবর্তন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অনুক্রম বা ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সাধিত হয়। একে কোনো বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রজাতির সংখ্যার একটি স্থায়ী সমতা রূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই সমতা যেখানে প্রজাতির সংখ্যা স্থিতিশীল থাকে সেখানে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু প্রজাতি তাদের নিজস্ব পরিবেশে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা এই সমতা নিয়ে আসে। এই সমতা কিছু প্রজাতির খাদ্য ও বেঁচে থাকার জন্য অন্য প্রজাতির ওপরও যে নির্ভরশীল তার ওপর নির্ভর করে। এ প্রকার উদাহরণ বিশাল তৃণভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায় যেখানে তৃণভোজী প্রাণীরা (হরিণ, জেব্রা, মহিষ ইত্যাদি) প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান থাকে। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীদের (বাঘ, সিংহ ইত্যাদি) সাধারণত বিশাল সংখ্যায় পাওয়া যায় না, তারা শাকাহারী প্রাণীদের শিকার করে ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে। স্থানীয় বনভূমিতে যে-কোনো বাধা যেমন - স্থানান্তর কৃষির জন্য বনভূমি কেটে পরিষ্কার করার ফলে গাছের প্রজাতির বণ্টনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এইপ্রকার পরিবর্তন মূলত প্রতিযোগিতার কারণে হয়; যেখানে গৌণ বন্য প্রজাতি যেমন - তৃণ বা ঘাস, বাঁশ অথবা পাইন জাতীয় উদ্ভিদ প্রাথমিক প্রজাতির স্থান

দখল করে মূল বনভূমির গঠনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। একে **অণুক্রম** (*succession*) বলে।

নতুন প্রজাতির উদ্ভব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা মনুষ্যবর্ণিত কারণে বাস্তুসংস্থানগত সমতা বিঘ্নিত হতে পারে। মানুষের হস্তক্ষেপ উদ্ভিদ প্রজাতির সমতায় প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। এই বাধাসমূহ বা অসমতা বহু গৌণ অণুক্রমের জন্ম দেয়। পৃথিবীর সম্পদের ওপর মানুষের অত্যধিক চাপ বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি পরিবেশের মৌলিকতাকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং স্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। বাস্তু সংস্থানগত অসমতা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন - বন্যা, ভূমিধস, বিভিন্ন রোগ এবং বহু জলবায়ু সম্পর্কিত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

বিশেষ আবাসস্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেই স্থানের জীববৈচিত্র্য হল সেই আবাসস্থলের পারিবেশিক উপাদানের সূচক বা নির্দেশক। এ সকল উপাদানের যথাযথ জ্ঞান ও বোধগম্যতা বাস্তুতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

(i) নিম্নের কোন্‌টি জীবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ?

(a) শুধুমাত্র উদ্ভিদ (c) শুধুমাত্র প্রাণী

(b) সকল জৈব ও অজৈব জীবগোষ্ঠী (d) সকল জীবগোষ্ঠী

(ii) ক্রান্তীয় তৃণভূমিকে এ নামেও জানা যায় :

(a) প্রেইরি (c) স্টেপ

(b) সাভানা (d) উপরের কোনোটিই নয়

(iii) শিলায় পাওয়া লোহা অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে :

(a) আয়রন কার্বনেট (c) আয়রন অক্সাইড

(b) আয়রন নাইট্রাইট (d) আয়রন সালফেট

(iv) সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড জলের সাথে মিলিত হয়ে গঠন করে :

(a) প্রোটিন (c) কার্বহাইড্রেট বা শর্করা

(b) অ্যামিনো অ্যাসিড (d) ভিটামিন

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) 'Ecology' বা 'বাস্তুবিদ্যা' বলতে কী বোঝ ?

(ii) বাস্তুসংস্থানিক তন্ত্র (Ecological system) কী ? বিশ্বের প্রধান প্রধান বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগসমূহ শনাক্ত করো।

(iii) খাদ্যশৃঙ্খল কী? পশুচারণ খাদ্যশৃঙ্খলের একটি উদাহরণ দাও এবং এর বিভিন্ন স্তরসমূহ সম্পর্কে লেখো।

(iv) খাদ্যজাল (food web) বলতে কী বোঝ ? উদাহরণ দাও।

(v) বায়োম (Biome) বলতে কী বোঝ ?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলতে কী বোঝ? বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন কীভাবে আবদ্ধ হয় তা আলোচনা করো।

(ii) বাস্তুসংস্থানগত সমতা কী? বাস্তুসংস্থানগত অসমতা প্রতিরোধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

প্রকল্পমূলক কাজ :

(i) বিশ্বের মানচিত্রে বিভিন্ন বায়োমের বিতরণ দেখাও এবং প্রত্যেকটি বায়োমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো।

(ii) তোমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত গাছ, গুল্ম এবং চিরজীবী (perennial) উদ্ভিদসমূহ সম্পর্কে একটি টীকা লেখো। প্রায় অর্ধেক দিন পর্যবেক্ষণ করে দেখো বিদ্যালয়ের বাগানে কোন্ কোন্ ধরনের পাখি আসে? তোমরা কি এই পাখিগুলোর বৈচিত্র্যতা বর্ণনা করতে পারবে?

অধ্যায় 16

জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ

BIODIVERSITY AND CONSERVATION

তোমরা আগেই ভূমিরূপগত প্রক্রিয়া বিশেষ করে আবহবিকার এবং বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে আবহবিকারের তীব্রতা সম্পর্কে জেনেছ। পুনঃস্মরণের জন্য তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের 6.2 নং চিত্রটি দেখো। তোমাদের জানা উচিত যে, আবহবিকারই হল বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং জীববৈচিত্র্যের ভিত্তি। সৌরশক্তি ও জলের ওপর আবহবিকারের বিভিন্নতা এবং জীববৈচিত্র্যের মূল ভিত্তি নির্ভর করে। এখানে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, যেখানে এই শক্তিগুলোর উপস্থিতি অধিক থাকবে সেখানে জীববৈচিত্র্যও অধিক লক্ষ করা যাবে।

> আজ আমরা যে জীববৈচিত্র্য দেখতে পাই তা 2.5 থেকে 3.5 বিলিয়ন বছরের বিবর্তনের ফল। (এক বিলিয়ন বছর = একশো কোটি বছর) মানব জীবন সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য যে-কোনো অন্য কাল থেকে অধিক ছিল। মানব জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে জীববৈচিত্র্যের মধ্যে দ্রুত নিম্নগামীতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কারণ এক বা অন্য প্রজাতির প্রয়োজনীয়তায় অধিক ব্যবহার হওয়ার ফলে প্রাণীগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সর্বমোট প্রজাতির সংখ্যা আনুমানিক 2 মিলিয়ন থেকে 100 মিলিয়ন। কিন্তু 10 মিলিয়ন হল এর সঠিক অনুমান। নতুন প্রজাতির খোঁজ প্রতিনিয়ত চলছে এবং এখনও অনেকগুলো প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস করা বাকি আছে। একটি হিসাবে দেখা গেছে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাদু জলের 40 শতাংশ মাছের প্রজাতির এখনও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়নি। ক্রান্তীয় অরণ্য জীববৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন প্রজাতি এবং প্রত্যেক জীবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য হল একটি ক্রম বিবর্তন প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে কোনো প্রজাতির গড় আয়ু 1 থেকে 4 মিলিয়ন বছর অনুমান করে হিসাব করা হয়েছে এবং 99 শতাংশ প্রজাতি যারা পৃথিবীতে বসবাস করত তারা আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য একরকম হয় না। ক্রান্তীয় অঞ্চল জীববৈচিত্র্যে বেশি সমৃদ্ধ। যদি কেউ শীতল মেরুপ্রদেশের দিকে এগিয়ে যায় তখন প্রজাতির বৈচিত্র্য কমতে থাকে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তে থাকে।

জীববৈচিত্র্য দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত — জীবন (Life) এবং বৈচিত্র্য (Variety)। সাধারণভাবে বলা যায় যে, জীববৈচিত্র্য হল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে জীবের মোট সংখ্যা এবং তার বিবিধতা। এটি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আণুবীক্ষণিক জীব নিয়ে গঠিত। পাশাপাশি এগুলোর জিন (Genes) যা থেকে এদের সৃষ্টি এবং এগুলোর মাধ্যমে সৃষ্ট বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা করা হয়। এটি পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব, তাদের পরিবর্তনশীলতা, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে নির্ভরশীলতা এবং বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে। জীববৈচিত্র্য হল আমাদের সজীব সম্পদ। এটি লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের পরিণাম।

জীববৈচিত্র্য তিনটি স্তরে আলোচনা করা যেতে পারে — (i) জেনেটিক বা জিনগত বৈচিত্র্য (ii) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (iii) বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য।

জেনেটিক বা জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) :

জিন হচ্ছে বংশগতির ধারক ও বাহক। জীবনের ভিত্তিস্বরূপ রূপে জিন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জেনেটিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে জিনগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তাকে বোঝায়। একই রকম শারীরিক গঠনযুক্ত জীবসমূহকে **প্রজাতি** (*species*) বলে। মানুষ জিনগতভাবে হোমো স্যাপিয়েন্স (*homo sapiens*) প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত । তাদের উচ্চতা, রং, শারীরিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্ন প্রকৃতির। এর পেছনে জিনই দায়ী। জেনেটিক বৈচিত্র্য বিভিন্ন প্রজাতির সুস্থ প্রজননের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity) :

এটি প্রজাতির বিভিন্ন ধরনকে বোঝায়। এটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাতির মোট সংখ্যাকে নিয়ে আলোচনা করে। প্রজাতির বৈচিত্র্য তার সমৃদ্ধতা, প্রাচুর্যতা এবং তার প্রকারভেদের ভিত্তিতে মাপা যেতে পারে। কিছু কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চল থেকে বেশি সমৃদ্ধ হয়। সেইসব অঞ্চলে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বেশিমাত্রায় লক্ষ করা যায় তাকে বৈচিত্র্যগত **হটস্পটস্** (*hotspots*) বলা হয় (চিত্র 16.5)।

বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য (Ecosystem Diversity) :

আগের অধ্যায়গুলোতে তোমরা বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ। বাস্তুতন্ত্রগত প্রকারভেদ, বসবাসগত বৈচিত্র্য এবং প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রজাতির 'সীমানা' (boundaries) এবং বাস্তুতন্ত্র নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

চিত্র **16.1 :** পশ্চিমঘাট পর্বতমালার আন্না মালাইস্থিত ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় উদ্যানের তৃণভূমি এবং শোলা - বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্যের উদাহরণ।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Importance of Biodiversity) :

মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন দিক থেকে জীববৈচিত্র্যের অবদান রয়েছে। মনুষ্য জাতি ও প্রকৃতিকে জিনগত, প্রজাতিগত এবং বাস্তুতান্ত্রিক স্তরে বৈচিত্র্যগত রূপ প্রদান করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জীববৈচিত্র্যে বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রভৃতি ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক ভূমিকা (Ecological Role of Biodiversity) :

বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি বাস্তুতন্ত্রে কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তুতন্ত্রে কোনো প্রজাতির বিনা কারণে উদ্ভব ঘটে না বা বেঁচে থাকে না। অর্থাৎ, প্রত্যেক জীব নিজের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণ করার সাথে সাথে অন্য জীব সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। তোমরা কি বলতে পারো বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার জন্য মানুষের কী অবদান আছে? প্রত্যেক প্রজাতি শক্তি গ্রহণ করে এবং তা নিজের মধ্যে মজুত রাখে, জৈব পদার্থকে বিশ্লেষণ করে। জলচক্র বজায় রাখতে সাহায্য করে, সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি সরবরাহ করে, বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস স্থির করে এবং জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই ক্রিয়াগুলো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুতন্ত্রে যত বেশি বৈচিত্র্য থাকবে বিভিন্ন প্রজাতি তত বেশি প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকবে এবং এর উৎপাদনশীলতাও অধিক হবে। প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখাও সম্ভব নয়। অধিক জেনেটিকযুক্ত প্রজাতির মতো অধিক জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের অধিক পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম। অন্যভাবে বলা যায়, যে বাস্তুতন্ত্রে যত বেশি প্রকারের প্রজাতি থাকবে, সে বাস্তুতন্ত্র তত বেশি স্থায়ী হবে।

জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক ভূমিকা (Economic Role of Biodiversity) :

প্রত্যেক মানুষের জন্য জীববৈচিত্র্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কৃষিজ ফসলের বৈচিত্র্য; যাকে কৃষিজ জীববৈচিত্র্যও (agro-biodiversity) বলা হয়। জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন উপকরণগুলোকে সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে ধরা হয় যা খাদ্য, ঔষধ এবং প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা এবং সম্পদের অতিমাত্রায় ব্যবহারে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের বিভাজন এবং বণ্টন নিয়ে নতুন বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। মানব সভ্যতার প্রতি জীববৈচিত্র্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা হল : খাদ্যশস্য, পশুসম্পদ, অরণ্য সম্পদ, মৎস্য এবং ঔষধি সম্পদ ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্যের বিজ্ঞান ভিত্তিক ভূমিকা (Scientific Role of Biodiversity) :

জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রত্যেক প্রজাতির অস্তিত্ব, তাদের ক্রম বিবর্তন এবং ভবিষ্যতে কীভাবে তারা বিকশিত হবে এর ধারণা আমরা জীববৈচিত্র্য থেকে পাই। জীবনচক্র কীভাবে চলতে থাকে, জীবনের কার্যাবলি এবং প্রত্যেক প্রজাতির বাস্তুতন্ত্রে বেঁচে থাকার জন্য যে ভূমিকা এগুলো বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের

সবাইকে এই তথ্যটি বুঝতে হবে যে, আমরা নিজেরা বাঁচব এবং অন্য প্রজাতিকেও বাঁচতে দেব।

এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতিরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। সুতরাং কোনো প্রজাতিকে ধ্বংস করা নৈতিকতা বিরোধী কাজ। জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্তর অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্কের মাপকাঠি। তাই জীববৈচিত্র্যের ধারণাটি মানব সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

জীববৈচিত্র্যের হ্রাস (Loss of Biodiversity) :

বিগত কিছু বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রজাতির সংখ্যা এবং আবাসস্থল হ্রাস পেয়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল যা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ দখল করে আছে সেখানে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ লোক বসবাস করে। এই বিশাল জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা মেটাতে গিয়ে সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে এবং বনধ্বংস হচ্ছে। ক্রান্তীয় এই বৃষ্টিসমৃদ্ধ অঞ্চলে পৃথিবীর 50 শতাংশ প্রজাতি লক্ষ করা যায়, যার আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ার কারণে সমগ্র জীবমণ্ডল ধ্বংসের মুখে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন - ভূমিকম্প, বন্যা, আগ্নেয়গিরি, দাবানল, খরা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাছাড়া জীববৈচিত্র্যেও আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসছে। কীটনাশক এবং অন্যান্য দূষণকারী দ্রব্য যেমন - হাইড্রোকার্বন এবং বিষপূর্ণ (toxic) ভারী ধাতব পদার্থগুলো দুর্বল ও সংবেদনশীল প্রজাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যেসব প্রজাতিগুলো স্থানীয় প্রজাতি নয় অথচ ঐ বাস্তুতন্ত্রের অংশ এগুলোকে 'বহিরাগত প্রজাতি' (*exotic species*) বলা হয়। এইরকম অনেকগুলো উদাহরণ আছে যেখানে বহিরাগত প্রজাতিগুলো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের মূল প্রজাতিগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। অনেক দশক ধরে কিছু পশু যেমন-বাঘ, চিতা, হাতি, গন্ডার, কুমির, মিংক (বেজির মতো দেখতে) এবং পাখির অবৈধভাবে শিকার করা হচ্ছে। এই কারণে কিছু প্রজাতি লুপ্ত হওয়ার পথে।

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা হল "প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংগঠন" বা International Union of Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)। সংস্থাটি প্রজাতির সংরক্ষণের উদ্দেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে।

সংকটাপন্ন প্রজাতি (Endangered Species) :

এখানে ওইসব প্রজাতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যেগুলোর লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। IUCN বিশ্বের সব সংকটাপন্ন প্রজাতির একটি তালিকা (*Red List*) প্রকাশিত করেছে।

চিত্র **16.2 :** লাল পান্ডা - একটি লুপ্তপ্রায় প্রাণী।

চিত্র **16.3 :** জেনকেরিয়া সেবসটিনী - একটি অত্যন্ত সংকটাপন্ন তৃণের প্রজাতি, আগস্থিয়ামালয় শৃঙ্গ (ভারত)।

সুরক্ষিত নয় এমন প্রজাতি (Vulnerable Species) :

এখানে ওই সমস্ত প্রজাতির কথা বলা হয়েছে যাদের সংরক্ষণ বর্তমানে করা না হলে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোর সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে এই সমস্ত প্রজাতিগুলোর জীবন সুরক্ষিত নয়।

দুর্লভ প্রজাতি (Rare Species) :

পৃথিবীতে এই প্রজাতির সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই প্রজাতিগুলো কিছু নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত থাকায় বৃহৎ অঞ্চলে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

চিত্র **16.4 : হামবোশিয়া ডেকুরেন্স বেড দক্ষিণ পশ্চিমঘাট (ভারত) পর্বতমালার একটি দুর্লভ উদ্ভিদ প্রজাতি**

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity) :

মানব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত জীব একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত যে একটির ভারসাম্য নষ্ট হলে অন্য জীবরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিরা সংকটাপন্ন হয় তাহলে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মানব সভ্যতা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

এখন মানুষকে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে হবে যাতে অন্যান্য প্রজাতিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ তখনই সম্ভবপর হবে যখন স্থানীয় জনগণ এই কাজে অংশগ্রহণ করবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্তরে নানা সংস্থা নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। কেবল প্রজাতির সংরক্ষণই নয় সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার ধারাও বজায় রাখা জরুরি।

1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ওপর একটি সম্মেলন (Earth Summit) হয়েছিল। এই সম্মেলনে ভারত সরকারসহ অন্যান্য 155টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল এবং স্বাক্ষর করেছিল। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্ব স্তরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে :

(i) সংকটাপন্ন প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ii) প্রজাতিকে লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

(iii) বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, কাষ্ঠ, পশু সম্পদ, জীবজন্তু এবং এদের অন্যান্য বন্য প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষিত করা উচিত।

(iv) প্রত্যেক দেশের বন্য জীব ও তাদের আবাসস্থলকে চিহ্নিত করে এগুলোর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা।

(v) বিভিন্ন প্রজাতির প্রতিপালন ও বিকশিত হওয়ার স্থানটিকে সুরক্ষিত করা বা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

(vi) বন্যজীব অথবা উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত করা।

ভারত সরকার প্রাকৃতিক সীমানার ভেতর বিভিন্ন প্রকার প্রজাতিকে সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের জন্য 'বন্যজীব সুরক্ষা আইন-1972' [Wild Life Protection Act, 1972] পাশ করেছে, যেখানে জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অর্থাৎ জীবমণ্ডল সংরক্ষিত অঞ্চল (Biosphere reserves) ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংরক্ষিত অঞ্চলের বিস্তারিত আলোচনা - **ভারত : প্রাকৃতিক পরিবেশ** (NCERT, 2006) পুস্তকে করা হয়েছে।

ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত কিছু কিছু দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাতির বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তাদেরকে বলা হয় **'মহা বৈচিত্র্যময় কেন্দ্র'** (Mega diversity centres)। এই রকম দেশের সংখ্যা 12 এবং এদের নাম হল — মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ইকোয়াডর, পেরু, ব্রাজিল, কঙ্গো গণতান্ত্রিক, মাদাগাস্কার, চিন, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া। এই দেশগুলোতে মহা বৈচিত্র্যময় কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে যেগুলো অধিক সংকটে রয়েছে সেখানে সম্পদ সরবরাহ করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) কিছু কিছু অঞ্চলকে **জৈব**

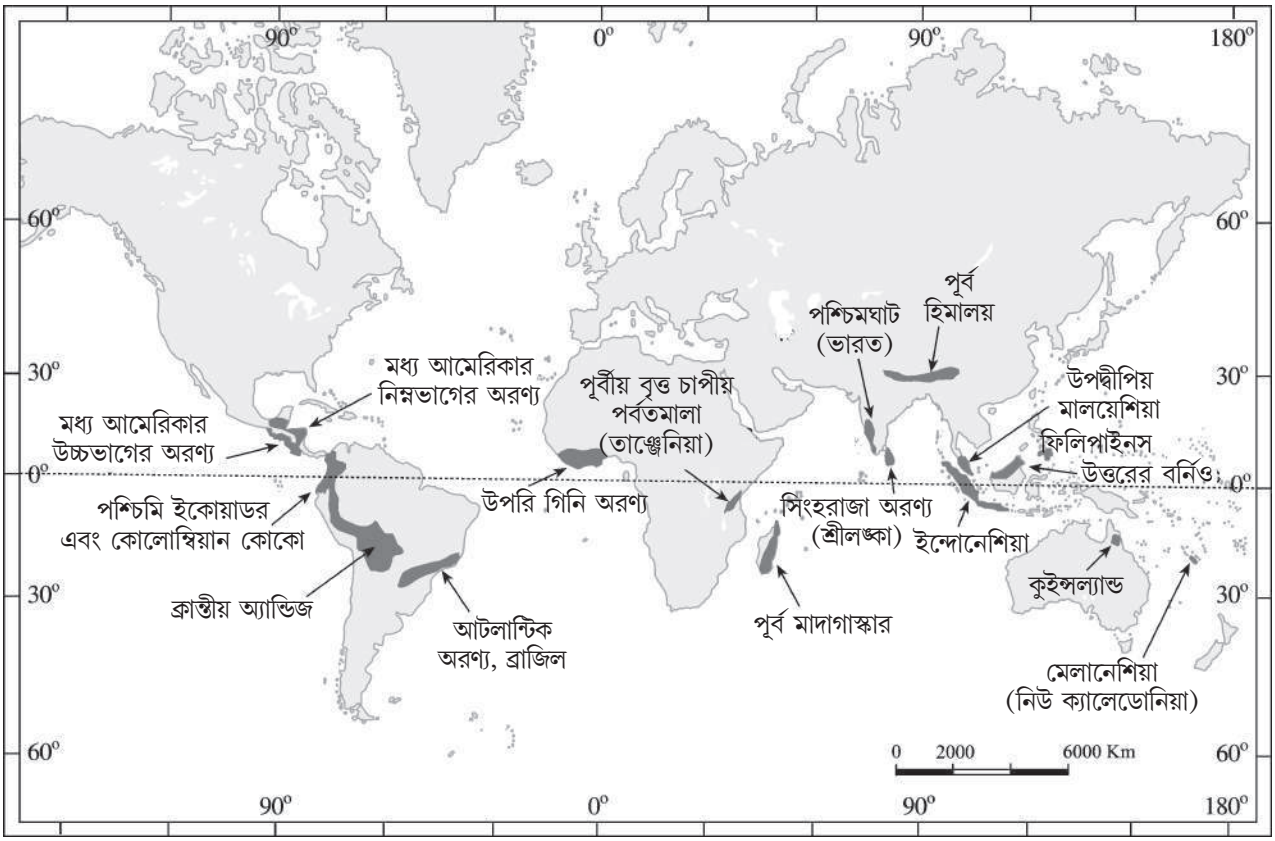

চিত্র **16.5 : পৃথিবীর কিছু বাস্তুতান্ত্রিক 'হটস্পটস্'**

বৈচিত্র্যের হট্‌স্পট (Hotspots) (চিত্র 16.5) অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। হটস্পটগুলোকে অরণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উদ্ভিদ খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ উদ্ভিদকে বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদক হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু হট্‌স্পট ছাড়া বাকি সব হট্‌স্পটগুলো প্রজাতির জন্য ভোজন, জ্বালানি কাঠ, কৃষিভূমি এবং কাঠ থেকে আয় ইত্যাদি সুবিধা সরবরাহ করছে এবং বাস্তুতন্ত্রকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মাদাগাস্কারে পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির প্রায় 85 শতাংশ প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অন্য হট্‌স্পট যেগুলো সমৃদ্ধ দেশগুলোতে অবস্থিত, সেগুলোতে বিভিন্ন রকম সমস্যা লক্ষ করা যায়। হাওয়াই অঞ্চলের দ্বীপসমূহে কিছু বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বর্তমান, সেগুলো বহিরাগত প্রজাতির আগমন এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

(i) জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ কোন্‌টির জন্য প্রয়োজন :

(a) প্রাণী (c) উদ্ভিদ

(b) প্রাণী এবং উদ্ভিদ (d) সমস্ত জীবের।

(ii) অসুরক্ষিত প্রজাতি হল ওইগুলো যেগুলো :

(a) অন্যদের অসুরক্ষা প্রদান করে

(b) সিংহ ও বাঘ

(c) সংখ্যায় অধিক

(d) লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে

(iii) জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য কী উদ্দেশ্যে বানানো হয় :

(a) মনোরঞ্জন (c) পশুপালন করার জন্য

(b) শিকার (d) সংরক্ষণ

(iv) জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ অঞ্চল হচ্ছে :

(a) ক্রান্তীয় অঞ্চল (c) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল

(b) মেরু অঞ্চল (d) মহাসাগরীয় অঞ্চল

(v) নিম্নলিখিত দেশগুলোর মধ্যে কোন্‌টিতে বিশ্ব সম্মেলন (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

(a) যুক্তরাষ্ট্র (UK) (c) ব্রাজিল

(b) মেক্সিকো (d) চিন

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 30টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) জীববৈচিত্র্য কী ?

(ii) জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্তরগুলো কী কী ?

(iii) হট্‌স্পট বলতে কী বোঝ ?

(iv) মানব জাতির জন্য অন্যান্য জীবজন্তুর গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

(v) বহিরাগত (Exotic) প্রজাতি বলতে কী বোঝ ?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর 150টি শব্দের মধ্যে দাও :

(i) প্রকৃতি গঠনে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা বর্ণনা করো।

(ii) জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণগুলো কী কী ? এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ?

প্রকল্পমূলক কাজ :

তোমরা রাজ্যের সমস্ত জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য এবং জীব সংরক্ষিত অঞ্চলের নামগুলো সংগ্রহ করো এবং এগুলোর অবস্থান ভারতের মানচিত্রে দেখাও।

শব্দকোশ

অজীবজাত (Abiotic) : জড় বস্তু। এটি সাধারণত একটি জীবের পরিবেশের অন্তর্গত প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উপাদানসমূহকে বোঝায়।

স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হার (Adiabatic Lapse Rate) : উর্ধ্বগামী অথবা অধোগামী বায়ুপুঞ্জ দ্বারা তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার। যদি না অন্য কোনো অস্বাভাবিক তাপ হ্রাস প্রক্রিয়া (যেমন পৃথিবীতে বা প্রক্রিয়ায় তাপের সংযোজন বা বিয়োজন কোনোটিই হয় না) ঘটে (যেমন ঘনীভবন, বাষ্পীভবন এবং বিকিরণ) তাহলে বায়ুর সম্প্রসারণ বায়ুকে এক স্থির হারে প্রতি 100 মিটার উচ্চতায় 0.98° হারে শীতল করে দেয়। এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যখন বায়ুর অংশবিশেষ বায়ুমণ্ডলে নিম্নগামী হয়। নিম্ন অভিমুখী বায়ু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সঙ্কোচনের কারণে ওই অংশের বায়ুর তাপমাত্রা প্রতি 100 মিটারে 0.98° হারে বৃদ্ধি পায়।

বায়ুপুঞ্জ (Air Mass) : বায়ুপুঞ্জ হল একটি বায়ুর সমষ্টি যা তার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতামূলক বৈশিষ্ট্য উৎপত্তিস্থল থেকে অর্জন করে। এটি কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার অনুভূমিক দূরত্ব পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকে। বায়ুপুঞ্জ তাদের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য বর্ধিত করে উৎপত্তিস্থলে কয়েক দিনের জন্য নিশ্চল থাকে। বায়ুপুঞ্জকে তাদের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

অপসূর (Aphelion) : এটি পৃথিবীর কক্ষপথের সেই বিন্দু যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরত্বে অবস্থান করে (152.5 মিলিয়ন কিমি.)। অপসূর ঘটে জুলাই মাসের 3 অথবা 4 তারিখে।

অ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere) : পৃথিবীর গুরুমণ্ডলের সেই অঞ্চল যেখানে প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শিলামণ্ডলের নিম্নে 100 – 200 কিমি. এর মধ্যে এর অবস্থান।

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure) : কোনো পৃষ্ঠতলে বায়ুমণ্ডলের ওজন বা ভার। সমুদ্রপৃষ্ঠে গড় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হচ্ছে 1013.25 মিলিবার (mb)। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করা হয় একটি যন্ত্রের মাধ্যমে যার নাম হলো ব্যারোমিটার।

মেরুপ্রভা (Aurora) : বহু বর্ণবিশিষ্ট আলো বা বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে (আয়োনোস্ফিয়ার) মেরু অঞ্চলে দেখা যায় এবং মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশ থেকে দৃশ্যমান হয়। বায়ুমণ্ডলে সৌর বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয়। মেরুপ্রভা উত্তর গোলার্ধে 'সুমেরু প্রভা' এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 'কুমেরু প্রভা' নামে পরিচিত।

ব্যাথোলিথ (Batholith) : ভূ-অভ্যন্তরে অবস্থিত অতি বিশাল উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা বা গুরুমণ্ডলের ম্যাগমা থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

বিগ্ ব্যাং (Big Bang) : বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি ধারণা করে যে, 15 বিলিয়ন বছর পূর্বে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ এবং শক্তি একটি পরমাণুর চেয়েও ছোটো বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ওই মূহুর্তে পদার্থ, শক্তি, স্থান এবং সময়ের উপস্থিতি ছিল না। তারপর হঠাৎ করে ব্রহ্মাণ্ড অবিশ্বাস্য হারে সম্প্রসারিত হতে শুরু করল এবং পদার্থ, শক্তি, স্থান এবং কাল সৃষ্টি হল। ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণের সাথে সাথে পদার্থসমূহ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে গ্যাসীয় মেঘে পরিণত হতে শুরু করে এবং তারপর নক্ষত্র ও গ্রহের জন্ম হয়। কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, এই সম্প্রসারণ হল সীমাবদ্ধ এবং একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। এই মূহুর্তের পর ব্রহ্মাণ্ড ভেঙে যেতে শুরু করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এক 'বৃহৎ আলোড়ন' (*Big Crunch*) ঘটবে।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) : বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা (প্রজাতির বৈচিত্র্যতা) প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে জীবের জিনগত বিভিন্নতা (জিনগত বৈচিত্র্যতা) এবং বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্নতা (বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যতা)।

জৈব পচনশীল বস্তুপুঞ্জ (Biomass) : একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো নির্দিষ্ট জীবিত জৈব কলাসমূহের ওজন প্রতি বর্গ এককে পরিমাপ করা হয়। তার অন্তর্গত অংশসমূহ হল মৃত জীবের অংশ, যেমন ছাল বা চর্ম, চুল, নখ প্রভৃতি।

বায়োম (Biome) : পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বজনস্বীকৃত বৃহত্তম সমাবেশ। বায়োমের বণ্টন প্রধানত জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রস্তরীভবন (Calcification) : শুষ্ক পরিবেশে মৃত্তিকাগঠন প্রক্রিয়া যা মৃত্তিকার উপরিস্তরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সংশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হয়।

ক্যালেডেরা আগ্নেয়গিরি (Caldera Volcano) : একটি বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি যা ব্যাপক বৃত্তিয় নিম্নচাপের সৃষ্টি করে, কিছু কিছু নিম্নচাপের ব্যাস অনেক বেশি হয়, প্রায় 40 কিমি পর্যন্ত হতে পারে, আর্দ্র গ্রানাইট জাতীয় ম্যাগমা যখন দ্রুতবেগে ভূ-পৃষ্ঠে উত্থিত হয়, তখন এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়।

ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (Chlorofluorocarbons (CFCs)) : কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট গ্যাস যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কেন্দ্রীভূত থাকে। এই শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস অ্যারোসল স্প্রে, রেফ্রিজারেন্টস এবং ধোঁয়া উৎপাদন থেকে নির্গত হয়।

সিরোকিউমুলাস মেঘ (Cirrocumulus Clouds) : উচ্চ আকাশে তুষার স্ফটিক দ্বারা গঠিত সাদা অলক মেঘ। সাধারণত 5,000 - 18,000 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়।

সিরোস্ট্র্যাটাস মেঘ (Cirrostratus Clouds) : উচ্চ আকাশে তুষার স্ফটিক দ্বারা গঠিত চাদরের মতো মেঘ। এই হালকা মেঘ সমগ্র আকাশ ঢেকে রাখে। সাধারণত 5,000 - 18,000 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়।

শীতল বায়ুপ্রাচীর (Cold Front) : বায়ুমণ্ডলের রূপান্তর মণ্ডল যেখানে শীতল বায়ুপুঞ্জ অগ্রসর হলে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জে স্থানচ্যুত হয়।

মহাদেশীয় ভূত্বক (Continental Crust) : পৃথিবীপৃষ্ঠের কঠিন গ্রেনাইটিক অংশ যা মহাদেশ গঠন করে। মহাদেশীয় ভূত্বকের গভীরতা 20 - 75 কিমির মধ্যে থাকে। সিয়াল (*sial*) স্তরটি দেখো।

কোরিওলিস বল (Coriolis Force) : পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে সৃষ্ট আপাত বল। কারণ চলমান বস্তুসমূহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে সরে যায়। নিরক্ষরেখায় কোরিওলিস বলের প্রভাব দেখা যায় না। এই বল আবহাওয়াগত বিভিন্ন ঘটনা, যেমন মধ্য অক্ষাংশীয় ঘূর্ণবাত, হ্যারিকেন, প্রতীপ ঘূর্ণবাত প্রভৃতি প্রবাহের দিক নির্ধারণের জন্য দায়ী।

কিউমুলাস মেঘ (Cumulus Cloud) : অপেক্ষাকৃত সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট বৃহদাকৃতি মেঘ। সাধারণত 300 - 2,000 মিটার উচ্চতায় এই মেঘ দেখা যায়।

কিউমুলোনিম্বাস মেঘ (Cumulonimbus Cloud) : এই মেঘ উল্লম্বভাবে বিস্তৃত হয়ে গম্বুজ আকার ধারণ করে এবং এর উপরিভাগ কামারের লোহা পেটানোর নেহাই-এর মতো। এই মেঘের বিস্তার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কয়েকশো মিটার থেকে 12,000 মিটারের বেশি হতে পারে।

মরুভূমিতে সৃষ্ট পথবিশেষ (Desert Pavement) : ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট সূক্ষ্ম দানাদার পদার্থের অবশিষ্টাংশ দ্বারা সৃষ্ট পথ।

ভূমিকম্প (Earthquake) : পৃথিবীর আকস্মিক কম্পন বা গতিশীল অবস্থা। এই গতিশীলতা ধীরে পুঞ্জিভূত শক্তির ভূকম্পীয় তরঙ্গের আকারে দ্রুত নির্গমনের ফলে সংগঠিত হয়।

ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Earthquake Focus) : ভূমিকম্পের ফলে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে নির্গত চাপ (ভূমিকম্পের উৎস নামেও পরিচিত)।

ভাটা (Ebb Tide) : জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের জলস্তর কমে যায়।

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) : জৈব ও অজৈব উপাদান দ্বারা গঠিত। উভয় গোষ্ঠীই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং ক্রিয়াশীল।

এল নিনো (El Nino) : ইকুয়েডর ও পেরু উপকূলে উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ আকস্মিকভাবে উৎপত্তি হয় বলে এরূপ নামাকরণ হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রদানে এই ঘটনা ব্যবহার করা হয়। এই এল নিনো সাধারণত খ্রিস্টমাসের সময় সংঘটিত হয় এবং কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

উপকেন্দ্র (Epicentre) : ভূমিকম্প কেন্দ্রের নিকটস্থ ভূ-পৃষ্ঠের একটি স্থান, যে বিন্দুতে ভূকম্প শক্তি (seismic energy) নির্গত হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) : গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার উষ্ণায়ন।

ভূ-চুম্বকত্ব (Geomagnetism) : শিলা গঠনের সময় পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে শ্রেণিবদ্ধ হওয়ার জন্য চুম্বকীয়ভাবে সক্রিয় খনিজগুলোর একটি ধর্ম বা গুণ।

ভূতাত্ত্বিক বায়ু (Geostrophic Wind) : উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে অনুভূমিক বায়ু যা সমপ্রেষ রেখার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। এটি হল বায়ুচাপ ঢালের বল এবং কোরিওলিস বলের মধ্যে ভারসাম্যের ফলাফল।

গ্রিন হাউস প্রভাব (Greenhouse Effect) : গ্রিন হাউস প্রভাব সূর্যরশ্মির শোষণ এবং বৃহৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তিকে পুনরায় বিকিরণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অধিক তাপীয় শক্তিকে আবদ্ধ করে।

গ্রিন হাউস গ্যাস (Greenhouse Gases) : গ্রিন হাউস প্রভাবের জন্য দায়ী হল গ্যাস। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে - কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2); মিথেন (CH_4); নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O); ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) এবং ট্রপোস্ফিয়ারিক ওজোন (O_3)।

আবাসস্থল (Habitat) : আবাসস্থল হল এমন একটি স্থান যেখানে একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী বসবাস করে।

শিলাবৃষ্টি (Hail) : শিলাবৃষ্টি হল বরফের টুকরো বা শিল পাথরের আকারে অধঃক্ষেপণের একটি প্রকার। শিল পাথরের আকার 5 থেকে 190 মিমি. ব্যাসার্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

হেলোক্লাইন (Halocline) : মহাসাগরের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল যেখানে লবণতা বৃদ্ধির হার খুবই তীব্র হয়।

হাইড্রেশান (Hydration) : হাইড্রেশান হল রাসায়নিক আবহবিকারের এমন একটি রূপ যা হাইড্রোজেন আয়ন (H+) এবং হাইড্রক্সিল (OH-) আয়নের অনমনীয় সংযোজনকে খনিজের পরমাণু এবং অণুতে যুক্ত করে।

হাইড্রলিসিস (Hydrolysis) : এটি হল একটি রাসায়নিক আবহবিকার প্রক্রিয়া যা খনিজ আয়ন এবং জলের আয়নের (OH- এবং H+) মধ্যে বিক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। নতুন যৌগ গঠনের মাধ্যমে শিলাপৃষ্ঠের স্থলন (decomposition) হল এর ফলাফল।

অনুপ্রবেশ (Infiltration) : পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পৌঁছে যাওয়া অধঃক্ষেপণের একটি অংশ প্রবেশ্য স্তরে ভূমির মধ্যে চুঁইয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটি অনুপ্রবেশ নামে পরিচিত।

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল (Insolation) : এটি হল ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিরূপে আগত সৌর বিকিরণ।

আন্তঃক্রান্তীয় সম্মিলন অঞ্চল (Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ)) : নিম্নচাপযুক্ত বায়ুমণ্ডলীয় অঞ্চল এবং উর্দ্ধগামী বায়ু নিরক্ষরেখার দিকে বা কাছাকাছি অবস্থিত। বিশ্বব্যাপী বায়ুর অভিসরণ ও তাপীয় উত্তাপের পরিচলনের ফলে বায়ু স্রোত উত্থিত হয়।

ক্যাটিয়াবেটিক বা নিকাশী বায়ুপ্রবাহ (Katabatic Wind) : যে বায়ু পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিত হয়, তাকে ক্যাটিয়াবেটিক বা নিকাশী বায়ুপ্রবাহ বলা হয়।

স্থলবায়ু (Land Breeze) : স্থানীয় তাপ সঞ্চালনের ধরনটি স্থলভাগ এবং জলভাগের সংযোগস্থলে দেখা যায়। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়ায়, স্থলবায়ু রাত্রিবেলা ভূমি থেকে জলারাশির দিকে প্রবাহিত হয়।

লা-নিনা (La Nina) : লা-নিনা হল এল-নিনোর বিপরীত অবস্থা। লা-নিনাতে, ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আয়ন বায়ুপ্রবাহ খুব শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল জলের একটি অনিয়মিত সঞ্চয় ঘটায়।

লীন তাপ (Latent Heat) : এটি হল একটি পদার্থকে উচ্চতর স্তরের পদার্থে (কঠিন > তরল > গ্যাস) পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। যখন পরিবর্তনের স্তর বিপরীত হয় (গ্যাস > তরল > কঠিন), তখন এই একই শক্তি পদার্থ থেকে মুক্ত হয়।

মরা কোটাল (Neap Tide) : যে জোয়ার প্রতি 14 - 15 দিন এবং চাঁদের প্রথম ও শেষ চতুর্থাংশের সাথে মিলিতভাবে ঘটে, তাকে মরা কোটাল বলে। এর একটি স্বল্প জোয়ারি পরিসর রয়েছে কারণ চাঁদ এবং সূর্যের মহাকর্ষীয় বল একে অপরের সাথে উল্লম্বভাবে কার্য করে।

নিম্বোস্ট্র্যাটাস মেঘ (Nimbostratus Clouds) : এটি কৃষ্ণাভ, ধূসর নিম্ন অক্ষাংশীয় মেঘ যা বৃষ্টি বা তুষাররূপে অবিরাম অধঃক্ষেপণ ঘটায়। এই প্রকার মেঘ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3000 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়।

অন্তর্ধৃত বায়ুপ্রাচীর (Occluded Front) : বায়ুমণ্ডলে উষ্ণ ও শীতল বায়ুপুঞ্জের মিলন স্থলে দুটি শীতল বায়ুপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে যদি একটি উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ অবস্থান করে তখন শীতল বায়ুপুঞ্জ উষ্ণ বায়ুপুঞ্জকে ঠেলে উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নতুন বায়ুপ্রাচীরকে অন্তর্ধৃত বায়ুপ্রাচীর বলে।

ওজোন (Ozone) : ত্রি-পরমাণু বিশিষ্ট অক্সিজেন যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি গ্যাস রূপে পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 - 15 কিমি উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোনের সর্বাধিক কেন্দ্রীভবন দেখা যায় যেখানে এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজোন গ্যাস স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয় এবং জীবকূলকে সূর্যের ক্ষতিকারক অতি বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

ওজোন গর্ত (Ozone Hole) : এটি স্ট্যাটোস্ফিয়ারের ওজোনের কেন্দ্রীভবনের ঋতুকালীন তীব্র হ্রাসকে বোঝায়, যেটি বসন্তকালে অ্যান্টার্কটিকার ওপর ঘটে থাকে। 1970 সালের শেষের দিকে ওজোন গর্ত সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানা যায়। এরপর বায়ুমণ্ডলের জটিল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার। [যেখানে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs)ও দায়ী] ফলস্বরূপ এটি বার বার প্রাদুর্ভূত হয়।

পরাচুম্বকত্ব (Palaeomagnetism) : শিলা গঠনের সময়কাল থেকে শিলায় উপস্থিত খনিজের চুম্বকীয়ভাবে অর্জিত সামর্থ্য, শ্রেণিবিন্যাস, প্রবৃত্তি রূপে সংরক্ষণ।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) : এটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেখানে উদ্ভিদ তথা কিছু ব্যাকটেরিয়া সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে গ্রহণ করে এবং একে স্থিরভাবে সংগঠিত করে।

পাত ভূগাঠনিক (Plate Tectonics) : এই তত্ত্বানুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠ কতগুলো মহাসাগরীয় এবং মহাদেশীয় পাত দ্বারা গঠিত। গুরুমণ্ডলে পরিচলন স্রোতের দ্বারা পৃথিবীর অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে পাতগুলোর খুব ধীর গতিতে সঞ্চারিত হওয়ার সামর্থ্য রয়েছে।

অধঃক্ষেপণ (Precipitation) : মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, তুষার বা শিলাবৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়াকে অধঃক্ষেপণ বলে। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, মেঘ বিস্ফোরণ এবং শিলাবৃষ্টি হল অধঃক্ষেপণের প্রকার বিশেষ।

জলপ্রবাহ (Runoff) : বিভিন্ন প্রণালী থেকে জলের ভূমিস্থ প্রবাহকে জলপ্রবাহ বলে।

সৌর বায়ু (Solar Wind) : সূর্য দ্বারা মহাকাশে নির্গত আয়ন যুক্ত গ্যাসীয়পুঞ্জ যা মেরুপ্রভা গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভূগর্ভস্থ প্রবাহ (Subsurface flow) : এটি ভূ-পৃষ্ঠের নীচের জলপ্রবাহ। ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল অনুপ্রবেশের পরবর্তী পর্যায়ে জলপ্রবাহ থেকে চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ জলে পুনরায় ফিরে যায় বা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ ভূমির ঢাল, বৃষ্টিপাত, ভৌমজল নিষ্কাশনের প্রাবল্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।

থার্মোক্লাইন (Thermocline) : জলরাশির মধ্যস্থিত একটি সীমান্ত যেখানে তাপমাত্রার উল্লম্ব দিকে বৃহৎ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সীমান্তটি প্রধানত একটি পরিবৃত্তি অঞ্চল বা মিলনস্থল যেখানে পৃষ্ঠদেশীয় উষ্ণ জলস্তর এবং শীতল গভীর জল স্তর মিশ্রিত হয়।